পয়গামে মুহাম্মদী

(আটটি ভাষণ)

সাইয়েদ সোলায়মান নদভী

পয়গামে মুহাম্মদী

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
জীবনচরিতের আলোকে প্রদত্ত আটটি ভাষণ)

মূল উর্দু
আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)

অনুবাদ
মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম
(প্রাক্তন অনুবাদক : বাংলাদেশ-লিবিয়া ভ্রাতৃ সমিতি)
আরবি, উর্দু, ইংরেজি, ফার্সি ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী।

বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা ও সংযোজন
মোহাম্মদ শামসুজজামান
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশনা পরিচালক
মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমি
ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা

ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ 01712287695, 01915717147
ইমেল : fahimbookdepoll@gmail.com
FB : Facebook.com/Fahimbookdepo official

www.bjilibrary.com

পয়গামে মুহাম্মদী (আটটি ভাষণ)
আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.)

প্রকাশক
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
ফাহিম বুক ডিপো
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা ঃ ০১৯৮১১৪৩১১১, ০১৭১২২৮৭৬৯৫
ইমেল : fahimbookdepoll@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
ফাহিম বুক ডিপো-৭

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুন-২০১৭ ইং
পরিমার্জিত ও সংশোধিত সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর-২০১৮ ইং

বর্ণবিন্যাস
হেজাজ কম্পিউটার
মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী
ঢাকা-১২০৪

প্রচ্ছদ ঃ ফাহিম কালার গ্রাফিক্স

মুদ্রণ ঃ মাদার প্রিন্টার্স
ঋষিকেশ দাস রোড
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

www.bjilibrary.com

প্রসঙ্গ কথা

আলোচ্য গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুবিশাল জীবন চরিতের সামান্যতম অংশ নিয়ে উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও ঐতিহাসিক আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী মুসলিম এডুকেশনাল এসোসিয়েশন অব সাউদান ইন্ডিয়ার আমন্ত্রণক্রমে ১৯২৫ সনে মাদ্রাজের লালী হলে যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন তারই অংশ বিশেষ। যা পরবর্তীতে উর্দু সাহিত্যে খুতুবাতে মাদ্রাজ নামে প্রকাশিত হয়। এতে রয়েছে মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মূল্যবোধ সম্বলিত বিশ্লেষণ যা পাঠক পাঠকালেই এর মর্ম অনুধাবনে সামর্থ হবেন।

আমরা এর বাংলা অনুবাদ **পয়গামে মুহাম্মদী : আটটি ভাষণের** শিরোণামে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করছি। আশা করা যায় বর্তমানকালেও গ্রন্থটি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

(গ্রন্থটি নির্ভুল হয়েছে এমন বলা যাবে না। যদি কোনো ত্রুটি পাঠকের নজরে ধরা পড়ে তাহলে প্রকাশককে অবহিত করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করা যাচ্ছে।)

–সম্পাদক

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

আটটি বক্তৃতার সমন্বয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯২৫ সনের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারতের ইসলামি শিক্ষা সংস্থার আবেদনে এ বক্তৃতাগুলো প্রদান করা হয়েছিল। মাদ্রাজে কয়েক বছর থেকে এক আমেরিকান খ্রিষ্টানের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সামনে কোন না কোন বিশিষ্ট খ্রিষ্টান পণ্ডিত হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের জীবন এবং খ্রিষ্টান ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছেন এবং এ বক্তৃতাগুলো প্রতি বছরই প্রদান হচ্ছে এবং অত্যন্ত আগ্রহে আগ্রহী শ্রোতাগণ শোনছেন। এ অবস্থার মোকাবেলায় মাদ্রাজের কিছু নিঃস্বার্থ মুসলিম শিক্ষানুরাগী মুসলমানদের তরফ থেকে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন অর্থাৎ, প্রতি বছর ইংরেজি শিক্ষার্থীদের রুচি এবং আধুনিক চিন্তার বিকাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য বিশিষ্ট মুসলিম আলেমগণের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

এ পর্যায়ে মাদ্রাজের বিশিষ্ট শেঠ জনাব এম. জামাল মুহাম্মদ এ কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সম্মত হন। কেননা তিনি মাদ্রাজের বিভিন্ন ইসলামি শিক্ষা সম্পসারণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে আসছেন। তাঁর ইসলামপ্রীতি ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদগণের পরিশ্রম এর ধারাহিকতা বজায় রাখবে এবং মাদ্রাজে 'ইসলামি বক্তৃতাবলির এ বৈশিষ্ট্যতা ইউরোপের জনপ্রিয় বক্তৃতাবলির ন্যায়ই উপকারী প্রমাণিত হবে এবং ব্যাপক সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমি আশাবাদী।

সর্বপ্রথম এ গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্রতম কাজটির জন্য আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়েছে, এজন্য আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করি। তাই আমার পক্ষ থেকে এ বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের লালী হলে প্রদান করা হয়। প্রতি সপ্তাহে একটি এবং কোন

www.bjilibrary.com

কোন সপ্তাহে দুটি করে, ১৯২৫ সনের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নবেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সর্বমোট আটটি বক্তৃতা প্রদান করা করি। সংস্থার সম্পাদক শেঠ হামীদ হাসান এ বক্তৃতাগুলোকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করা এবং এগুলোর ইংরেজি অনুবাদ করার কাজ সম্পাদন করেছেন বলে আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ। এ নিরস আলোচনাসমূহ ধৈর্যসহকারে শোনে মাদ্রাজের জনগণ আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাই আমি তাঁদেরকেও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়াও অমুসলিম বন্ধুগণ উর্দু ভাষায় দেয়া বক্তৃতার মর্ম পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করা সত্বেও একমাত্র প্রকৃত সত্য, অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন, এজন্য আমি তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রতি সপ্তাহে মাদ্রাজের উর্দু এবং ইংরেজি পত্রিকাগুলো এ বক্তৃতাসমূহের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেও আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। এ সাথে হিন্দু এবং ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা দুটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা নিজ নিজ পত্রিকায় ইংরেজিতে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত-সারমর্ম প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সীমাহীন উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, এটাও আমার জন্য কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয় ।

এসব বক্তৃতাগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। তিনি যেন এ নগণ্য খাদেমের আবেদন-নিবেদনটুকু কবুল করে মন-মানসে আন্তরিকতা এবং তৌফিকের অমূল্য সম্পদে পরিপূর্ণ করে দেন।

দাস্না, বিহার,
ডিসেম্বর, ১৯২৫ইং

করুণাকামী
সাইয়েদ সুলায়মান নদভী

www.bjilibrary.com

উর্দূ গ্রন্থের প্রকাশের কথা ও লেখক পরিচিতি

আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহ.) ছিলেন সমকালীন ইসলামি বিশ্বের এক অনন্য বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব। ১৮৮৪ সনের ২২ নভেম্বর বিহারের দিস্না গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। বাড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর ফুলওয়ারী শরীফ ও দারভাংগায় তাঁর দীনী শিক্ষার পাঠ শুরু হয়। ১৯০১ সালে তিনি লক্ষ্ণৌ-এর দারুল উলূম নদওয়ায় ভর্তি হন।

১৯০৪ সনে উর্দূর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান লেখক ও গবেষক মাওলানা শিবলী নোমানী নদওয়ায় যোগদান করেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সাইয়েদ সাহেব গড়ে ওঠতে থাকেন। মাওলানা শিবলীর কাছে মিসর ও সিরিয়া থেকে আরবি পত্রিকা আসতে থাকে প্রচুর পরিমাণে। সাইয়েদ সাহেব নিয়মিত সেগুলো পড়তেন। এভাবেই আধুনিক আরবি সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৪ সালে আন নদওয়া নামে নদওয়াতুল ওলামার পক্ষ থেকে উর্দূতে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। সাইয়েদ সাহেব এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯০৬ সালে ছাত্রদের দস্তারবন্দি মাহফিলে সাবলীল বিশুদ্ধ আরবিতে দেওয়া তাঁর বক্তৃতা শুনে মাওলানা শিবলী নোমানী আনন্দে অভিভূত হয়ে আসন থেকে ওঠে নিজ মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন। ১৯০৭ তিনি সালে আন নদ্ওয়ার ডাইরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। আবার ১৯০৮ সনে দারুল উলূম নদওয়ায় কালাম শাস্ত্র এবং আধুনিক আরবি সাহিত্যের অধ্যাপনার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯১২ সনে শিক্ষকতার সাথে সাথে আন নদওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা করাকালীন সময়ে তিনি 'দুরুসুল আদাব' নামে দুখণ্ডের একটি আরবি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১২ সনে শিক্ষকতার সাথে সাথে আন নদওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্বও লাভ করেন। ১৯১২ সনে লুগাতুল জাদীদা নামে আরবি ভাষার আধুনিক শব্দ

www.bjilibrary.com

সম্বলিত একটি অভিধান রচনা করেন। ১৯১৩ সালের শেষে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পূনার দাক্ষিণাত্য কলেজে প্রাচ্য ভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখানে শিক্ষকতার সাথে সাথে 'আরদুল কুরআন' নামে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনার কাজও করেন। এতে কুরআনে উল্লিখিত দেশ এবং বিভিন্ন স্থানগুলোর ভৌগোলিক বিবরণ, আরব জাতির রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, বংশগত, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণাধর্মী আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এতে একদিকে বাইবেলের বর্ণনার সাথে বিষয়গুলোর অসামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য দেখানো হয়।

১৯১৪ সালে পূনা ত্যাগ করে আযমগড়ে এসে সেখানে শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক ও ইসলামি শাস্ত্রসমূহে পারদর্শী পণ্ডিতগণ নিয়ে 'দারুল মুসান্নিফীন' (লেখক একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে 'মাআরিফ' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। এখনো এ প্রতিষ্ঠানের আলোক রশ্মিতে সমগ্র উপমহাদেশ আলোকিত রয়েছে। ১৯১৫ সনে তিনি দারুল উলূম নদ্ওয়ার শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। ১৯২০ সন পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। উস্তাদ শিবলী নোমানীর ইন্তিকালের পর ১৯১৮ সনে তাঁর সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত রচনাবলি গ্রন্থকারে সংকলন করে ১ম খণ্ড প্রকাশ করে। এরপর নিজেই বাকি খণ্ডগুলো লিখতে ও প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯৩৯ সালে এর সর্বশেষ ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করেন। সীরাতুন্নবী সংক্রান্ত এ অনন্য গবেষণামূলক বিশাল গ্রন্থটি তাঁকে বিশ্বজোড়া সুখ্যাতির অধিকারী করে রেখেছে।

১৯৩৩ সনে তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক রচনা 'খাইয়াম' প্রকাশিত হয়। খাইয়াম শুধুমাত্র একজন কবিই ছিলেন না, বরং এ সাথে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ।

সাইয়েদ সুলায়মান নদভী ১৯৪০ সনে লিখেন ছোটদের জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় রাসূলুল্লাহর সীরাত 'রহমতে আলম।' এ বছরই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

www.bjilibrary.com

অতঃপর ভূপালের নবাবের অনুরোধে ১৯৪৬ সনে তাঁর ইস্টেটের প্রধান বিচারপতি এবং জামেয়া মাশারিকিয়্যা বা হায়দরাবাদের প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আমীন বা রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন।

১৯৫০ সনে পাকিস্তানে হিজরত করেন। সেখানে ধর্মীয়, জাতীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে জামিয়াতুল উলামা ইসলাম'-এর সভাপতি এবং পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি কমিশন, আরবি মাদরাসাসমূহের কমিটি, 'ল' কমিশন, করাচী ইউনিভারসিটির সিনেট এবং পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল কনফারেন্সের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন থেকেই ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ সচেতন। মুসলিম মিল্লাতের যে কোন সমস্যায় তাঁকে প্রথম কাতারে দেখা যেত। তাই ১৯২১ সনে মীরাঠে অনুষ্ঠিত খিলাফত আন্দোলনের বাৎসরিক সভায় তাঁকে দেখা যায় সভাপতির আসনে। ১৯৫০ সনে পাকিস্তানে আসার পর পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা জোরদার করেন। তাঁর সভাপতিত্বে ১৯৫১ সনের জানুযারি মাসে করাচীতে শিয়া-সুন্নী-হানাফী-আহলে হাদিস নির্বিশেষে সকল মহলের ৩১ জন উলামা সর্বসম্মতভাবে ইসলামি শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেন। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় 'আদর্শ প্রস্তাব' নামে এ দফাগুলো সন্নিবেশিত হয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। ১৯৫৩ সনের ২২ নভেম্বর ইসলামি জগতের বিশ শতকের এ শ্রেষ্ঠ মনীষীর ইন্তিকাল হয়।

–প্রকাশক

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১. মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবিগণের ভূমিকা ১৩
২. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনই বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন আদর্শের প্রতীক..... ৩৩
৩. ঐতিহাসিক ভিত্তির অবদান ৫৭
৪. মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতা প্রদান..... ৮৬
৫. নবি জীবনের সর্বজনীনতার দৃষ্টান্ত.....১১০
৬. বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্র.....১৩৫
৭. ইসলামের নবির বাণী.....১৬৫
৮. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী প্রচার ১৯৫

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

মানবতার পূর্ণতা বিধানে নবিগণের অবদান

আমাদের এ জগত অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ। আর বিচিত্র সৃষ্টির সমাবেশ। তাই প্রতিটি সৃষ্টি বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। যদি লক্ষ করা যায় জড় পদার্থ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি ক্রমান্বয়ে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে অনুভূতি জ্ঞান এবং ইচ্ছার উন্মেষ ও উন্নয়ন ঘটে তা এরই ফলশ্রুতিতে। জড় পদার্থের শুরুর স্তর-অণু বা ইথার সব ধরনের অনুভূতি, জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি শূন্য। তাছাড়া জড় পদার্থের অন্যান্য স্তরে জীবনের ক্ষীণ প্রকাশ পাওয়া যায়। উদ্ভিদে একটি অবচেতন অনুভূতির বিকাশ লক্ষ করা যায়। প্রাণীদেহে অনুভূতি সৃষ্টির সাথে সাথে ইচ্ছাশক্তিকেও সক্রিয় দেখা যায়। আর মানব জাতির ক্ষেত্রে অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছাশক্তির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের এ অনুভূতি জ্ঞান এবং ইচ্ছাই সকল দায়িত্বের প্রকৃত কারণ। যে শ্রেণির সৃষ্টির মাঝে এ বিষয়গুলোর পরিমাণ যত কম, সে শ্রেণি তত বেশি ঐচ্ছিক দায়িত্বের শৃঙ্খল মুক্ত এবং জড়পদার্থ সব রকমের দায়িত্বমুক্ত। উদ্ভিদে জীবন এবং মৃত্যুর কিছু দায়িত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে মাত্র। আর প্রাণিদের কর্তব্য আরো কিছুটা বেড়ে যায়। মানবজাতির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করা হলে দেখা যাবে, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের শৃঙ্খলে তারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ। আবার মানব সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি লক্ষ করা হলে দেখা যাবে, তাদের মাঝে একদিকে যেমন উন্মাদ, অর্ধোন্মাদ, নির্বোধ এবং শিশু রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বুদ্ধিমান, বয়স্ক, জ্ঞানী, চতুর এবং শিক্ষিত ব্যক্তির দলও রয়েছে। অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছার তারতম্যে তাদের কেউ পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্ত, কারোর দায়িত্ব কম এবং কারোর বেশি পরিমাণে থাকে।

আর অন্যদিক থেকে যদি বিচার করা যায়, দেখা যাবে, যে সৃষ্টির মাঝে অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছার স্বল্পতা যত বেশি, আল্লাহ তার প্রতিপালন ও বিকাশ সাধনের দায়িত্ব তত পরিমাণেই নিজের ওপর রেখে

www.bjilibrary.com

দিয়েছেন এবং যে হারে সৃষ্টি চক্ষু উন্মীলন করতে থাকে, সে হারেই আল্লাহ তার অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছার পরিমাণ মাফিক প্রত্যেক শ্রেণির ওপর দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন। পাহাড়ে মণি-মাণিক্যের লালন কে করে? সমুদ্রে মাছকে কে প্রতিপালন করে? বনের পশুপাখীর আহার যোগায় কে? জীবজন্তুর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কে করে? এমনকি শীত প্রধান বা গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার প্রাণী ও পাহাড়, বন এবং মরুভূমিতে বসবাসকারী জীব-জন্তু একই শ্রেণিভুক্ত থাকার পরও জল-বায়ুর বিভিন্নতার কারণে এদের বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। ইউরোপের কুকুর এবং আফ্রিকার কুকুরের জীবন ধারনের ক্ষেত্রে মওসুম এবং জলবায়ুর বিভিন্নতার কারণে যে পার্থক্য দেখা যায়, সে অনুপাতে তাদের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থাও প্রকৃতি নিজের পক্ষ থেকেই করে। আর এ জন্যই যেসব দেশের ঋতু ও জলবায়ুর মাঝে পার্থক্য রয়েছে, সেসব দেশের একই শ্রেণির পশুর নখ, চলন, লোম, চামড়ার, রং এবং অন্যান্য বিষয়ে বিরাট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

এসবই হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা অর্জনের বিভিন্ন উপায় উপকরণ। এ থেকে জানা যায়, যেখানে যে পরিমাণ অনুভূতি, জ্ঞান এবং ইচ্ছার অভাব থাকে, সেখানে প্রকৃতি নিজেই তা পরিমাণ মোতবেক পূরণ করার ব্যবস্থা করে। আর আল্লাহর সৃষ্টিজগত যে পর্যায়ক্রমে সুযোগ-সুবিধা অর্জনের উপায়-উপকরণসমূহ সৃষ্টির নিজস্ব শক্তি-সামর্থের কাছে সোপর্দ করে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে থাকে। মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। সে কৃষি-কাজ, বৃক্ষ রোপণ ও ফল উৎপাদন করার জন্য পরিশ্রম করে। সে জন্মগতভাবে শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী চামড়া, লোম এবং পশম লাভ করেনি। বিভিন্ন ধরনের পোশাকের মাধ্যমে এর ব্যবস্থা তার নিজেকেই করতে হয়। রোগ-ব্যাধি এবং আঘাত ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য তার নিজেকেই প্রচেষ্টা করে যেতে হয়।

তাছাড়া যেখানে অনুভূতি ও ইচ্ছা দুর্বল, সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টিকে শত্রু থেকে রক্ষা এবং তার জীবন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই বহন করেছে। আত্মরক্ষার মোকাবেলায় বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। তীক্ষ্ণ নখ, সাঁড়াশী দাঁত, শিং, উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা,

www.bjilibrary.com

সাঁতার কাটার ব্যবস্থা, অতি দ্রুতগামিতা, দংশন করার উপযোগী হুল, বিষ-দাঁত ইত্যাদি বিভিন্ন অস্ত্রের মাধ্যমে প্রকৃতি নিজেই তাদেরকে নিরাপত্তার জন্য সুসজ্জিত করেছে। কিন্তু মানুষের অবস্থা যদি লক্ষ করা যয়, আত্মরক্ষার জন্য তার কাছে না হাতীর বৃহদাকার শুঁড় ও দাঁত আছে, না বাঘের তীক্ষ্ণ নখ ও সাঁড়াশী দাঁত আছে, না ষাঁড়ের ন্যায় শিং আছে, না কুকুর এবং সাপের ন্যায় বিষ দাঁত আছে; আর না আছে বিছা-বোলতার ন্যায় হুল। মোটকথা, তাকে বাহ্যত পুরোপুরি অসহায় এবং নিরস্ত্র করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এসবের পরিবর্তে তাকে অনুভূতি, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং বাসনার নিপুণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে। আর এ আভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো তার বাইরের সকল দুর্বলতার প্রতিশেধক হিসেবেই কাজ করে। সে তার এ আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারা বৃহৎ দাঁত এবং শুঁড়ধারী হাতীকে ভূপাতিত করে, লালাযুক্ত দীর্ঘ রসনা এবং তীক্ষ্ণ নখধারী বাঘকে হত্যা করে, ভয়াবহ বিষাক্ত সাপকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখে, শূন্যে বিচরণকারী পক্ষীকে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখে, জলচর প্রাণীদেরকেও শিকার করে এবং তার আত্মরক্ষার জন্য অসংখ্য অস্ত্র নির্মাণ করে নানা ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

বন্ধুগণ! আপনারা যেকোন ধর্মের এবং যেকোন দর্শনের অনুসারী হোন না কেন, আপনাদেরকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, আপনাদের মানবিক দায়িত্বের প্রকৃত কারণ হচ্ছে আপনাদের অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি। ইসলামি বিধানে এ দায়িত্বগুলোর নামকরণ করা হয়েছে 'তাকলীফ' বা দায়িত্বের বোঝা। এ দায়িত্বের বোঝা আপনাদের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের শক্তি-সামর্থ মোতাবেক আপনাদের ওপর প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ ইসলামের এ মূলনীতি এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

"আল্লাহ কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।" (সূরা আল বাকারা-২৮৬)

www.bjilibrary.com

কুরআনের অন্য স্থানে এ 'তাকলীফ'-এর দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে 'আমানত' শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানতের বোঝা জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী, এমন কি, বিরাট বিরাট পাহাড় ও সুউচ্চ আকাশের সামনেও উত্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের একজনও তা বহন করতে সম্মত হয়নি।

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا.

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড়সমূহের কাছে এ আমানত পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করে এবং তা গ্রহণ করতে ভয় পেল। এরপর মানুষ তা বহন করে। অবশ্য সে ছিল যালিম এবং অজ্ঞ।' (সূরা আহযাব-৭২)

কোন এক কবি বলেছেন–

اسمان بار امانت نتوان است کشید * قرعه فال بنام من دیوانه زدند

'আকাশে পারেনি বহিতে এ মহা আমানত-ভার
প্রেমের দিওয়ানা তাই মম শিরে আশ্রয় তার।'

'যালিম' এবং 'অজ্ঞ' এ 'প্রেমের দিওয়ানা'র ভিন্নতর শাব্দিক প্রকাশ। 'যালিম' অর্থ নিজের নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনকারী। এ গুণটি মানুষের কর্মক্ষমতা, অজ্ঞতা এবং তার জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির ভারসাম্যহীনতার নাম। যুলুমের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'ইনসাফ' ও 'আদল' এবং 'অজ্ঞতা'র বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'জ্ঞান'। 'ইনসাফ' এবং 'জ্ঞান' জন্মগতভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। সেগুলো অর্জনের জন্য তার কর্মক্ষমতার মাঝে ভারসাম্যের এবং মানসিক শক্তির মাঝে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়। কুরআনের পরিভাষায় ইনসাফ এবং আদলের অন্য নাম 'সৎকাজ' এবং জ্ঞানের অন্য নাম 'ঈমান'।

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.

'সময়ের কসম, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা ছাড়া।' (সূরা আল আসর-১, ৩)

www.bjilibrary.com

কর্মের এ ক্ষতি হচ্ছে যুলুম এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা। আর এ ক্ষতিপূরণের পথ হচ্ছে 'ঈমান' অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞান অর্জন এবং আদল ও ইনসাফ, অর্থাৎ সৎকাজমূলক আচার-অনুষ্ঠান। মানুষ যে পর্যন্ত ঈমান এবং সৎকাজ করার সুযোগ পায় না, সে পর্যন্ত সে ক্ষতির মাঝেই অবস্থান করতে থাকে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'আলা সময়ের কসম করেছেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সব ভাল-মন্দ, কল্যাণকর, অকল্যাণকর ঘটনা, দুর্ঘটনা যা ঘটেছে, তার সবই এ সময়ের মধ্যে। আর সময়ই এর শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। সময় চলমান, কারো জন্য সময় অপেক্ষা করে না। এই সময়ের সৎব্যবহার করার অর্থ সৎকাজ করা। যারা সময়ের সৎব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে, তারা সবাই ক্ষতির মধ্যে। আর এটাই হচ্ছে এ আয়াতের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিক কার্লাইলের ভাষায়, "ইতিহাস নিছক মহান ব্যক্তিগণের জীবনী-গ্রন্থের নাম।" 'সময়' নামক ইতিহাস সাক্ষী দেয়, যেসব জাতি এবং ব্যক্তি ঈমান ও সৎ কাজ থেকে বঞ্চিত ছিল, তারা প্রতিনিয়ত ক্ষতির মাঝেই অবস্থান করছিল।

জগতের সমস্ত আসমানি গ্রন্থ, অন্যান্য সমস্ত ধর্মগ্রন্থ, নীতিমূলক কাহিনি এবং মানুষের উত্থান-পতনের ঘটনাবলি, যুলুম ও মুর্খতা এবং ঈমান ও সৎকাজের সংমিশ্রণ দ্বারা পরিপূর্ণ। একদিকে যুলুম, মূর্খতা, দুস্কৃতি ও অন্ধকার, আর অন্যদিকে 'আদল-ইনসাফ, সৎকাজ এবং সুকৃতির আলোকোজ্জ্বল কাহিনি এবং ইতিহাস। তাছাড়া যেসব লোক সেই মানবিক দায়িত্বসমূহ গ্রহণ করেছে, তাদের প্রশংসা এবং যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের নিন্দাবাদের কাহিনি উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রীক ইলিয়ড, ইতালীয় পার্লালোজ, ইরানী শাহনামা, ভারতীয় রামায়ণ-মহাভারত এবং গীতা ইত্যাদি গ্রন্থ কি? এগুলো প্রত্যেক জাতির জন্য তার মহান ব্যক্তি এবং মনীষীগণের জীবন বৃত্তান্ত থেকে জ্ঞান এবং মূর্খতা, যুলুম ও ইনসাফ, ভাল-মন্দ, ঈমান এবং কুফরের সংঘাতের শিক্ষামূলক দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক জাতিকে যুলুম, দুস্কৃতি ও কুফরির ধবংসাত্মক পরিণতি থেকে নিস্কৃতি প্রদান করে ইনসাফ, সুকৃতি এবং ঈমানের দৃষ্টান্তগুলোর দ্বারা উপকার অর্জন করার সুযোগ দানই এসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

তাওরাত, ইন্‌জীল, যাবুর ও কুরআনে অধিকাংশের বিষয়বস্তু কি? এগুলো হচ্ছে যালিম, দুষ্কৃতিকারী এবং কাফের জাতি ও ব্যক্তিবর্গের ধ্বংসের চিহ্ন এবং ন্যায়পরায়ণ, সৎ ও মু'মিন জাতি ও ব্যক্তিবর্গের সৎকর্মশীলতা, সৌভাগ্য এবং সাফল্য লাভের দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি এসব জানার ফলে যালিম, ইনসাফ-পরায়ণ, দুষ্কৃতিকারী, সৎকর্মশীল এবং কাফের মু'মিনে পরিণত হতে পারে। এ জন্য আখিরি নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে, প্রতি যুগে, প্রতি দেশে আল্লাহর প্রেরিত নবি-রাসূলগণের আগমন হয়েছিল, তাঁদের নিজেদের জাতির সামনে নিজেদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন। যেন এ আদর্শ অনুসরণে তাঁদের সমস্ত জাতি বা জাতির সৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ কল্যাণ ও সাফল্য লাভে সক্ষম হতে পারে। এরপর সবশেষে মহান আল্লাহ সারাজগতের সামনে চিরন্তন জীবনাদর্শ উত্থাপন করার জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'বিশ্বচরাচরের প্রতি 'রহমত' হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔

'(হে কুরাইশরা!) (নবুয়তের দাবির আগে) আমি তোমাদের মাঝে জীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি, তোমরা কি বুঝতে পার না'?

(সূরা ইউনুস)

আল্লাহ মূলত এ আয়াতে তাঁর নবির জীবন ও চরিত্রকে তাঁর নবুয়তের স্বপক্ষে দলিল হিসেবে উত্থাপন করেছেন। সারকথা হচ্ছে এটাই যে, ইতিহাসে এমন হাজার-হাজার, লাখ লাখ ব্যক্তির উল্লেখ আছে, যারা পরবর্তীগণের জন্য তাদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে উত্থাপন করেছেন। রাজা-বাদশাহর দরবারের চাকচিক্য, জগদ্বিখ্যাত সেনাপতিগণের রণ-কৌশল, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের চিন্তা-চেতনা, বিশ্ববিজয়ী বীরগণের গৌরবময় কৃর্তি, কবিদের বিচিত্র অবদান, ধন-সম্পদশালীদের আরামদায়ক শয্যা ও মুদ্রার-ঝংকারে পূর্ণ ধনাগার-এসব বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রত্যেকটি আদম সন্তানকে তাদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেছে। কার্থেজের হেবল, ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজান্ডার, রোমের

www.bjilibrary.com

জুলিয়াস সীজার, ইরানের দারা, ফ্রান্সের নেপোলিয়ান প্রত্যেকের জীবনেরই একটি আকর্ষণ রয়েছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল এবং গ্রীসের অন্যান্য জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকগণ ও বৈজ্ঞানিককের জীবন একটি বিশেষ ধারায় ধাবমান। নমরূদ, ফিরাউন, আবূ জাহল ও আবূ লাহাবের জীবনযাত্রা অন্য একটি বিপরীত ধারা প্রকাশ করেছে। কারুনের জীবন আর একটি পৃথক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মোটকথা, এ জাগতিক জীবনে সহস্র প্রকারের জীবনাদর্শ বিরাজমান। আদম সন্তানের বাস্তব জীবনে রূপ লাভ করার জন্য এরা নিজদেরকে পেশ করেই রেখেছে। কিন্তু বলুন, এসব বিভিন্ন প্রকারের মানুষের মাঝে কার জীবনধারা মানব জাতির কল্যাণ, উন্নতি এবং মুক্তিপথের নিশ্চয়তা প্রদানকারী এবং বাস্তব জীবনে প্রকৃত অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে?

বিগত জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছেন অনেক জগদ্বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী সেনাপতি। যাঁরা তরবারির আঘাতে জগতের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কিন্তু মানব জাতির মুক্তি, কল্যাণ এবং হিদায়াতের জন্য তাঁরা কি কোন আদর্শ রেখে গিয়েছেন? তাঁদের তরবারি কি যুদ্ধক্ষেত্রে বাইরে মানব সমাজের কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত চিন্তার পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে? মানব জাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতিবন্ধক কোন একটা সমস্যারও সমাধান করতে কি তাঁরা সক্ষম হয়েছেন? তাঁরা মানুষের সমাজ-জীবনের জন্য কোন আদর্শ উত্থাপন করতে পেরেছেন কি? আমাদের আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য এবং হতাশার কোন প্রতিকার তাঁদের দ্বারা কি সম্ভব হয়েছে? তাঁদের দ্বারা আমাদের কর্মপ্রণালি এবং নৈতিকতার কোন কাঠামো তৈরি করা কি সম্ভব হয়েছিল? জগতে অনেক খ্যাতিমান কবির জন্ম হয়েছে। কিন্তু কল্পনা-জগতের এসব শাহানশাহ বাস্তব জগতে সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। তাই প্লেটোর বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় দর্শনে তাদের কোন স্থান নেই। আজ পর্যন্ত হোমার থেকে শুরু করে যত কবি জন্ম হয়েছে, তাঁরা সাময়িক উত্তেজনা এবং কাল্পনিক আশা-আনন্দের ধুম্রজাল এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ব্যতীত মানব জাতির জীবন-সমস্যা সমাধানে কোন যথার্থ পরামর্শ দানে সক্ষম হননি। কেননা তাঁদের সুমিষ্ট বাণীর পেছনে সততার কল্যাণকর কোন আদর্শ ছিল না। তাই কুরআন ঘোষণা করেছে ঃ

www.bjilibrary.com

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ۔ وَأَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ۔ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔

'আর কবিদের অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট লোকেরা। তোমরা কি দেখ না তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ায় এবং মুখে যা বলে তা কাজে পরিণত করে না। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও (কথা অনুসারে) সৎকাজ করেছে (তারা এ দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না)।

(সূরা শু'আরা : ২২৪)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তাদের সুন্দর সুন্দর বাণী প্রভাবহীন হবার কারণ স্বরূপ বলেছে যে, তারা দিকভ্রান্তের মত কল্পনার উপত্যকায় বিচরণ করে এবং তারা ঈমান এবং সৎকাজ থেকে বিমুখ। কিন্তু যদি তারা দুটি সম্পদ হাসিল করতে পারেন, তাহলে তাদের বাণী অবশ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া তারা হিদায়াত এবং সংস্কার সাধনের গুরুদায়িত্ব বহনে সক্ষম হবে না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ জগতের ইতিহাসেই রয়েছে।

বহুবার দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনায় অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং বিশ্ব রহস্যের তেলেসমাতি কারখানা থেকে সংগৃহীত অদ্ভুত অদ্ভুত মতবাদ উত্থাপন করে জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। তারাও মানব জাতির হিদায়াতে কোন কার্যকর বিষয় উত্থাপন করতে পারেননি এবং মানবিক কর্তব্যের রূপরেখা এবং গতিপথ নিরূপণে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তাদের সুক্ষ্মতর আলোচনা এবং উচ্চ চিন্তার পেছনে সৎকাজের কোন বাস্তব দৃষ্টান্ত ছিল না। এরিস্টটল ন্যায়-শাস্ত্রের ওপর উন্নতমানের বক্তৃতা প্রদান করা হয় এবং নৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কে গভীর চিন্তার তারিফ করা হয়। কিন্তু সত্যি করে বলুন, এ দর্শন পড়ে বা শুনে কজন লোক সৎপথের অনুসারী হয়েছে? আজ জগতের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্রের অসংখ্য বড় বড় এবং যোগ্যতম অধ্যাপক রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের নীতিশাস্ত্রের দার্শনিক তত্ত্ব, নীতি-কথার প্রভাব তাদের শিক্ষায়তনগুলোর চৌহদ্দি অতিক্রম করে কখনো বাইরের জগতে

www.bjilibrary.com

আসতে পারেনি, আসতে পারেও না। কারণ শিক্ষায়তনের এলাকা ছেড়ে যখন তাঁরা বাইরে আসেন, তখন দেখা যায় তাঁদের জীবন সাধারণ মানুষের জীবনের তুলনায় সামান্যতমও উন্নত নয়। মানুষ শুধু কান দিয়ে শুনেই নয়– শিক্ষা গ্রহণ করে চোখ দিয়ে দেখেও।

জগতের এ রঙ্গমঞ্চে বড় বড় বাদশাহ এবং শাসকের আবির্ভাব ঘটেছে। অনেক সময় তাঁরা জগতের বিশাল এলাকায় শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে বিভিন্ন জাতির ধন-প্রাণের মালিক হয়েছেন। একটি দেশ ধ্বংস করেছেন ও অন্য একটি দেশ গড়ে তুলেছেন। একটি জাতিকে অধঃপতিত করে আর একটি জাতিকে উন্নত করে তুলেছেন। একজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যজনকে দান করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে তাদের নীতি একই ধরনের ছিল এবং আছে। এ সম্পর্কে কুরআনে 'সাবার' রাণীর মুখ দিয়ে যা বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔

জনপদকে বিপর্যস্ত করে এবং তার সম্মানি ব্যক্তিদেরকে লাঞ্ছিত করে।'

(সূরা আন নমল : ৩৪)

এসব পরাক্রমশালী শাসকদের তরবারি জনপদ এবং জনসমাজে বসবাসকারী দুষ্কৃতকারীদের আত্মগোপন করতে অবশ্য বাধ্য করে, কিন্তু তারা নির্জন এবং নিঃসঙ্গ পরিবেশে গুপ্ত অপরাধীদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। তারা শহর এবং রাজপথে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের রাজ্যে সুখ এবং শান্তি প্রদান করতে পারেনি। তারা দেহের রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য, কিন্তু রূহের জগতে আইন এবং শৃঙ্খলা তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। বরং আধ্যাত্মিক ধ্বংসের সকল উপাদান তাদেরই দরবার থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের জন্য আলেকজাণ্ডার এবং জুলিয়াস সীজারের মত মহাপরাক্রমশালী সম্রাটগণও কি কিছু রেখে যেতে পেরেছেন?

www.bjilibrary.com

আজ পর্যন্ত সুলান থেকে শুরু করে অনেক বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন আইনবিদ জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু তাদের আইনের জীবনকাল স্থায়িত্ব লাভ করেনি এবং সে আইন মান্যকারীরা মানসিক পবিত্রতার রহস্যের সন্ধান লাভ করেনি। পরবর্তীকালের বিচারকগণ এবং বিচারালয়গুলো সেসব আইনকে ভুল বা অপরিপূর্ণ মনে করে বাতিল করেছেন। তারা মানবজাতির সংস্কারের জন্য না হলেও শুধু নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সেখানে অন্য আইন জারি করেছেন। আজও এ ধারার পরিবর্তিত হয়নি। আজকের সুসভ্য যুগেও বিভিন্ন দেশে এমন সব আইন পরিষদ গঠিত হয়েছে যে, তার আজকের বৈঠকে যে আইন পাস হয়, কাল তা বাতিল হয়ে যায়। আর এসব পরিবর্তন করা হয়ে থাকে জনগণের স্বার্থে নয়; বরং সরকার এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের স্বার্থ অনুযায়ী ।

প্রিয় বন্ধুগণ! যে সর্বোচ্চ শ্রেণির মানব-সন্তানদের দ্বারা মানব জাতির উপকার এবং সংশোধনের আশা করা যায়, তাদের প্রত্যেকের অবস্থা

জগতের যেখানেই সৎকর্মের আলোক ও সততার কিরণ দীপ্তমান, যেখানেই আন্তরিকতা এবং পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের শিক্ষা প্রোজ্জ্বল, সেখানেই তা শুধুমাত্র সেসব মহামনীষীর শিক্ষা এবং হিদায়াতের ফলশ্রুতি নয় কি। যাদেরকে আপনারা নবি বলে জানেন? পর্বতের গুহায়, বনের বীথিকায়, নগরে এবং জনপদে যেখানেই দয়া, করুণা, ইনসাফ, দরিদ্রের সাহায্য, ইয়াতিমের প্রতিপালন এবং সৎকাজের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানেই তা অবশ্য এ মহান দলটির কোন-না-কোন ব্যক্তির দাওয়াত এবং শিক্ষার স্থায়ী প্রভাবের ফলশ্রুতি এবং কুরআনের শিক্ষার প্রতিফলন। وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرًا

'এমন কোন জাতি নেই যার মাঝে কোন সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটেনি' এবং وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ 'প্রত্যেক জাতির জন্য রয়েছেন একজন করে পথ প্রদর্শক।'

www.bjilibrary.com

আজ প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতির মাঝে শুধুমাত্র তাঁদেরই কথা ও কাজের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে আর দিকে দিকে তাঁদের বাণীর প্রতিধ্বনিই শোনা যাচ্ছে। সভ্যতার আলোক-বঞ্চিত আফ্রিকার আদিম অধিবাসী হোক বা ইউরোপের সুসভ্য মানুষ হোক, প্রত্যেকের হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা নবিগণের পবিত্র উৎস থেকে অবগাহনেরই ফলশ্রুতি। ইতোপূর্বে আমি যেসকল মহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণির নাম উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ শ্রেণিটি রাজা-বাদশাহের ন্যায় দেহের ওপর নয় বরং হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। যদিও সেনাপতির ধারালো তরবারি তাঁদের হাতে নেই, তবুও তাঁরা গুনাহর স্তূপ এবং অসৎকাজের সারি মুহূর্তে উলটিয়ে দেন। তাঁরা কল্পনা রাজ্যে বিচরণকারী কবি না হলেও আজও মানুষের কান তাঁদের সুমিষ্ট ভাষণের স্বাদ গ্রহণ করেছে। যদিও তাঁরা বাহ্যত আইন পরষদের সিনেটর ছিলেন না, তবুও হাজার হাজার, লাখ লাখ বছর পর আজও তাঁদেরই আইন পূর্ববত জীবিত আছে এবং তা শাসক ও আদালত উভয়ের ওপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। তাঁদেরই আইন সমানভাবে বাদশাহ-ফকির এবং রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সবার ওপরই সমানভাবে প্রযোজ্য আছে।

এখানে ধর্ম এবং বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে প্রকৃত ইতিহাসের, বাস্তবে এর অস্তিত্ব আছে কি-না? পাটলিপুত্রের রাজা অশোকের নির্দেশাবলি শুধু পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের নির্দেশাবলি হৃদয়পটে উৎকীর্ণ আছে। উজ্জয়িনী, হস্তিনাপুর (দিল্লী) ও কনৌজের রাজাদের নির্দেশ জগত থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। কিন্তু মনুর ধর্মশাস্ত্র আজও প্রচলিত আছে। ব্যাবিলনের সর্বপ্রথম আইন প্রণেতা রাজা হামুরাবীর আইন-পুস্তক বহুকাল পূর্বে জগতে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শিক্ষা আজও জীবিত। ফিরাউনের اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ খোদা'-সে যুগের কোন চিহ্ন বিদ্যমান আছে কি? অথচ হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শক্তি আজও বিশ্বে স্বীকৃত। সুলান প্রণীত আইন স্থায়িত্ব লাভ করতে পেরেছে কি? অথচ আজও তাওরাতের প্রত্যাদিষ্ট আইন মানুষের মাঝে

www.bjilibrary.com

ইনসাফের তুলাদণ্ডরূপে স্বীকৃত। যে রোমান ল' হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদালতে পাপী প্রমাণিত করেছিল, শত শত বছর পূর্বে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা এবং হিদায়াত আজও পাপীদেরকে পূণ্যবান ও অপরাধীদেরকে সচ্চরিত্র করার দায়িত্ব পূর্বের মতই পালন করে যাচ্ছে। মক্কার আবূ জাহেল, ইরানের কিসরা এবং রোমের কায়সারের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বিলীন হয়েছে, কিন্তু মদীনার শাসকের শাসন এখনও পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বীকৃত রয়েছে।

বন্ধুগণ! আমার ইতোপূর্বেকার আলোচনা যদি আপনাদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়ে থাকে, তাহলে তা নিছক আকিদা-বিশ্বাসের কারণে নয়। বরং যুক্তি, প্রমাণ এবং জগতের ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলি আপনাদের মনে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে যে, মানব জাতির সত্যিকার উপকার, সৎকাজ, উন্নত নৈতিক বৃত্তি, হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং মানবিক শক্তি-সামর্থের ভারসাম্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানব জাতির কোন দল যদি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, তাহলে তা হচ্ছে নবিগণের দল। তাঁরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে এ জগতে এসেছিলেন এবং জগতবাসীকে সৎশিক্ষা এবং হিদায়াত দান করে, যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত মানুষের জন্য চলার পথ নির্ধারণ করে গিয়েছেন। তাঁদের শিক্ষা এবং কাজের প্রস্রবণে রাজা-প্রজা, আমীর-গরিব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-মূর্খ সবাই সমভাবে উপকৃত হচ্ছে।

وَ تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۔ وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ

www.bjilibrary.com

يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ۔

'আর আমি ইবরাহীমকে তার জাতির ওপর (নিজের যুক্তি পেশ করার জন্য) এ দলিল প্রদান করেছি। আমি যাকে চাই তার মর্যাদা বৃদ্ধি করি। অবশ্য তোমার প্রতিপালক বিজ্ঞ এবং জ্ঞানী। আর আমি তাকে (ইবরাহীমকে) দান করেছি ইসহাক এবং ইয়া'কুব। তাদের প্রত্যেককে হিদায়াত প্রদান করেছি। আর (ইব্‌রাহীমের) পূর্বে আমি নূহকে হিদায়াত দান করেছি এবং তার (ইবরাহীমের) বংশ থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হিদায়াত) দান করেছি। সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান প্রদান করে থাকি। আমি যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, 'ঈসা এবং ইলইয়াসকে (হিদায়াত) প্রদান করেছি। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইসমাঈল, 'ইয়াসায়া' ইউনুস ও লুতকে হিদায়াত দান করেছি এবং তাদের প্রত্যেককে জগতে (তাদের সমকালীন ব্যক্তিবর্গের ওপর) শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি এবং তাদের প্রপিতাদের মধ্য থেকে, তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে থেকে আর তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে তাদেরকে নির্বাচন করেছি ও সরল পথের দিকে হিদায়াত করেছি। এটিই আল্লাহ্‌র হিদায়াত। নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁকে এ হিদায়াত দান করেন। যদি তারা শির্‌ক করত, তাহলে তাদের সমস্ত কাজ ধবংস হয়ে যেত। এ লোকদেরকে আমি কিতাব, সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা এবং নবুয়ত

www.bjilibrary.com

প্রদান করেছি। কাজেই এসব লোক (বর্তমানে তাদের তথাকথিত অনুসারীরা) সেসব নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কারণে সেগুলো আমি এমন লোকদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) কাছে সোর্পদ করেছি, যারা সেগুলোর অমর্যাদা করে না। এদেরকেই আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেছেন। কাজেই তুমি ও এদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।' (সূরা আনআম : ৮৩-৯০)

মানব জাতির হিদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের জন্য এ পবিত্র আয়াতসমূহে একটি বিশেষ মানবশ্রেণির অন্তর্গত বহু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের আনুগত্য এবং অনুসৃতি আমাদের আত্মিক ব্যাধি এবং নৈতিক দুর্বলতার প্রতিষেধক। এ পবিত্র দলটি আল্লাহর সৃষ্ট লোকালয়ের সকল স্থানে ছড়িয়ে পড়ে যুগে যুগে তাঁদের শিক্ষা এবং হিদায়াতের প্রদীপ উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন। আজ মানুষের জীবনে কল্যাণ, সৌভাগ্য, নৈতিকতা, সৎকাজ ও উন্নত জীবনের যা কিছু প্রভাব এবং চিহ্ন বর্তমান তার সবকিছু এসব মনীষীগণেরই কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন। জগতে মানুষ কমবেশি তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই সাফল্যের অনুসন্ধান করে যাচ্ছে।

নূহের প্রচার উদ্দীপনা, ইবরাহীমের তাওহিদী প্রেরণা, ইসহাকের পৈতৃক উত্তরাধিকার, ইসমাঈলের কুরবানি, মূসার বিরামহীন প্রচেষ্টা ও সাধনা, হারূনের সত্য প্রীতি, ইয়াকুবের আনুগত্য, সত্যের করুণ অবস্থার প্রতি দাউদের মাতম, সুলায়মানের জ্ঞান, যাকারিয়ার ইবাদত, ইয়াহইয়ার পবিত্রতা, ঈসার আল্লাহভীতি, ইউনুসের ভুল স্বীকার, লূতের অক্লান্ত পরিশ্রম, আইউবের ধৈর্য-এগুলোই আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের মনোরম সুসজ্জিত প্রাসাদের প্রকৃত কারুকার্যসমূহ। এ উন্নত গুণাবলির অস্তিত্ব জগতে যেখানেই দেখা যায়, সেখানেই তা সে মহামনীষীগণের আদর্শ এবং তাদের জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। মানুষের উত্তম সমাজ, যথার্থ সভ্যতা-সংস্কৃতি, উন্নতমানের সুখানভূতির পূর্ণতা এবং বিশ্বজাহানে তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে অবশ্য মানবজাতির সেরা কর্মীদের ভূমিকা স্বীকার্য। জ্যোতির্বিদগণ

www.bjilibrary.com

নক্ষত্রের গতি বর্ণনা করেছেন, বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুর মৌলিক বিশেষত্ব নির্ণয় করেছেন, ডাক্তারগণ রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন, ইঞ্জিনিয়ারগণ বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, শিল্পীগণ হাজার হাজার শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তাদের সবার প্রচেষ্টা ও সাধনায় জগতে পূর্ণতা এসেছে। তাই আমরা এদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা তাঁদের প্রতি সর্বাধিক কৃতজ্ঞ, যাঁরা আমাদের অভ্যন্তরীণ জগতকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন, আমাদের লোভ এবং লালসাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, আমাদের আত্মিক রোগের প্রতিষেধক নির্ণয় করেছেন, আমাদের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং সংকল্পের সংস্কার সাধন করেছেন, আমাদের আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা এবং সংকল্পের সংস্কার সাধন করেছেন, আমাদের আত্মা ও হৃদয়ের উন্নতি ও অধঃগতির পন্থা বলে দিয়েছেন। এসবের দ্বারা জগতে মানব সমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পূর্ণতা লাভ করেছে, চরিত্র ও নৈতিক বৃত্তি মানবতার প্রাণশক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে; সততা এবং সৎবৃত্তি কর্মক্ষেত্রের আলোকবর্তিকায় বিবেচিত হয়েছে। আল্লাহ এবং বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রথম দিনের কৃত সে বিস্মৃত ওয়াদা পুনর্বার আমাদের স্মৃতিপটে জাগরুক হয়েছে। যদি আমরা মানব-প্রকৃতির এসব রহস্য এবং সৎবৃত্তি ও সততা সম্পর্কিত নবি-রাসূলগণের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতাম, তাহলে এ জগতে কি কখনো পূর্ণতার সীমায় পৌঁছতে সক্ষম হত? তাই আমাদের ওপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম এ শ্রেণিটির দান অগণিত এবং এজন্য সকল শ্রেণির মানুষের তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা অত্যন্ত প্রয়েজনীয় বিষয়। ইসলামের ভাষায় এরই নাম 'সালাত' ও 'সালাম'। নবিগণের পবিত্র নামের সাথে আমরা সব সময়ই এ কথাগুলো উচ্চারণ করে থাকি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ۔

বন্ধুগণ! এসব মহান ব্যক্তিগণ তাঁদের নির্ধারিত সময়ে জগতে এসেছেন এবং আবার যথাসময়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ ধ্বংসশীল বিশ্বের কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাঁদের জীবন যতই পবিত্র এবং নিষ্কলুষ হোক না কেন, চিরন্তন এবং চিরস্থায়ী হবার ক্ষমতা তাঁদের

www.bjilibrary.com

ছিল না। তাই মানবজাতির ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য যা পথপ্রদর্শক হতে পারে তা হচ্ছে লিখা ও মৌখিক বর্ণনা মারফত প্রাপ্ত তঁদের জীবন প্রণালি। আমাদের কাছে এ অমূল্য সম্পদ সংরক্ষণের আর কোন পন্থা নেই। মানব জীবনের এসব লিখা ও বর্ণিত রূপরেখা এবং প্রতিচ্ছবির নামই ইতিহাস বা জীবনচরিত। সম্ভবত আমাদের জীবনের অন্যান্য অংশের বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের কোন-না-কোন শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কিন্তু আমাদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিশুদ্ধি এবং পূর্ণতার জন্য একমাত্র নবিগণ এবং তাঁদের পদাংক অনুসরণকারীগণের ইতিহাস এবং জীবন চরিতই কার্যকরী এবং উপকারী হতে পারে, এতদিন পর্যন্ত মানুষ একমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই উপকৃত হতে পারে। তাই মানুষের নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি এবং পূর্ণতার জন্য এসব পবিত্র ব্যক্তিগণের জীবনচরিত সংরক্ষণ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচিত হয়।

দর্শন, শিক্ষা ও হিদায়াত যতই উন্নত এবং উত্তম হোক না কেন, যদি এর পেছনে একে ধারণ ও বাস্তবায়িত করার এমন উপযোগী ব্যক্তিত্ব যদি না থাকে যিনি আমাদের মনোযোগ, মহব্বত এবং মর্যাদার মধ্যমণি হিসেবে পরিগণিত হবেন, তাহলে তা কোনদিনই সত্যিকারের জীবন লাভ এবং সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে না। ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ক্রুকোডিয়া নামে জাহাজে হিজাজ ও মিসর সফর শেষে ফিরে আসার সময় ঘটনাক্রমে বিশ্ববিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একই জাহাজে আমেরিকা সফর শেষে দেশে ফিরছিলেন। এক যাত্রীবন্ধু তাঁকে প্রশ্ন করেন, "ব্রাহ্মণসমাজের ব্যর্থতার কারণ কী? অথচ তার নীতি ছিল বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ ও সংস্কারবাদী। ব্রাহ্মণসমাজের শিক্ষা কী ছিল ঃ সকল ধর্ম সত্য এবং সকল ধর্মের প্রবর্তকগণ সৎ ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। এ সমাজের মধ্যে বুদ্ধি ও যুক্তিবিরোধী কোন কথাই ছিল না, বর্তমান জগতের সভ্যতা সংস্কৃতি, দর্শন এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই তার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তবুও এ মতবাদ কেন সাফল্য লাভ করতে পারেনি?"

দার্শনিক কবি এর জবাব কি চমৎকারভাবেই না দিয়েছেন। তিনি বললেন, ব্যর্থতার কারণ হচ্ছে, এর পেছনে এমন কোন ব্যক্তির জীবন

www.bjilibrary.com

এবং তাঁর বাস্তব চরিত্র ছিল না, যিনি আমাদের দৃষ্টির মধ্যমণি হতে পারতেন এবং আমাদের জন্য সততা ও সৎকর্মশীলতার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হতেন।" এ উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, ধর্ম তার নবির চরিত্র ও বাস্তব জীবনধারা ছাড়া ব্যর্থ হতে বাধ্য হবে।

মোটকথা, আমাদের হিদায়াত এবং পথনির্দেশের জন্য আমরা নিষ্কলুষ মানুষ, নিষ্পাপ সত্তা ও সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তিত্বগণের মুখাপেক্ষী। আর তাঁরা হচ্ছেন আল্লাহ্‌র নবিগণ।

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ۔

'সংক্ষেপে নবিগণের মধ্যে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যখন রিসালাতের দায়িত্ব বা দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং সূরা মুদ্দাসিরের প্রথম কয়েকটি আয়াতে সংক্ষেপে দিক-নির্দেশনাও দেয়া হয়। তখন তিনি তাঁর সে দাওয়াতের মাহাত্ম্য বিশালতা ও গভীরতা অনুধাবন করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে এ দাওয়াত সাধারণ কোনো বিষয় কেন্দ্রিক নয় বরং মানব জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার সঞ্জিবিত দাওয়াত। জাহেলি সমাজ ধারাকে পরিবর্তন করে একমাত্র 'লা শরীক আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের দাওয়াত। যা মানুষের সমগ্র জীবনে এক নব বিপ্লবের সৃষ্টি করবে, তাতে তাদের জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হবে। অথচ তিনি যে সমাজে দাওয়াতের সূচনা করবেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এক জাহেলি সমাজের জীবনধারা। তারা শিরককেই তাদের ধর্ম মনে করেছে। এসব পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করে মহান আল্লাহর নির্দেশে দাওয়াতী পরিকল্পনায় হিকমত পূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন। আর তা হচ্ছে গোপনে ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দাওয়াত আদান প্রদান। এ কাজকে সাফল্যমন্ডিত করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনীয়তা রক্ষার্থে কয়েকটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যেমন– (১) নিজ পরিবার-পরিজনের মোকাবেলায়, (২) বিশ্বস্ত বন্ধু-বান্ধব, (৩) গোপনীয়তা রক্ষায় ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ।

www.bjilibrary.com

এ পর্যায়ে দাওয়াতী পদ্ধতির কলা-কৌশল ঃ

(১) সূচনাপর্বে ব্যক্তিগতভাবে গোপনে যোগাযোগে দাওয়াত।

(২) গোপনীয়তা রক্ষা করবে এমন বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ।

(৩) পরিবার-পরিজনের কাছে ইসলামের প্রকৃত দাবি তুলে ধরা।

(৪) তাওহীদের ভিত্তিতে আকিদা ও আখলাকের সংশোধনীর ক্ষেত্রে গুরুত্বারোগ।

(৫) গোপনে নামাজ আদায় সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান।

(৬) নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে বা বাঁচাই করা।

(৭) বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদেরকে দাওয়াত দানে চিহ্নিত করা।

(৮) আল-কুরআনের নাযিলকৃত আয়াতসমূহ হিফ্য ও তিলাওয়াত করার মাধ্যমে গুরুত্ব প্রদান করা।' (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজন)

===o===

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনই বিশ্বজনীন এবং চিরন্তন আদর্শের প্রতীক

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ দ্বিতীয় দিন আমাদের মাহফিলের। আমি যা কিছু ইতোপূর্বে বলেছি, তা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণ আছে। তাই এখন আরেকটু সামনে এগিয়ে আসাই সঙ্গত হবে। আমার পূর্ব ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল, মানুষের বর্তমান এবং ভবিষ্যত্যের চিন্তা-চেতনা দূর করার জন্য অপরিহার্য এক বিষয় অতীত দীপ শিখা থেকে আলো গ্রহণ করা । এ বিষয়ে মানব শ্রেণির মধ্যে থেকে যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা আমাদের পথ-নির্দেশক ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আবার তাঁদের মধ্যেও আমাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্‌র নবি রাসূলগণ। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ যুগে নিজেদের জাতির সামনে সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী উন্নত নৈতিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলির দিকসমূহ কোন না কোন উন্নত অলৌকিক নিদর্শনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের কেউ ধৈর্য, কেউ ত্যাগ, কেউ কুরবানি, কেউ তাওহীদের আবেগ, কেউ হকের প্রেরণা, কেউ আনুগত্য, কেউ নিষ্কলুষ মনোবৃত্তি, কেউ আল্লাহ্‌ভীতি ইত্যাদি দিকগুলোর দ্বারা উন্নত আদর্শ স্থাপন করে জগতে মানুষের জটিল জীবনপথে এক একটি সুউচ্চ মিনার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন মানুষ তা দেখে সোজা এবং সরল পথের সন্ধান লাভে সক্ষম ও সফল হতে পারে। কিন্তু এরপরও প্রয়োজন ছিল এমন একজন পথপ্রদর্শক নেতার যিনি নিজের হিদায়াত এবং বাস্তব কার্যাবলির দ্বারা সমগ্র পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে পারেন অর্থাৎ আমাদের হাতে তিনি যেন হিদায়াতের একটি পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনা প্রদান করেন। আর তা নিয়ে প্রত্যেকটি মুসাফির অনায়াসে যেন গন্তব্যস্থানের সন্ধান লাভে সামর্থ হতে পারেন। সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের নেতৃত্বের ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জগতবাসীর সামনে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

www.bjilibrary.com

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۔ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

'হে নবি! আমরা তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদদাতা রূপে ও সর্তকারীরূপে। আর আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপেও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।' (সূরা আল আহযাব : ৪৫-৪৬)

তিনি এ বিশ্বচরাচরে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াতের সাক্ষীদানকারী সৎ-কর্মশীলদের কল্যাণ এবং সৌভাগ্যের সুসংবাদ প্রদানকারী। আর এখনো যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ বা অবহিত নয়, তাদেরকে সতর্ক ও সাবধানকারী, ভীতি প্রদর্শক, পথভ্রষ্টদেরকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী এবং তিনি নিজে সাক্ষাত আলোক ও প্রদীপ স্বরূপ। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ আমাদের পথের অন্ধকার দূর করে উজ্জ্বল আলোক রূপে কাজ করবে। আর এমনি সকল নবিগণই আল্লাহর বাণীর সাক্ষ্য দানকারী, তাঁর প্রতি আহবানকারী, সুসংবাদদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী ইত্যাদি গুণের প্রতীক হিসেবে এ জগতে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের এসব গুণাবলি সকলের জীবনে কার্যত সমভাবে বিকাশ লাভ করেনি। এমন অনেক নবি ছিলেন, যাঁরা বিশেষভাবে সাক্ষ্য দানের দায়িত্ব পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইয়াকুব, হযরত ইসহাক, হযরত ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রমুখ নবিগণ। সুসংবাদদানকারীর দায়িত্ব অনেক নবি পালন করেছেন। যেমন, হযরত ইবরাহীম, হযরত ঈসা প্রমুখ নবিগণ। অনেক নবির ভীতি প্রদর্শন ছিল বিশেষ গুণ– যেমন হযরত নূহ, হযরত মূসা, হযরত হূদ ও হযরত শুআইব প্রমুখ নবিগণ। আবার অনেক নবির বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের দিক নির্দেশনা প্রদান। যেমন, হযরত ইউসুফ, হযরত ইউনুস প্রমুখ নবিগণ। আর যিনি একই সাথে সাক্ষ্য দানকারী, সুসংবাদদাতা, ভীতি প্রদর্শনকারী, সত্যের পথের আহবায়ক ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন এবং যাঁর জীবন প্রবাহে এসব গুণাবলি সুস্পষ্ট আকারে বিদ্যামান ছিল, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তাঁকে সর্বশেষ নবি-রাসূল হিসেবে জগতে প্রেরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত প্রদান করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ্‌র বিধানকে পূর্ণতাদানের জন্য আর কোন নবি আসার আর প্রয়োজনই ছিল না।

www.bjilibrary.com

কেননা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা চিরন্তন স্থায়িত্বের প্রতীক। অর্থাৎ তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এজন্য যাবতীয় দিক থেকে তাঁর পবিত্র সত্তাকে পূর্ণতা প্রদান করে অক্ষয় ভূষণে বিভূষিত করা হয়েছিল।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি যা কিছু বলেছি এগুলো শুধু আমার ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাস ভিত্তিক কোন দাবি নয়, তাই বলা যায় যুক্তি-প্রমাণের সৌধ নির্মাণে এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মানুষের জন্য যে চরিত্র বা জীবনাদর্শ একটি আদর্শ জীবনের কাজ করে, তাকে মেনে নেয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত থাকে। এর সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে নির্ভরতা বা আস্থার নামান্তর।

ঐতিহাসিক ভিত্তির নির্ভরতা

ঐতিহাসিক ভিত্তির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জগতে একজন আদর্শ মানুষের জীবন চরিত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হবে, তা ইতিহাস এবং বর্ণনা পরম্পরার দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এক্ষেত্রে নিছক কিস্‌সা-কাহিনির অবতারণা করা হলে চলবে না। আর বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলা যায়, কোন জীবন-চরিত কাল্পনিক এবং সন্দিহান বলে জানতে পারে তাহলে মানুষের মনে এ সংক্রান্ত একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং এরপর তা যতই আবেগি ভাষায় এবং হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে উত্থাপন করা হলেও কেন, মানুষ তা থেকে কোন স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী ফলাফল গ্রহণে সক্ষম হবে না। অতএব, সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ এবং আদর্শ জীবন চরিতের জন্য তার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশের ঐতিহাসিক ভিত্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন করা হবে অপরিহার্য। কেননা ইতিবৃত্ত মানব-প্রকৃতির ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক প্রভাব বিস্তার করে, কাল্পনিক গল্প-কাহিনির দ্বারা তা কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি করা যায় না আর করাও সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তির অপরিহার্যতা এটাই যে, আপনি নিছক কৌতুহলে অথবা অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ আদর্শ চরিতের নকশা পর্যালোচনা করেন না; বরং এ আদর্শ মোতাবেক নিজ জীবনকে গড়ে তোলা এবং তার অনুসরণ করার জন্যই এরূপ করেন

www.bjilibrary.com

থাকেন। কিন্তু যদি ইতিহাস ও বাস্তব ঘটনাবলির ভিত্তিতে এ চরিত্রই প্রমাণিত না হয়, তখন আপনি তার কার্যকারিতা ও কল্যাণকারিতা সম্পর্কে কি করে জোর দিতে পারেন? তখন এগুলোকে এ অবস্থায় যে কোন লোক কাল্পনিক ও পৌরাণিক কথা কাহিনি আখ্যা দিয়ে– এগুলোর ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নয় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। তাই সর্বপ্রথম প্রভাব বিস্তারকারী, বাস্তবে কার্যকর এবং অনুসরণযোগ্য হবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সে পূর্ণাঙ্গ ও আদর্শ মানুষটির জীবনচরিত ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা বিশ্বচরাচরে আগমনকারী সকল নবিগণকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করি এবং তাঁদের নবুয়তের সত্যতায়ও বিশ্বাসী। কিন্তু সাথে সাথে–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ۔

আমি "এসব নবিগণের মধ্যে অনেককে অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।" আল্লাহর একথাও স্বীকার করি। বস্তুত নবুয়তের আদর্শের স্থায়িত্ব ও সমাপ্তি এবং সর্বশেষে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানব চরিত হবার কারণে মুহাম্মদ ﷺ যে বিশেষত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন অন্য কোন নবি তা লাভ করতে সক্ষম হননি। কেননা, অন্য নবিগণকে স্থায়ী, শেষ ও খতমে নবুয়তের অর্থাৎ নবুয়তের মোহরে মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। তাঁদের জীবন চরিতের উদ্দেশ্য ছিল কোন একটি বিশেষ জাতির কাছে একটি বিশেষ যুগ পর্যন্ত আদর্শ উত্থাপন করা। তাই জগত থেকে সে যুগের পর তাঁদের সে আদর্শ ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেসব এখন আর অবিশিষ্ট নেই।

তাই এবার ভেবে দেখুন! প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক ভাষায় কত লাখ লাখ মানুষ আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন। আমরা আজ তাঁদের কজনের নাম জানি? আমরা যাঁদের নাম জানি কিন্তু তাঁদের পূর্ণ বিবরণও কি জানি? হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবি তারা জগতের সবচেয়ে প্রাচীনতম জাতি। প্রকৃত ব্যাপার যদিও তা নয়, তবুও গভীরভাবে লক্ষ করুন, তাদের ধর্মে শত শত মনীষীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এসব মনীষীর একজনের জীবন ও ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে

www.bjilibrary.com

প্রমাণিত নয়। শুধু তাঁদের অনেকের নামটি ব্যতীত আর কিছুরই উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর পৌরাণিকতার সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকারও ছিল না। তাঁদের সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত চরিত হচ্ছে রামায়ণ এবং মহাভারতের দেব-দেবি। কিন্তু তাদের জীবন চরিত সম্পর্কে যা অবগত হওয়া যায়, এর মধ্যে কোনটিকে ঐতিহাসিক বলবেন? এটাও জানা অসম্ভব যে, এসব ঘটনাবলি কোনকালের, কত শতাব্দীর এবং কোন যুগের। বর্তমান ইউরোপের কিছু পণ্ডিত নানান কল্পনা ও অনুমানের ভিত্তিতে কিছু সময় নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের শিক্ষিত হিন্দু সমাজ সেগুলোকেই তাঁদের জ্ঞান এবং বিদ্যার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অধিক সংখ্যকই এমন, যারা এগুলোকে ইতিহাসের পর্যায়ে বিবেচনাই করেন না, বরং এসব ঘটনা কোনদিন বাস্তবে সংঘটিত হয়েছিল তাও তারা অস্বীকার করেন।

আজও ইরানের প্রাচীন পার্শী ধর্মের প্রবর্তক যরথুষ্ট্র লাখ লাখ মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও প্রাচীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাঁর নিজের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কেও এমন অনেক ইউরোপীয় এবং আমেরিকান গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রাচ্যবিদগণের মধ্যে যাঁরা তাঁর ঐতিহাসিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি দান করেন, তারা বহু ধারণা এবং অনুমান তথ্য নির্ভর করে তাঁর জীবন চরিতের কিছু কিছু বিষয় নির্ধারণ করেন। কিন্তু এটাও বিভিন্ন গবেষকের পরস্পর বিরোধী মতামতের সংঘর্ষে এতই সন্দেহপূর্ণ যে, কোন ব্যক্তি এর ওপর নির্ভর করে নিজ কর্মজীবনের ভিত্তি স্থাপনে সক্ষম হতে পারে না। যরথুষ্ট্রের জন্মস্থান, জন্মবর্ষ, জাতীয়তা, বংশ, ধর্ম, ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় পুস্তিকার যথার্থতা, ভাষা, মৃত্যুবর্ষ, মৃত্যুস্থান ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে বহু মতপার্থক্য রয়েছে এবং এক্ষেত্রে নির্ভুল বর্ণনা এতই প্রকট যে, অনুমান ছাড়া এ প্রশ্নগুলোর প্রকৃত জবাব যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যায়। আজকাল পার্শীগণ এসব কারণে সরাসরি নিজেদের বর্ণনার মাধ্যমে সন্দেহযুক্ত এ অনুমানগুলোর জ্ঞান রাখেন না, বরং ইউরোপীয় এবং আমেরিকান পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত থেকে তারা এগুলো বুঝে নেয়ার

www.bjilibrary.com

চেষ্টা করছেন। আর তাদের নিজস্ব জ্ঞানের দ্বারা ফেরদৌসীর শাহনামা অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। সেসব গ্রীক দুশমনেরা নিশ্চিহ্ন করেছে-এ আপত্তি নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। আমরা এখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ করব যে, নিশ্চিহ্ন বা ধবংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কিভাবে তা হয়েছে, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রমাণ শুধু এটুকু থেকেই হয় যে, ওটা স্থায়ী ও দীর্ঘকালীন জীবন লাভে সক্ষম হয়নি। এ জন্যই অস্বীকার করেছেন কেন ও ডার মিটিটার (Der Meteter)-এর ন্যায় গবেষক এবং পণ্ডিতগণ যরথুষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক উপাদান।

প্রাচীন এশিয়ায় সবচেয়ে ব্যাপক প্রচারিত ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম। এ ধর্ম এক সময় ভারত, চীন, সমগ্র মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, তুর্কীস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর আজও বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, চীন, জাপান এবং তিব্বতে এ ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। অবশ্য একথা বলা সহজ যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণণেরা একে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে এবং মধ্য এশিয়ায় ইসলামের আগমনে এর পরিসমাপ্তে ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র দূরপ্রাচ্যে তার রাষ্ট্র, সভ্যতা ও ধর্ম অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এখনো অজেয়। কিন্তু এসবের পরও কি বুদ্ধের জীবন ও চরিতকে ইতিহাসের আলোকে স্থায়িত্ব প্রদানে সক্ষম হয়েছে? আর সে জীবনচরিতের সকল প্রশ্নের কোন ঐতিহাসিক কি সন্তোষজনক জবাব দানের ক্ষমতা অর্জন করেছেন? বুদ্ধের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করা হয় মগধ দেশের রাজাদের বিবরণ মোতাবেক। অর্থাৎ এটা নিরূপণের অন্য কোন প্রমাণ নেই। গ্রীকদের সাথে তৎকালীন মগধ-দেশীয় রাজাদের ঘটনাক্রমে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এ জন্যই আজ সম্ভব হয়েছে তাদের শাসনকাল নির্ধারণ করা।

জৈনধর্ম প্রবর্তকের জীবন-চরিত আরো অধিক অনিশ্চিত। আমরা অনুরূপ চীনের কন্‌ফুসিয়াস সম্পর্কে বুদ্ধের চেয়েও অনেক কম তথ্য জানি। অথচ তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা কোটি কোটি বিদ্যমান আছে।

শত শত নবি এসেছেন সেমেটিক জাতির মধ্যে। কিন্তু তাঁদের শুধু নাম ছাড়া ইতিহাসে আর কোন চিহ্নই বর্তমান নেই। হযরত নূহ, হযরত

www.bjilibrary.com

ইবরাহীম, হযরত হূদ, হযরত সালেহ, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত যাকারিয়া এবং হযরত ইয়াহ্ইয়ার জীবন ও চরিতের এক একটি বিশেষ অংশ ব্যতীত আর কিছুই কি কেউ আমাদের জানাতে সক্ষম হয়েছে? ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁদের জীবনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁদের পবিত্র জীবনের অবলুপ্ত ও অসংলগ্ন অংশ কি কোন পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনের জন্য অনুসরণযোগ্য বলা যেতে পারে? যদি কুরআনকে বাদ দেয়া যায় ইহুদীদের যেসব কিতাবে তাঁদের জীবন প্রবাহের ঘটনাবলি উল্লেখ আছে, তার মধ্যে প্রত্যেকের সম্পর্কে ধর্মীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ করেছেন। যদি এ সন্দিগ্ধ বিষয়গুলো বাদ দেয়া যায় যা অবশিষ্ট থাকে, তা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণ চিত্রই আমাদের কাছে উত্থাপিত হয়।

আমরা তাওরাত থেকে হযরত মূসার অবস্থা জানতে পারি। কিন্তু আজ যে তাওরাত আমাদের কাছে আছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীদের অভিমত এটাই যে, হযরত মূসার শত শত বছর পর তা রচিত। একথা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' লেখকগণও স্বীকার করেছেন। বর্তমান জার্মান পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানে আবিষ্কার করেছেন যে, বর্তমান তাওরাতে প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে পাশাপাশি দু'টো করে সূরা বা বর্ণনা লিখা হয়েছে আর সেগুলো অনেক স্থানেই পরস্পরবিরোধী। এ কারণেই আমরা তাওরাতের জীবনকথা ও ঘটনাবলিতে প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনা লক্ষ্য করি। বিস্তারিত আলোচনা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' লেখকগণও একথা স্বীকার করেছেন এ থিওরী সম্পর্কে । বর্তমান সময়ে অনসন্ধানে জার্মান পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করেছেন যে,

বর্ণনা লিখা হয়েছে এবং সেগুলো অনেক স্থানেই পরস্পর বিরোধী। এজন্যই আমরা তাওরাতের জীবনকথা এবং ঘটনাবলিতে প্রতি পদে পদে বিপরীতমুখী বর্ণনার মুখোমুখি হই। সর্বশেষ এ থিওরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'এন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার' সংস্করণের 'বাইবেল' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সকল নবিগণের জীবন-চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত রয়েছে বলা যায়?

www.bjilibrary.com

ইঞ্জিলসমূহে হযরত ঈসার জীবনের ঘটনাবলি লিখা রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে লিখা অসংখ্য ইঞ্জিলের মাঝে বর্তমান খিষ্টান জগতের বিরাট অংশ মাত্র চারটি ইঞ্জিলকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অবশিষ্ট ইঞ্জিলগুলো অনির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত রয়েছে। নিজ চোখে সে চারটি ইঞ্জিলের কোন একটির লেখকও হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেননি। এসব ঘটনাবলি তাঁরা কার মুখ থেকে শুনে লিখেছেন এ তাও জানা সম্ভব নয়। বরং সে চারটি কিতাবকে যে চার ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত করা হয়, তাঁদের সাথে এ কিতাবগুলোর সম্পর্ক সঠিক কি-না এ বিষয়েও বর্তমানে সন্দেহের উদয় হয়েছে। কোন যুগে সে কিতাবগুলো কোন ভাষায় লিখা হয়েছিল, সুস্পষ্টরূপে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ঈসায়ি ৬৭ সন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে ইঞ্জিল ব্যাখ্যা উল্লিখিত কিতাবগুলোর রচনাকাল উল্লেখ করেছেন! বর্তমানে হযরত ঈসার জন্ম, মৃত্যু ও ত্রিত্ববাদের শিক্ষাকে কিছু আমেরিকান সমালোচক ও যুক্তিবাদী (Rationalist) বলেছেন যে, হযরত ঈসার অস্তিত্ব নিছক কাল্পনিক এবং তাঁর জন্ম ও ত্রিত্ববাদের বর্ণনা গ্রীকদের ধর্মীয় কাহিনিগুলোই অনুসরণ করা হয়েছে। কেননা পূর্ব থেকেই গ্রীক জাতির বিভিন্ন দেবতা এবং বীরদের সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা বর্তমান ছিল। শিকাগোর বিখ্যাত পত্রিকা 'রূপন কোট'-এ হযরত ঈসার অস্তিত্বকে কাল্পনিক চিহ্নিত করে মাসের পর মাস আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যেসব খৃষ্টানদের বর্ণনা থেকে হযরত ঈসার জীবন সংক্রান্ত যে বিবরণ পাওয়া যায়, এর ভিত্তি

পূর্ণতার প্রতীক

একমাত্র তখনই কোন মানব চরিত্র কর্মজীবনের জন্য চিরস্থায়ী আদর্শরূপে পরিগণিত হতে পারে, যখন তার জীবনী গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা আমাদের চোখের সামনে থাকে এবং তার জীবনের কোন একটি ঘটনা ও রহস্যও অজানার অন্ধকারে পতিত না হয়। বরং মানুষের সামনে তার সমগ্র জীবন-চরিত এবং অবস্থা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট

www.bjilibrary.com

থাকে। অনুরূপ হলেই এ জীবন মানব সমাজের জন্য একটি আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য কি-না, তা যাচাই করা যেতে পারে। যদি এ মানদণ্ডে এবং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্তক এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের জীবনচরিতের যাচাই করা করা যায় তখন দেখা যাবে যে, একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ এ মানদণ্ডে পরিগণিত হতে পারেন না। এ থেকেই জানা যায় যে, শেষ নবি হিসেবেই জগতে আবির্ভাব হয়েছিলেন। আমি আগেই বলেছি যে, মাত্র অগণীত নবির মধ্য থেকে তিন চার জনের জীবনচরিতকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরপরও পূর্ণতার দিক দিয়ে তারা যথেষ্ট বিবেচিত হলো না। চিন্তা করুন, জনসংখ্যার বিচারে জগতে এক-চতুর্থাংশ বুদ্ধের অনুসারী। এরপরও ঐতিহাসিক বিচারে বুদ্ধের জীবন মাত্র নানান কল্পিত কিস্‌সা-কাহিনির সমাহার ব্যতীত আর বিশেষ কিছু আছে বলে বলা যায় না। কিন্তু সে কিস্‌সা-কাহিনিগুলোকে যদি আমরা ঐতিহাসিক মর্যাদা দান করি, তার জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের অনুসন্ধান করি, তাহলে ব্যর্থতার পর্যবসিত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না। এসব কিস্‌সা-কাহিনি থেকে আমরা শুধু এতটুকু জানতে পারি যে, নেপালের 'তরাই' অঞ্চলে কোন এক যুগে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর পুত্রের নাম ছিল গৌতম। তিনি স্বভাবত ছিলেন চিন্তাশীল। যৌবনে পদার্পণ করে এক সন্তানের পিতা হবার পর একদিন ঘটনাক্রমে কিছু দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়। এ ঘটনা তাকে অত্যধিক প্রভাবিত করে।

এরপর স্ত্রী-পুত্র, পরিজন পরিত্যাগ করে বারানসী (কাশী) পৌঁছেন। এরপর পাটলীপুত্র (পাটনা) ও রাজগীরের (বিহার) নগরে বন-জঙ্গল, পাহাড়ে ঘোরাফেরা করতে থাকেন, আর এভাবে কতদিন কাটালেন এরপর গয়ায় কখন একটি গাছের নীচে কিভাবে সত্যের সন্ধান লাভ করেন, কতকাল বারানসী থেকে বিহার পর্যন্ত সর্বত্র নিজ ধর্ম প্রচার করে আর কখন এ জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তা অজানা অধ্যায়েই থেকে যায়। বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা যা জানি, এর সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।

www.bjilibrary.com

একটি ধর্মের প্রবর্তক যরথুষ্ট্রও। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমরা কিছু ধারণা এবং অনুমান ব্যতীত তার জীবনচরিত সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারিনি। এ ধারণা থেকে যা কিছু জানা যায়, তা আমার নিজের ভাষায় না বলে বিংশ শতকের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-সূত্র 'এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা' থেকে 'যরথুষ্ট্র' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে এখানে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আমরা কবিতায় 'লোকগাথার সংশ্লিষ্ট যরথুষ্ট্রের যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছি, তা জিন্দাবেস্তার যরথুষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বরং বিপরীতধর্মী। এ কাহিনির অলৌকিক ব্যক্তিটির মাধ্যমে, এরপর লোকগাথার কিছু কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে আমরা যরথুষ্ট্রের সত্যিকার অবস্থা জানার আশা করা যেতে পারে না। আমাদের পক্ষে আর তা থেকে যরথুষ্ট্রের জীবনের কোন ঐতিহাসিক তথ্যেও সংগ্রহ করা যায় না। যা কিছু পাওয়া যায়, এসব কোনক্রমেই সুস্পষ্ট নয়, অথবা অর্থহীন।[১]

সূচনায় বর্তমানকালের যরথুষ্ট্র সম্পর্কিত রচনাবলির একই প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণের মতে 'তাঁর জন্মস্থান নির্ধারণের বিবরণসমূহ পরস্পর বিরোধী বলে চিহ্নিত।'

যরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল নির্ধারণ সম্পর্কিত গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ এবং আধুনিক গবেষকগণের অনুমান পরস্পর বিরোধী। তাই এক প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ

আমরা 'যরথুষ্ট্রের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে কিছুই অবগত হতে পারি না।'

মোটামুটি, তবুও যা জানি তা হলো-- তিনি আজারবাইজানের কাছে কোন একস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বল্‌খ প্রভৃতি এলাকায় ধর্ম প্রচার করেন এবং রাজা গাশতাসপ তাঁর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিছু অলৌকিক কাজও তিনি সম্পাদন করেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান-সন্ততির জনকও ছিলেন। পরবর্তীতে কোন একস্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ অবস্থায় বলা যেতে পারে এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি সম্পর্কে কোন 'পরিপূর্ণতার' ধারণাও বা কেমন করে করা যেতে পারে। আর তাঁর জীবনইবা কি করে মানুষকে সুপথের সন্ধান দিতে সক্ষম হবে?

---

১. এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা, একাদশ সংস্করণ।

www.bjilibrary.com

হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নবিগণের মাঝে তাঁর জীবনই সর্বাধিক সুপরিচিত। বর্তমান তাওরাত নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য আপাতত এ প্রসঙ্গে না যেয়ে আমরা সে কিতাবের বর্ণনাগুলোকে পুরোপুরি নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমরা এরপরও তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থ থেকে হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন সম্পর্কে কতটুকুই জানতে পারি ফিরাউনের প্রসাদে, তা হলো ঃ

"ফিরাউনের রাজ্যে হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মগ্রহণ করার পর লালিত-পালিত হতে থাকেন। পূর্ণ বয়স্ক হয়ে ফিরাউনদের যুলুম অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দু-একবার বনি ইসরাঈলদের সাহায্য করেন। এরপর মিসর থেকে মাদায়েনে পালিয়ে যান। সেখানে বিয়ে করে বেশ কিছুকাল বসবাসের পর পুনরায় মিসর ফিরে আসেন। ফেরার পথে নবুয়ত প্রাপ্ত হন এবং ফিরাউনের কাছে পৌঁছেন। তিনি সেখানে অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করে বনি ইসরাঈলদেরকে মিসর থেকে নিয়ে যাবার অনুমতির আবেদন করেন। কিন্তু অনুমতি দেওয়া হল না। বাধ্য হয়ে একদিন ফিরাউনের দৃষ্টির আড়ালে নিজ জাতিকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় আল্লাহর আদেশে সমুদ্রের বুকে তাঁর জন্য রাস্তা তৈরি হলে, সে রাস্তা দিয়ে তিনি তাঁর জাতিকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে আরব ও সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। এ খবর পেয়ে পেছনে অনুসরণকারী ফিরাউন তার সেনাদলসহ ছুটে আসে এবং আল্লাহর আদেশে তারা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। পরবর্তীতে তিনি কাফের জাতিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এভাবে জীবন অতিবাহিত করে বৃদ্ধ বয়সে এক পাহাড়ে ইন্তিকাল করেন। তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের শেষ কয়েকটি বাক্যে নিম্নরূপ বলা হয়েছে ঃ

তখন সদাপ্রভূর দাস মোশি (মূসা) সদাপ্রভূর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ পিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। মরণকালে মোশির বয়স একশত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হয় নাই ও তাঁহার তেজের হ্রাস হয় নাই।.... মোশির তূল্য কোনো ভাববাদী ইস্রায়েলের মাঝে আর উৎপন্ন হয় নাই। (৩৪ : ৫-১০)

www.bjilibrary.com

(১) এগুলো হচ্ছে তাওরাতের পঞ্চম গ্রন্থের বর্ণনা। এগুলো দাবি করা হয় হযরত মূসার রচনা বলে। তাই এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আপনাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত যে, এ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বা এর শেষাংশ কখনো হযরত মূসার রচনা নয়। আর সারাজগতে হযরত মূসার এ জীবনী লেখক সম্পর্কেও কেউ অবগত থাকার কথা নয়।

(২) এ গ্রন্থটির উল্লিখিত 'তাঁহার কবরস্থান আজ পর্যন্ত কেহই জানে না।' আর 'মোশির বা মূসা তূল্য কোন ভাববাদী বা নবি ইস্রায়েলের মাঝে আর উৎপন্ন হয় নাই।' অতএব, এ শব্দগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসার জীবনীগ্রন্থের এ সর্বশেষ অংশটি হযরত মূসার মৃত্যুর অনেককাল পরে লিখা হয়েছে যে, সে সময়ের মধ্যে একটি বহু পরিচিত স্মৃতিচিহ্নকেও মানুষ ভুলে যেতে পারে এবং একজন নতুন নবির আসার চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে।

(৩) হযরত মূসা ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। এবার কিন্তু চিন্তা করে দেখুন তাঁর এ সুদীর্ঘ ১২০ বছরের ক'টি তাঁর ঘটনাই বা আমরা জানতে পেরেছি? আমাদের হাতে তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয় কটি অংশ আছে? আমরা তাঁর জন্ম, যৌবনকালে হিজরত, বিবাহ এবং নবুয়তের ঘটনাবলি জানি। এরপর কয়েকটি যুদ্ধের পর বৃদ্ধাবস্থায় ১২০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এ বিষয়গুলোকে বাদও দেওয়া যেতে পারে। কেননা, এগুলো তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে এসব ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। অতএব, মানব-সমাজের বাস্তব আদর্শের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে চরিত্র, স্বভাব এবং জীবন পদ্ধতি। আর এ অবস্থাগুলো হযরত মূসার জীবনীতে অনুপস্থিত। তাছাড়া সাধারণ বিষয়াদি অর্থাৎ মানুষের নাম, বংশ, স্থানের পরিচয়, জনসংখ্যার পরিমাণ এবং আইনগত বিভিন্ন বিষয় তাওরাতের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। এসব বিবরণ ভূগোল, বংশপরিচয় এবং আইন জানার ক্ষেত্রে হয়ত কোন পর্যায়ে প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর কোন কার্যকারিতা থাকার কথা নয় আর এগুলো জীবনচরিতকে পূর্ণতা দানের যোগ্যতা থেকেও বঞ্চিত রেখেছে।

www.bjilibrary.com

হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইসলামের সর্বাধিক কাছের যুগের নবি। বর্তমানে ইউরোপীয় হিসেব অনুসারে তাঁর অনুসারীরা বিশ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, সর্বসাধারণের কাছে এ ধর্মের নবিগণের জীবনচরিত অন্যান্য পরিচিত ধর্মসমূহের প্রবর্তক এবং নবিগণের জীবনচরিতের তুলনায় অত্যন্ত কম প্রকাশিত। এ ব্যাপারে খ্রিষ্টীয় ইউরোপের ঐতিহাসিকগণ মতামত লক্ষ করা যেতে পারে। তারা ব্যাবিলন, আসিরীয়া, আরব, সিরিয়া, মিসর, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং তুর্কিস্তানের হাজার হাজার বছর পূর্বের ঘটনাপ্রবাহ, প্রাচীন গ্রন্থ ও লিপিকা পাঠ করে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, পাহাড় এবং ভূগর্ভ খনন করে জনসমক্ষে উপস্থাপন করেছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের ছিন্নপত্রসমূহ পুনর্বার মেরামত করেছে। কিন্তু হযরত ঈসার জীবন-চরিত তাদের এ অদ্ভুত পুনরুজ্জীবন-ক্ষমতা কোনক্রমেই উদ্ধারে সফল হয়নি। হযরত ঈসা ইঞ্জিলের বর্ণনায় ৩৩ বছর বেঁচে ছিলেন। বর্তমান ইঞ্জিলসমূহের বর্ণনা প্রথম অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেখানে শুধুমাত্র তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরের ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা শুধু তাঁর ঐতিহাসিক জীবনের এতটুকুই জনতে পেরেছি যে, তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জন্মের পর তাঁকে মিসরে নিয়ে আসা হয় এবং শৈশবে অলৌকিক দু-একটি কাজ সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে তাঁর আর কোন কিছুই জানা যায় না। এরপর একান্ত হঠাৎ ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে ধর্মপ্রচার করতে দেখা যায়। পাহাড় এবং নদীর ধারে মৎস্যজীবীদের সমাবেশে বক্তৃতা করে বেড়ান। তাতে অনেক শিষ্য হয়ে যায়। আর ইহুদিদের সাথে কিছু বিতর্কও হয়। ইহুদিরা তাঁকে পাকড়াও করে রাজ দরবারে হাজির করে। সেখানে তাঁকে রূমীয় গভর্ণরের আদালতে বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কবরে তার লাশ পাওয়া যায় না। ভাবনার বিষয় ত্রিশ বছর এবং কমপক্ষে পঁচিশ বছর তিনি কোথায় এবং কিভাবে জীবনযাপন করেছেন, এ তথ্য জগতবাসী জানে না আর কোনদিন জানারও কথা নয়। এ শেষ তিন বছরের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে বা কি ছিল? কিছু অলৌকিক কাজ, বক্তৃতা এ মৃত্যুদণ্ড প্রদান ইত্যাদি বিষয়।

www.bjilibrary.com

আদর্শিক ভিত্তির ব্যাপকতার সমন্বয়

জীবনচরিতের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং পরিগণিত হবার জন্য তৃতীয় কোন বাস্তব আদর্শ হিসেবে শেষ হলো এর ব্যাপকতা। এ ব্যাপকতার অর্থ হচ্ছে, বিভিন্ন মানব শ্রেণির পথ-নির্দেশ এবং আলোকবর্তিকা লাভের ক্ষেত্রে যেসব আদর্শের প্রয়োজন বা প্রত্যেক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন এবং দায়িত্ব এবং কর্তব্য আদায় করার জন্য যে সব দৃষ্টান্ত প্রয়োজন, এর সম্পূর্ণই এ আদর্শ জীবনের ক্ষেত্রে চিহ্নিত থাকা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে দেখা যাবে যে, শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত আর কেউই সে পূর্ণতা লাভে সক্ষম হননি। ধর্ম কী? আল্লাহ এবং বান্দার ও বান্দাদের পরস্পরের ওপর যেসব দায়িত্ব এবং কর্তব্য ও নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো মেনে নেয়া এবং সম্পাদন করা, অথবা এভাবেও বলা যায় যে, আল্লাহর হক এবং বান্দার হক আদায় করার নামই হচ্ছে ধর্ম। এজন্য প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের কর্তব্য হচ্ছে, নিজেদের নবির অর্থাৎ ধর্ম প্রবর্তকগণের জীবন থেকে সেসব হক, দায়িত্ব এবং কর্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করে সে অনুপাতে নিজেদের জীবনকে গড়া এবং পরিচালিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। উভয় দিক দিয়ে আল্লাহর হক এবং বান্দার হক বিস্তারিত বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে একমাত্র ইসলামের নবি ব্যতীত আর সকল পর্যায়ে আপনাকে নিরাশায় পতিত হতে হবেই। মোটকথা অন্যান্য নবিগণের দিকসমূহের কোন দিক কুল-কিনারাই পাওয়া যাবে না।

ধর্ম দু' প্রকার। এক প্রকার ধর্মে আল্লাহকে অস্বীকার করা, যেমন বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম। এ ধর্মগুলোতে আল্লাহ, তার সত্তা, তার গুণাবলি ও তার বিভিন্ন অধিকারের কোন প্রশ্নই আসে না। এজন্য তাদের প্রবর্তকগণের মাঝে আল্লাহ প্রেম, আন্তরিকতা, তাওহীদ ইত্যাদির অনুসন্ধান একেবারেই অর্থহীন। দ্বিতীয় প্রকার ধর্মে আল্লাহ্‌কে কোন না কোন পর্যায়ে স্বীকার করা হয়েছে। এ ধর্মগুলোর প্রবর্তক নবিগণের জীবনেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য সম্পর্কিত ঘটনাপ্রবাহ অনুপস্থিত। আমাদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিশ্বাসের স্বরূপ কী হওয়া উচিত এবং বিশ্বাসের প্রকৃত

www.bjilibrary.com

স্বরূপ কি ছিল? তাছাড়া তাঁরা সে বিশ্বাসে কতটুকু সুদৃঢ় ছিলেন? তাঁদের জীবনচরিতে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা পাওয়া যায় না! সমস্ত তাওরাত পাঠেও দেখা যাবে যে, আল্লাহর তাওহীদ এবং তার নির্দেশাবলি ও কুরবানির শর্তসমূহ ব্যতীত তাওরাতের পাঁচটি গ্রন্থে এমন একটি কথাও উল্লেখ নেই, যা থেকে জানা যেতে পারে যে, আল্লাহর সাথে হযরত মূসার আন্তরিক সম্পর্ক, আল্লাহর আনুগত্য এবং বন্দেগি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি আর আল্লাহর শক্তির বিকাশ তাঁর হৃদয়ে কোন পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। অথচ মূসার ধর্ম যদি চিরস্থায়ী এবং সর্বশেষ ধর্ম হিসেবে এসে থাকে, তখন এসব প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ লিখে রাখা তাঁর অনুসারীদেরই অবশ্যই কর্তব্য ছিল। কিন্তু এরূপ আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তারা এসব কাজে সক্ষম হওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।

ইঞ্জিল হচ্ছে হযরত ঈসার জীবন-মুকুর। এ একটি মাত্র বিষয় 'আল্লাহ' হযরত ঈসার পিতা- ব্যতীত ইঞ্জিলে আমরা এমন আর কিছুই জানতে পারি না, যার মাধ্যমে এ পবিত্র পিতা এবং পুত্রের মধ্যস্থিত সম্পর্কের ধরন চিহ্নিত করা যায়। বুঝা যায় যে, পুত্রের স্বীকারোক্তি থেকে পিতা পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু পুত্র পিতাকে কতটুকু ভালবাসতেন, তা অজানাই রয়ে যায়। আর একথাও জানা যায় না যে, তিনি পিতার আনুগত্য এবং নির্দেশ পালনে কতটুকু বাধ্যগত এবং তৎপর ছিলেন, দিন-রাতে কোন সময় তাঁর সামনে নত হতেন কিনা, 'আজকের খাদ্য রুটি' ব্যতীত আর কখনো কোন বস্তু তার কাছে চেয়েছিলেন কিনা এবং যে রাতে পাকড়াও হন, এর পূর্বে কোন একটি রাতেও পিতার কাছে তিনি কোন প্রার্থনা করেছিলেন কি-না। এমতাবস্থায় আমরা এ ধরনের জীবনচরিত থেকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কী পরিমাণ লাভবান হতে পারি? যদি হযরত ঈসার জীবনে আল্লাহ্‌ এবং বান্দার সম্পর্ক সুস্পষ্ট উল্লেখ হত, তাহলে সাড়ে তিনশো বছর পর প্রথম খ্রিষ্টান রাজাকে নিজ শহরে তিনশো খ্রিষ্টান পণ্ডিতের মজলিস গঠন করে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং আজও বিষয়টি একটি অজানা রহস্যে ঢাকা থাকত না। বান্দার হক সম্পর্কে এবার আলোচনায় করা যাক। তাতে

www.bjilibrary.com

দেখা যাবে, এ ক্ষেত্রেও শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর সকল নবির জীবনই প্রায় অন্ধকারাচ্ছ। বুদ্ধদেব তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনকে পরিত্যাগ করে বন-জঙ্গলের পথ ধরেছেন।

এরপর তিনি তার প্রিয় স্ত্রী যাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, তার এবং একমাত্র পুত্রের সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেননি এবং বন্ধুদের সাহচর্যও তিনি পরিত্যাগ করেন। আর দেশ শাসন ও প্রজা পালনের দায়-দায়িত্ব থেকেও অব্যাহতি উৎস লাভ করে নির্বাণ বা মুক্তি লাভ করাকেই মানব জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ জগতের মানব-সমাজে এমতাবস্থায় যেখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, প্রভু-ভৃত্য, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এবং বন্ধু-বান্ধব সবাই আছে-সেখানে বুদ্ধের জীবনাদর্শ মানুষের কোন কাজে আসে বলে কি কেউ ভাবতে পারে? এমন কোন ব্যাপকতা বুদ্ধের জীবনে কি রয়েছে, যার ফলে তা সংসারত্যাগী ভিক্ষুর সাথে সাথে সংসারবাসী গৃহিনীর জন্যও সমানভাবে অনুকরণযোগ্য হতে পারে? এজন্য তাঁর জীবন তাঁর ধর্মানুসারী ব্যবসায়ীদের জন্য অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনে কোন দিকই কখনো অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। যদি তাই হত. তাহলে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন, তিব্বত ও বর্মায় সকল প্রকার শিল্প, রাজনীতি এবং যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য একদিনেই বন্ধ হয়ে যেত এবং কোলাহল মুখরিত জনপদের পরিবর্তে গড়ে ওঠত বিপুল তরুশ্রেণি শোভিত নির্জন বনানী, পথ-প্রান্তর ইত্যাদি। হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের একটি দিক অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা হচ্ছে তাঁর যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা। এছাড়া তাঁর আদর্শ অনুসারীদের জন্য পার্থিব অধিকার এবং দায়িত্ব কর্তব্য পালনে তাঁর জীবন চরিতে কোন পথ-নির্দেশের উপস্থাপনা নেই। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, ভাই-বোন ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্ক রক্ষায় তাঁর রীতিনীতি কেমন ছিল, সন্ধি ও চুক্তির দায়িত্ব তিনি কিভাবে সম্পাদন করেছেন, কোন কোন কল্যাণকর কাজে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। পীড়িত, ইয়াতীম-মুসাফির ও দরিদ্রদের সাথে আচার-আচরণ কিরূপ ছিল, এসব তথ্য অনুপস্থিত থাকার কারণে হযরত মূসার অনুসারীরা তাঁর জীবনচরিত থেকে কি কোন প্রকার

www.bjilibrary.com

ফায়দা হাসিলে সক্ষম হতে পারে? হযরত মূসার স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল, ভাই ছিল এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনও ছিল। এক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে এটাই যে, তাঁদের সবার ক্ষেত্রে তাঁর নবিসুলভ ব্যবহার সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত ছিল। কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁর বর্তমান জীবনী গ্রন্থগুলোতে অনুসরণযোগ্য কোন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ইঞ্জিলের বর্ণনা মোতাবেক হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মা ছিলেন এবং ভাই-বোনও ছিল এবং রক্ত-মাংসের পিতাও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহ থেকে সেসব আত্মীয়-পরিজনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও ব্যবহারের ধরন প্রকাশ পায় না, অথচ চিরকাল জগতে সেসব সম্পর্কের ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়েছে আর ভবিষ্যতেও হবে। অতএব, ধর্মের সেসব বিরাট অংশ দায়িত্ব পালনের ওপরই নির্ভরশীল। এছাড়া হযরত ঈসা শাসিতের জীবনযাপন করেছিলেন, তাই তাঁর জীবনচরিত, শাসকসুলভ দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত একেবারেই অনুপস্থিত। তিনি বিয়ে করেননি, তাই তাওরাতের প্রথম অধ্যায়ে যে দু'টি দম্পতির মধ্যে মাতাপিতার চেয়েও অধিক শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে, শুধুমাত্র এর মাধ্যমে হযরত ঈসার জীবন পারিবারিক দিক থেকে অনুসরণযোগ্য হতে পারে না। আর সেজন্য জগতের প্রায় সকল লোকই বিবাহিত এবং তারা সবাই সংসার জীবন-যাপন করে, এজন্য জগতের অধিকাংশ অধিবাসী হযরত ঈসার জীবন থেকে পারিবারিক জীবনের কোন শিক্ষা লাভে সক্ষম হয় না। যে কখনো ঘর-সংসার, পুত্র-পরিজন, ধন-সম্পদ, যুদ্ধ-সন্ধি ও বন্ধু-শত্রুর মধ্যকার সম্পর্কের সাথে কোন সংস্রবের মোকাবিলা করেননি, তিনি সেসব বিষয়ে সারাজগতের জন্য কিভাবে আদর্শ হতে পারেন? আজ যদি জগতবাসী তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ করে তাহলে কালই সারাজগতে কবরের নির্জনতা নেমে আসবে, সমস্ত উন্নতি ও প্রগতির তৎপরতা সহসাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর খ্রিষ্টীয় ইউরোপ সম্ভবত এক মুহূর্তও টিকে থাকা সম্ভব হবে না। আর তখন সে আদর্শের অনুসরণে যে দশা হবে তা অবশ্যই ধারনা করা যায়।

www.bjilibrary.com

কর্মজীবনে পরিধি

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে। আর এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ ক্ষেত্রে হচ্ছে কর্মক্ষেত্র। দীনের পথনির্দেশক ও ধর্মপ্রবর্তক যে শিক্ষা দান করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ও কর্মজীবনে এ শিক্ষারই বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের নমুনা দেখা যাবে। তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্রেই তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন করে জন-সাধারণের সম্মুখে কার্যকর প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করাবে।

মনোমুগ্ধকর দর্শনতত্ত্ব, চমৎকার আদর্শ এবং হৃদয় বিমোহিত বাণী যেকোন ব্যক্তি যে কোন সময় উত্থাপন করে যেতে পারে। কিন্তু যে বস্তুটি প্রত্যেক ব্যক্তি সকল মুহূর্তে উত্থাপন করতে পারে না, তা হচ্ছে বাস্তব কাজকর্ম। মানব চরিত্রের উন্নত মান ও পূর্ণতার প্রমাণ তার উত্তম, ও নিষ্কলুষ কথা, চিন্তা-চেতনা এবং নৈতিক ও দার্শনিক আদর্শ নয় আদশ্য হচ্ছে তার বাস্তব কর্মজীবনে তার পদক্ষেপ। যদি এসব মানদণ্ড জগতে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহলে ভাল-মন্দের পার্থক্য মোছে যাবে এবং জগতে শুধু সেসব লোকের আবাসভূমিতে পরিণত হবে, যারা শুধু ফাঁকা বলি আওড়াতে তৎপর। এজন্য আবারো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি কি যে, অগণীত নবি ও ধর্মপ্রবর্তকের মাঝে কে নিজ কর্মজীবনকে এ তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার জন্য উত্থাপন করতে সক্ষম হবেন?

'তোমার আল্লাহকে নিজ মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তোমার দুশমনকেও ভালবাস। যে তোমার ডান গালে চড় মারে, তার দিকে নিজ বাম গালটিও ফিরিয়ে দাও। যে তোমাকে বেকার খাটিয়ে এক মাইল নিয়ে যায়, তার সাথে তুমি দু' মাইল এগিয়ে যাও। যে তোমার কোটটি চায় তাকে তা দিয়ে দাও। যে তোমার জামাটি চায় তাকে তোমার জামাটিও দিয়ে দাও। তোমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করে দাও, তোমার ভাইকে সত্তরবার ক্ষমা কর। কেননা আসমানি বাদশাহর রাজ্যে ধনীর প্রবেশ কঠিন হবে।' এগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু উপদেশ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। কিন্তু বাস্তবে যদি এগুলোকে সত্যে পরিণত করা না হয়, তাহলে এগুলো জীবনচরিতে গণ্য হয় না, বরং এগুলো নিছক

www.bjilibrary.com

উচ্চারণে শিষ্ট কথার সমষ্টিতে পরিণত হয়। শত্রুকে যে পরাজিত করতে পারেনি সে কেমন করে ক্ষমার দৃষ্টান্ত উত্থাপন করতে পারে? যার নিজের কাছে কিছুই নেই, সে কি করে গরিব-মিসকীন ও ইয়াতিমদের দান করতে পারে? যার আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র নেই, সে কেমন করে এদের সম্পর্কে সমগ্র জগতের জন্য আদর্শ স্থাপন করবে? যে কোনদিন পীড়িতের সেবা ও দেখাশুনা করেনি, সে কি করে সে সম্পর্কে উপদেশ দান করবে? যে নিজে কখনো অন্যকে ক্ষমা করার সুযোগ পায়নি, তার জীবন আমাদের মধ্যকার বদমেজাজি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য কি করে আদর্শে পরিণত হওয়া সম্ভব হবে বলে বিবেচনা করা যেতে পারে?

ভেবে দেখুন। সৎকাজ দু' প্রকারের ঃ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। যেমন আপনি কোন পর্বত গুহায় গিয়ে সারা জীবন সেখানে বসে থাকেন, তখন এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলাই সঠিক হবে যে, আপনি শুধু অসৎকাজ ও অসৎবৃত্তি থেকে নিজকে রক্ষা করেছেন। অর্থাৎ আপনি এমন কোন কাজ করেননি যা আপনার জন্য দোষণীয়। কিন্তু এটি শুধু নেতিবাচক কাজ হিসেবে গণ্য হয়। আপনার কাজের ইতিবাচক দিকটি কী? আপনি কি গরিবকে সাহায্য করেছেন? যালিমের সম্মুখে সত্য প্রদর্শনে সচেষ্ট হয়েছেন? ক্ষমা, করুণা, দান, মেহমানদারি, সত্য বলা, সত্যের সাহায্যের জন্য আগ্রহ, প্রচেষ্টা, সাধনা, কর্তব্য সম্পাদন, দায়িত্ব পালন বা কর্মজীবনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় নৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন না করে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই তা সৎকাজে পরিণত হয় না। সৎকাজে শুধু নেতিবাচক দিক নেই বরং বহুলাংশে ইতিবাচক ও বাস্তব কাজের ওপর তা নির্ভরশীল।

বন্ধুগণ! এ আলোচনা থেকে একটি কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে যে, বাস্তব কর্ম জীবন সর্বসমক্ষে প্রকাশিত না হলে কোন জীবনকে কখনো 'আদর্শ জীবন' ও অনুসরণযোগ্য আখ্যা প্রদান করা যায় না। কেননা মানুষ এ জীবনে কিসের অনুসরণ করবে? তার কোন আদর্শ আজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমাদের তো যুদ্ধ-সন্ধি, দারিদ্র্য-ঐশ্বর্য, বিবাহিত-অবিবাহিত, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক, বান্দার সাথে সম্পর্ক, শাসক-শাসিত,

www.bjilibrary.com

শান্তি-অশান্তি, কোলাহল-নির্জনতা অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কথায় নয়, কাজের দৃষ্টান্ত। কিন্তু একথা বলা হলে মোটেই বাগ্মিতা বা কবিত্ব করা হবে না যে, এ মানদণ্ডেও একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর অন্য কারোর জীবনচরিতে টিকবে না। প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আজ যা কিছু বলেছি, তা চিন্তা-চেতনার আলোকে পুরোপুরি বুঝে নিন। আমি একথাই বলতে চেয়েছি যে, আদর্শ জীবন হিসেবে যে মানুষের জীবনকে গ্রহণ করা হবে, এবং যে মানব-চরিত্রকে অন্য মানুষের জন্য অনুসরণীয় বলে নির্বাচিত করা হবে, তার জীবনচরিতে চারটি বিষয় উপস্থিত থাকা একান্তই প্রয়োজন।

এ চারটি বিষয় হলো, ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা, জীবনচরিতের ব্যাপকতা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা এবং সামঞ্জস্যশীল কর্মজীবন। আমি যা বলছি এর অর্থ এটাই নয় যে, অন্যান্য নবিগণের জীবন তাঁদের যামানায় এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না। বরং আমার বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে, পরবর্তীকালে তাঁদের যে জীবনচরিত রচিত হয়েছে বা আমাদের কাছে পৌঁছেছে, তা এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে নয়। মানবিয় জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ একেবারেই সীমিত।

এজন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে ভুল করে বা ভুল পথে পরিচালিত হয়– তখন প্রয়োজন হয় সংশোধনের। হয়ত কিছু কিছু ভুল ব্যক্তি নিজেই সংশোধন করতে পারে নিজ অভিজ্ঞতায়, কিন্তু এর পরিধিও সীমিত। তাই প্রয়োজন এক্ষেত্রে অপরের দিক-নির্দেশনায় বা অপরকে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করা। আর এ অবস্থাও ছিল আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। এ থেকে একথাই প্রমাণ হবে যে, সেসব নবিগণ বিশেষ যামানা ও বিশেষ জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাই তাঁদের চরিত্র ও জীবনাদর্শ পরবর্তীকালের মানুষের জন্য সংরক্ষিত থাকার মোটেও প্রয়োজন ছিল না। মানুষের জন্য একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই কিয়ামত পর্যন্ত এবং সমগ্র জগতের অনুসরণযোগ্য ও আদর্শ স্বরূপ এ পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এজন্য সর্বদিক দিয়ে

www.bjilibrary.com

তাঁর চরিত্র ও জীবনের ঘটনাবলি পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী হিসেবে সংরক্ষিত থাকার প্রয়োজন ছিল এবং এটিই নবিগণের আগমন পরম্পরা শেষ হবার শ্রেষ্ঠতম, চূড়ান্ত ও সবচেয়ে অধিক কার্যকর প্রমাণিত উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

কেননা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে যুগ সন্ধিক্ষণে প্রেরিত হয়েছিলেন সে সময়ের সমাজ সম্পর্কে জানতে হলে এ কথাই বলা যায়, তা ছিল অজ্ঞতার যুগ। তখন মানুষের আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটেছিল, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ছিল, সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা, সামান্য কিছু চতুর লোক মানবতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় মত্ত হয়েছিল। এ সমাজের সদস্যদের সংশোধন করা কোন সহজসাধ্য বিষয় ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রিসালাতের যেসব দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল এর মাঝে উল্লেখযোগ দিক ছিল পরিশুদ্ধিকরণ ও সংশোধন।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ (পবিত্র) করেন, আর তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, যদিও তারা ইতোপূর্বে ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত।" (সূরা জুমআ : ২)

অতএব, প্রাসঙ্গিক পর্যায়টি ব্যাপকার্থক। ব্যক্তির দেহ-মন, আকিদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সমাজ সংস্কৃতি, রীতিনীতি সকল কিছুই সংশোধন কর্মের আওতাধীন। পরিশোধন ও সংশোধন আল্লাহ্‌র সুন্নাত।

www.bjilibrary.com

তিনি এমনকি নিজ নবিগণের জন্যই তা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার স্রষ্টা আমাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন আর উত্তমরূপেই তা সম্পন্ন করেছেন।

কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُومٌ ـ

"অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়। আপনি মাছওয়ালা ইউনুছ-এর ন্যায় অধৈর্য হবেন না।

(সূরা কালাম : ৪৮)

অতএব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের অনেক নবির ক্ষেত্রেই দাওয়াতী দিক ছিল উপেক্ষিত। কেননা তাঁদের এসব অবস্থা অবলম্বন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল না।

===o===

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ঐতিহাসিক ভিত্তির অবদান

এবার আমরা এ চারটি মানদণ্ডে ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন-চরিতের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করব। এর সর্বপ্রথম মানদণ্ডটি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভিত্তি। এ বিষয়ে সমগ্র জগত ঐক্যমত পোষণ করে যে, ইসলাম তার নবির এবং একমাত্র নবিরই নয় বরং তাঁর পবিত্র জীবনের সাথে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যক্তির পরিচয় ও বৃত্তান্ত এমন সুচারুভাবে সংরক্ষণ করেছে যে, আজও তা সমগ্র জগতের জন্য একটি বিস্ময়ে পরিণত হয়ে রয়েছে। যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ এবং জীবন সম্পর্কিত নানা বিষয়ের বিবরণ লেখা ও সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন, তাঁদেরকে হাদিস ও রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী বা মুহাদ্দিস ও 'আরবাবে সিয়ার' অর্থাৎ জীবনীকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ গোষ্ঠীতে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তাবে'ঈন (রহ.) এবং পরবর্তী চতুর্থ হিজরির ব্যক্তিগণ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সকল হাদিস এবং রেওয়ায়েতসমূহ বিধিবদ্ধ হবার পর সেসব বর্ণনাকারীর নাম, পরিচয়, ইতিহাস, জীবনচরিত এবং আচার-আচরণও রয়েছে। আর তাঁদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। তাঁদের সম্পর্কে লিখা সে বৃত্তান্তের নাম 'আসমাউর রিজাল'। প্রখ্যাত জার্মান গবেষক ডক্টর স্প্রেণগার ১৮৫৪ সনে এবং এর পরবর্তীকালেও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারিও। তাঁর সময়কালে তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে ওয়াসক্রীমারের সম্পদনায় মুসলিম ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর 'মাগাযী' গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয় এবং সাহাবা চরিত সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজারের 'ইসাবা ফী আহওয়ালিস সাহাবা' মুদ্রিত হয়। ডাঃ স্প্রেণগারের অভিমত অনুযায়ী[১] তিনিই সর্বপ্রথম ইউরোপিয়ান গবেষক

---

[১]. On the origin and progress of writing down historic facts among Musalmans.

www.bjilibrary.com

ও লেখক যিনি মূল আরবি গ্রন্থগুলোর মাধ্যমে 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' রচনা করেছেন[২] এবং তা বিরোধিতা করেই লিখেছেন। তিনিই কলকাতায় ১৮৫৩-৬৪ সনে মুদ্রিত 'ইসাবার' ইংরেজি সংস্করণে লেখা ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

"আজও জগতে এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং নেই, যারা মুসলমানদের মত 'আসমাউর রিজালের' বিরাট তথ্যভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে।

অতএব, এর মাধ্যমেই লেখা পাঁচ লাখ লোকের বিবরণ জানা যায়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের অন্তিম বছর বিদায় হজ্বের সময় উপস্থিত। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল প্রায় লাখের কাছাকাছি। আজ তাঁদের মধ্য থেকে এগার হাজার ব্যক্তির নাম ও পরিচয় লেখা আকারে ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো এজন্য লেখা হয়েছে যে, তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও জীবন চরিতের কিছু না কিছু অংশ বিশেষ করে অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছেন।

অর্থাৎ তাঁরা রেওয়ায়েত বা বর্ণনার দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করেছেন। এ কারণেই তাঁদের জীবন ঐতিহাসিক ভিত্তিতে যাচাই করার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন এবং প্রায় ৪০ হিজরি পর্যন্ত তখনও প্রবীণ নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ জীবিত ছিলেন। যে সকল সাহাবা অল্পবয়স্ক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় ৬০ হিজরিতেও বিপুল সংখ্যক সাহাবা জীবিত ছিলেন এবং এ শতক সমাপ্তির পর নবুয়তের চেরাগ থেকে সরাসরি সাহাবা আলোকপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি চেরাগ প্রায় নিভে গিয়েছিল। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন শহরে সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবাগণের নাম ও মৃত্যু বছর এরূপ ঃ

---

[২]. ১৮৫৪ সনে লিখেছেন এবং এলাহাবাদ থেকে প্রকাশ হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ক্রমিক	নাম	শহরের নাম	মৃত্যু সন
১	আবূ ইমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	সিরিয়া	৮৬ হিজরি
২	আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস ইবনে জুয্আ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	মিসর	৮৬ হিজরি
৩	আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	কুফা	৮৭ হিজরি
৪	সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	মদিনা	৯১ হিজরি
৫	আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু	বসরা	৯৩ হিজরি

এ তালিকায় সর্বশেষে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নাম এসেছে। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ খাদেম। তিনি দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন এবং ৯৩ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।

প্রথম হিজরি থেকে তাবেঈন অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের ছাত্রগণের যুগ শুরু হয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর দর্শন থেকে বঞ্চিত ছিলেন বা তাঁদের বয়স এত কম ছিল যে, তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনার সুযোগই তাঁদের হয়ে ওঠেনি। যেমন জন্মগ্রহণ করেন 'আবদুর রহমান ইবনে হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৩ হিজরিতে, কয়েস ইবনে আবি হাযেম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ৪ হিজরিতে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ১৪ হিজরিতে। মুসলিম বিশ্বের চারদিকে সাহাবায়ে কিরামের পর তাবেঈগণ দলে দলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন বৃত্তান্ত, হাল-অবস্থা, নির্দেশাবলি ও বিচার-ফয়সালা সম্পর্কিত বিষয়গুলোর শিক্ষাদান ও প্রচারের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তাঁদের মোট সংখ্যা কত ছিল? এর জবাবে আমি ইবনে সাআদের বরাত দিয়ে শুধুমাত্র মদীনার তাবেঈগণের সংখ্যা উল্লেখ করছি। প্রথম কাতারের তাবেঈন অর্থাৎ যাঁরা নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণকে দেখেছেন আর তাঁদের কাছ থেকে বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল এবং ঘটনাবলি শোনেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ১৩৯ জন। দ্বিতীয় কাতারের তাবেঈন অর্থাৎ যারা মদীনায় সাধারণ সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাঁর কাছে হাদিস শুনেছেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮৭৩। এভাবে এসে তাবেঈগণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫৫ জন। এ পরিসংখ্যান শুধুমাত্র একটি শহরেরই।

www.bjilibrary.com

অতএব, তা থেকেই মক্কা তায়েফ, বসরা, কুফা, দামেশক, ইয়ামন ও মিসর ইত্যাদি এলাকার তাবেঈগণের সংখ্যা অনুমান করা যেতে পারে। তাঁরা নিজেদের শহরে সাহাবাগণের শিষ্যত্ববরণ করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজের প্রচার ও প্রসারই ছিল তাঁদের দৈনন্দিন কাজ। এ সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ করা হলে দেখা যায়। প্রায় প্রত্যেক সাহাবি যা কিছু রেওয়ায়েত করেছেন, তার প্রত্যেকটি রক্ষা ও গণনা করা হয়েছে। এ ধারা মোতাবেক অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিতের অবস্থা এবং বাণীসমূহ সংগ্রহে কত উন্নত সুব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের ক্ষেত্রে নিচে উল্লিখিত সাহাবাগণের রেওয়ায়েত পরিমাণ।

ক্রমিক নং	নাম	হাদিসের সংখ্যা	মৃত্যু সন
১	হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	৫৩৭৪	৫৯ হিজরি
২	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৬৬০	৬৮ হিজরি
৩	হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২২১০	৫৮ হিজরি
৪	হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৬৩০	৭৩ হিজরি
৫	হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৫৬০	৭৮ হিজরি
৬	হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১২৮৬	৯৩ হিজরি
৭	হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১১৭০	৭৪ হিজরি

উল্লিখিত এসব সাহাবাগণের রেওয়ায়েতই আজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী ও চরিতের বৃহত্তম অংশ হিসেবে চিহ্নিত ও পরিগণিত। তাঁদের মৃত্যুর 'সময়কালের' প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায়, বোঝা যাবে যে, তাঁরা এত শেষ পর্যায়ে ইন্তিকাল করেছেন, যার কারণে তাঁদের কাছ থেকে লাভবান হবার এবং তাঁদের রেওয়ায়েতসমূহ কণ্ঠস্থ ও লেখার মত লোকের সংখ্যা অসংখ্য হয়েছে। তখনকার যুগে এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করার নামই ছিল 'ইল্‌ম' আর তাই ছিল দীন-দুনিয়া উভয় পর্যায়ের সম্মান লাভের মাধ্যম। তাই অগণীত সাহাবা যা কিছু

www.bjilibrary.com

দেখেছিলেন ও জেনেছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ بَلِّغُوْا عَنِّىْ 'আমার কাছে থেকে যা কিছু শোন বা দেখ তা অন্যের কাছে পৌছে দাও'! অথবা فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ (যে আমাকে দেখেছে ও আমার কাছে থেকে শুনেছে, সে যেন তা তাদের কাছে পৌছে দেয়, যারা এ থেকে বঞ্চিত) অনুযায়ী নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদেরকে শোনানোর ও জানানোর কাজে সদাসর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। বলা যায়, এটিই ছিল তাঁদের প্রতিদিনের জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ। তাই সাহাবাগণের পরবর্তীতে সাথে সাথেই নতুন যুবদল এসব তথ্যসমূহ সংরক্ষণের খিদ্মতে নিয়োজিত থাকার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রত্যেককেই প্রতিটি ঘটনার কথা হুবহু স্মরণ রাখার জন্য মুখস্থ করতে হত এবং সেগুলো বারবার আওড়াতে হত। প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করতে হত। কেননা যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কথা এবং কাজের প্রচারের ওপর জোর দিয়েছেন, সেখানে এ ভীতিও প্রদর্শন করেছেন যে, 'যে আমার সম্পর্কে ইচ্ছাকৃত কোন ভুল বা মিথ্যা বলবে, তার স্থান হবে জাহান্নামে।' এ সতর্কতার কারণে নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণও কোন হাদিস বর্ণনা করার সময় অত্যন্ত সচেতন এবং ভয়ে কম্পিত হতেন। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাযিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কোন একটি কথা উল্লেখ করেন। তখন তাঁর চোহারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভয়ে তিনি কেঁপে ওঠে, এরপর বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই বলেছেন বা প্রায় অনুরূপ এ ধরনের কথাই।'

জগতের ইতিহাসে স্বভাবতই আরবদের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর হিসেবে গণ্য। তাঁরা একাধিক্রমে শত শত কবিতা আওড়াতে পারতেন। তাছাড়া প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে এটাই যে, মানুষ যে শক্তিকে যত বেশি কাজে ব্যবহার করে, সেটি তত বেশি উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। তাই বলা যায়, সাহাবা এবং তাবে'ঈগণ স্মৃতিশক্তিকে উন্নতির শেষ শিখরে

www.bjilibrary.com

পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এমনভাবে এক একটি হাদিস ও এক একটি ঘটনাকে মুখে মুখে শুনে স্মরণ করে রেখেছেন, যেমন উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে মুসলমানরা যেভাবে কুরআন মুখস্থ করেন। মুখে মুখে শুনে এক একজন মুহাদ্দিস কয়েক হাজার এবং কয়েক লাখ হাদিস মুখস্থ করে স্মরণ রেখেছেন, এরপরও স্থায়ীভাবে মনে রাখার জন্য পরে লেখে রেখেছেন। কিন্তু যতক্ষণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে তাঁরা মুখে মুখে আওড়াতে সক্ষম না হতেন, ততক্ষণ বিজ্ঞ সমাজে নির্ভরযোগ্য বিবেচনা হতেন না তাঁরা। এ জন্যই তাঁরা নিজেদের লিখা নোটগুলোকে নিন্দনীয় বিষয়ের মত গোপন করে রেখেছেন, যেন কেউ তাঁদের স্মরণশক্তিকে দুর্বল বলে না ভাবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! কিছু প্রাচ্যবিদ (মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে) পণ্ডিত ও শিক্ষিত মিশনারি-যাদের মধ্যে উইলিয়াম মূর ও গোল্ডজার সবেচেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিসগুলোর সংগ্রহ ও লেখে রাখার কাজ তার ইন্তিকালের ৯০ বছর পর শুরু হয়েছে বলে ইতিহাস এগুলোর ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এজন্য আমি এ সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত বিবরণ উত্থাপন করব এবং সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ রেখেছেন, কি পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, কিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের কাজে এ আমানত সোপর্দ করেছেন এর সবই বলব। আপনারা এ বর্ণনা থেকে নিজেরাই ধারণা করতে পারবেন, এ রেওয়ায়েতসমূহ অনেক পরে সংগৃহীত ও লেখা হলেও এগুলোর ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতার ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ করা যেতে পারে না। সাহাবাগণ সাধারণভাবে তিনটি কারণে হাদিস লেখে রাখা সঙ্গত মনে করেননি।

(১) প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লেখে রাখতে নিষেধ করে বলেছেন, 'আমার কাছে থেকে কুরআন ব্যতীত আর কিছুই লেখবে না'।

www.bjilibrary.com

لَا تَكْتُبُوا عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْاٰنَ۔

এর প্রকৃত কারণ এটাই ছিল যে, সাধারণ লোকদের কাছে কুরআন ও অকুরআন মিশে যাবার আশঙ্কা অধিক পরিমাণে ছিল। কাজেই কুরআন যখন মুসলমানদের কাছে পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়ে যায়, তখন শেষ দিকে তিনি নিজেই কোন কোন সাহাবাকে হাদিস লিখে রাখার অনুমতি প্রদান করেন। এরপরও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অধিকাংশ সাহাবা এগুলো লেখে রাখার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে তৎপর ছিলেন।

(২) তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ লেখার পর জনগণ আর সেগুলোর প্রতি তেমন আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করবে না এবং লেখা সংকলনের সেগুলো মুখস্থ করার ও স্মরণ রাখার জন্য পরিশ্রমে উদ্যোগী হবে না। শেষ পর্যন্ত এ আশঙ্কা নির্ভুল প্রমাণিত হয়। যতই বইয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমান্বয়ে বক্ষ-সংরক্ষিত জ্ঞান ততই হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে তাঁদের ধারণা এটাও ছিল যে, যোগ্য-অযোগ্য সংকলনের কাজ হাতে নিয়ে জ্ঞানী হবার দাবি করবে। এটাও সত্যে প্রমাণিত হয়েছে পরবর্তীকালে ।

(৩) আর তৃতীয় কারণ ছিল এটাই যে, তখন পর্যন্ত আরবে কোন বিষয় লেখে নিয়ে এরপর মুখস্থ করাকে দোষ বা দুর্বলতার কাজ বলে গণ্য করা হত। উপরোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে লোকেরা এ কাজকে তাদের দুর্বল স্মরণশক্তির কথা মনে করেছে। যদিও কোন কথা লেখে রাখা হলেও তারা তা লুকাতে বাধ্য হত! মুহাদ্দিসগণ মনে করতেন, লেখে মনে রাখার চেয়ে মুখস্থ করা অধিক পরিমাণে সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা। লেখা স্মারককে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা অসম্ভব। কেননা কেউ এর মধ্যে কোন প্রকার যোগ-বিয়োগ করতে পারে, এ আশঙ্কা সব সময়ই থাকে। কিন্তু যে কথা অন্তরে অন্তস্থলে অঙ্কিত হয়ে যায়, এর মাঝে কোন রদবদল অসম্ভব হবে।

সর্বপ্রথম আপনাদেরই মজলিসে একথা উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, শত বছর অথবা নব্বই বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও

www.bjilibrary.com

কার্যাবলিকে মৌখিক বর্ণনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল– এ তথ্য সম্পূর্ণভাবেই ভুল। আর এ ভুলের প্রকৃত কারণ হচ্ছে এটাই যে, ইমাম মালিক (রহ.)-এর মুয়াত্তাকে প্রথম হাদিস গ্রন্থ এবং ইবনে ইসহাকের 'আল-মাগাযী' কে যুদ্ধবিগ্রহ ও নবিচরিত সংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ হিসেবে মনে করা হয়। এ দু'জন সমকালীন ছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে ১৫১ ও ১৭৯ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন। এজন্য হিজরি দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধেই হাদিস এবং জীবনচরিত সংকলনের সূচনা যুগ মনে করা হয়।

১০১ হিজরিতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) ইন্তিকাল করেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বড় ধরনের আলেম ও মদীনার গভর্নর পদেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯৯ হিজরিতে খিলাফত লাভ করেন। এরপরই তিনি মদিনা মুনাওয়ারার কাজি ও হাদিস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযমকে এ প্রসঙ্গে নির্দেশ প্রদান করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত ও হাদিস সংকলন এবং লেখার কাজে উদ্যোগী হতে। কেননা আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হচ্ছে যে, 'ইল্‌ম ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' এ ঘটনাটি 'তা'লীমাতে বুখারী' 'মুয়াত্তা' এবং 'মুসনাদে দারামী' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। খলীফার এ নির্দেশটি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয় এবং রাসূলুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস ও সুন্নাতসমূহ লেখে রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়। (তথ্য : 'মুখতাসার জামে-বায়ানুল ইল্‌ম লি-ইবনে আবদুলবার,' ৩৮ পৃষ্ঠা মিসরে মুদ্রিত) এ মহিমান্বিত কাজের জন্য আবূ বকর ইবনে মুহাম্মদ, ইবনে আমর ইবনে হাযমকে নির্বাচন করার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তিনি নিজে ইমাম এবং মদীনার কাজি ছিলেন। কিন্তু তা ছাড়াও এ নির্বাচনের উপযুক্ততার কারণ ছিল এটাই যে, তাঁর খালা আম্মারা হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রধানতম শিষ্য ছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছ থেকে তিনি যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, তা সমস্তই আবূ বকর ইবনে হাযমের কাছে পূর্ব থেকেই সংগৃহীত ছিল। তাই হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহ.) তাঁকে বিশেষ করে হযরত আম্মারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর রেওয়ায়েতগুলো লেখার জন্য নির্দেশ করেছেন।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে লেখা হাদিসসমূহ

আরও অগ্রসর হয়ে আমি দাবি করছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই হাদিস ও সুন্নাত এবং তাঁর নির্দেশাবলি ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহের কাজের সূচনা হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি যে ভাষণ দেন তা বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, আবূ শাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নামের এক ইয়ামনি সাহাবির আবেদনে তিনি ভাষণটি লেখে তাঁকে সোপর্দ করার নির্দেশ প্রদান করেন। (তথ্য : দ্রষ্টব্য ঃ বাবু কিতাবাতিল ইল্‌ম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন দেশের শাসকদের নামে যেসব পত্র প্রেরণ করেন, তা ছিল লেখা আকারে। মিসরের বাদশাহ মুকাওকাসের নামে তিনি পত্র প্রেরণ করেন, দশ বার বছর আগে মিসরের একটি ঈসায়ী গির্জায় সংরক্ষিত একটি পুরাতন কিতাবের মলাটের সাথে তা পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্রটি লেখিয়েছিলেন এটা সে মূল পত্র। এর আলোকচিত্র বর্তমানে অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এটি লেখা ছিল প্রাচীন আরবি বর্ণমালায় এবং হাদিস গ্রন্থসমূহে যেসব শব্দ সহকারে এ পত্রটি উল্লেখ হয়েছে, এ পত্রের মোহরে নামের অক্ষর ও শব্দগুলো অবিকল সেরূপই দেখা যায়। এতে তা ইসলামি রেওয়ায়েতের নির্ভুলতার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে। হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ব্যতীত কারোর আমার চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদিস স্মরণ নেই। আমার চেয়ে তাঁর কাছে অধিক পরিমাণ হাদিস সংরক্ষিত থাকার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যা শুনেছেন সবই লেখে রেখেছেন। কিন্তু আমি লেখে রাখিনি।' (তথ্য : বুখারী ঃ বাবু-কিতাবাতিল ইল্‌ম) আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে উল্লেখ রয়েছে যে, অনেক সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ক্রুদ্ধ অবস্থায় আবার কখনো প্রফুল্ল অবস্থায় থাকেন, অথচ তুমি সকল অবস্থায়ই সবকিছু লেখে রেখেছ। এ কথার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লেখা বন্ধ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মুখের

www.bjilibrary.com

দিকে ইশারা করে বললেন, 'তুমি লেখতে থাক, এ স্থান থেকে অর্থাৎ মুখ থেকে যা বের হয় তা সত্য হয়ে থাকে।'

(তথ্য : আবূ দাউদ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর এ সংকলনের নাম রাখেন 'সাদেকা'। (তথ্য : ইবনে সা'আদ ঃ দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২৫)

তিনি বলতেন ঃ আমি 'মাত্র দুটি জিনিসের জন্য জীবিত থাকার আকাঙ্ক্ষা করেছি। এরমাঝে একটি হচ্ছে এটাই 'সাদেকা' এবং সাদেকা এমন একটি কিতাব যা রাসূলুল্লাহ (সা)-র পবিত্র মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লেখে রেখেছি। (তথ্য : দারামী ঃ ৬৯ পৃষ্ঠা)

মুজাহিদ (রহ.) বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর এর কাছে কিতাব রক্ষিত দেখেছি। তখন জিজ্ঞেস করেছি, এটি কি কিতাব? তিনি বললেন, সাদেকা। এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লেখেছি। এ কিতাবে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝখানে কেউ ছিল না। (তথ্য : ইবনে সা'আদ ঃ ২-২-১২৫) বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, মদীনায় হিজরতের কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের আদমশুমারি করে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন। এ তালিকায় ছিল এক হাজার পাঁচশত নাম। (তথ্য : বাবুল জিহাদ)

বর্তমান বুখারীর দুপৃষ্ঠা ব্যাপী যাকাত সম্পর্কিত যেসব নির্দেশ, বিভিন্ন বস্তুর ওপর দেয় যাকাত এবং এর হার সম্পর্কে যে আলোচনা আছে, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই লেখা আকারে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আবু বকর ইবনে অমর ইবনে হাযমের খান্দানে এবং আরও কিছু সংখ্যক লোকের কাছেও এ নির্দেশনামা সংরক্ষিত ছিল। (তথ্য : দারে কুত্নী, কিতাবুয যাকাত ঃ ২০১ পৃষ্ঠা) যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম থেকে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলিও লেখা ছিল। (তথ্য : দারে কুত্নী ঃ ২০৪ পৃষ্ঠা)

www.bjilibrary.com

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সম্বলিত একখানা পুস্তিকা ছিল। এটাকে তিনি তাঁর তরবারির খাপে রেখে হিফাযত করতেন। এর মধ্যে কিছু হাদিস এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনামা লেখা ছিল। কিছু সংখ্যক লোক এটা দেখার ইচ্ছা পোষণ করায় তিনি তরবারির খাপ থেকে তা বের করে সকলকে দেখান।

(তথ্য : বুখারী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০৮৪, ১০৩০)

হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের মধ্যে যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়, তা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু লেখেছিলেন। এর এক কপি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাছে রেখেছিলেন। (তথ্য : ইবনে সাআদ, মাগাযী ৭১ পৃঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে হাযম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় একটি লেখা নির্দেশনামা তাঁকে দিয়েছিলেন। তাতে ফরযসমূহ, সাদকা, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি নানা বিষয় সম্পর্কে অনেক নির্দেশনামা ছিল। (তথ্য : কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে পত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকীম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে পৌঁছেছিল, এতে মৃতপ্রাণী সম্পর্কে লেখা হেদায়াত ছিল। (তথ্য : মু'জামে সাগীর, তাবরানী, ২১৭) ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশ হাদারামাউত রওয়ানা করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিশেষভাবে একটি নির্দেশনামা প্রেরণ করেন। তাতে নামায, রোযা, সুদ, শরাব ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর নির্দেশ ছিল। (তথ্য : তাবরানী, সাগীর, ২৪২ পৃষ্ঠা) কোন এক সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এক জনসমাবেশে জিজ্ঞেস করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর 'দীয়াত' (ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ) থেকে স্ত্রীকে কি পরিমাণ দান করেছেন তা কি কারোর জানা আছে কি? তখন দিহাক ইবনে সুফিয়ান দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি জানি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এটি লেখিয়ে পাঠিয়েছিলেন।'

(তথ্য : দারে কুতনী, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

www.bjilibrary.com

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) তাঁর খেলাফতকালে (৯৯ হিজরি–১০১ হিজরি) সদকা বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান তালাশ করার জন্য মদীনাবাসীদের কাছে দূত পাঠালে আমর ইবনে হাযমের খান্দানে তা পাওয়া যায়। (তথ্য : দারে কুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনবাসীদের কাছে যে লেখা নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র পাক-পবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে, গোলাম কেনার পূর্বে তাকে আযাদ করা যেতে পারে না এবং বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া যায় না। (তথ্য : দারামী, ২০৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্ভবত ইয়ামন থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লেখা পত্র মারফত শাক-সব্জির যাকাত আছে কি-না জানতে চান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখা আকারেই জবাব দেন ঃ 'শাক-সব্জির যাকাত নেই।' (তথ্য : দারেকুতনী, ৪৫ পৃষ্ঠা)

মারওয়ান খুতবায় বর্ণনা করেন যে, মক্কা হারেমের অন্তর্গত। তখন রাফে ইবনে খাদীজ সাহাবি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চীৎকার করে বলেন ঃ 'এবং মদীনাও হারেমের। বিষয়টি আমার কাছে লেখা আকারে বিদ্যমান আছে। তুমি যদি ইচ্ছা কর আমি তা পড়ে শোনাব।'

(তথ্য : মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

দিহাক ইবনে কায়েস নোমান ইবনে বশীর সাহাবিকে লেখেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর নামাযে সূরায়ে জুমআ ব্যতীত আর কোন সূরা পড়তেন? তিনি জবাবে লিখেন ঃ وَهَلْ اَتَاكَ পড়তেন। (তথ্য : মুসলিম, ৩২৩)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উত্বা ইবনে ফারকাদকে পত্রে লেখেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

(তথ্য : মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব নির্দেশ বিভিন্ন লোককে দিয়ে লেখিয়ে দেন বা তাদের কাছে পাঠান। আমাদের কাছে এমন সব দলিল-প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ও সুন্নাতসমূহকে পুস্তকাকারে সংকলন করেন বা সংকলন করার চেষ্টা করেন। হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর খেলাফতকালে হাদিসের একটি সংকলন প্রস্তুত

www.bjilibrary.com

করান, এরপর তা পছন্দ না হওয়ায় নষ্ট করে দেন। (তথ্য : তাযকিরাতুল হুক্কাম) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ বিষয়টির তাঁর খেলাফতকালে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেচনা করে এ ব্যাপারে নানা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। এরপর তিনি আর অগ্রসর হতে সাহস করেননি। এমাত্র আপনারা শুনেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিজে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতিক্রমে একটি পুস্তক রচনা করেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ লেখা ছিল। অনেকেই এ পুস্তকটি দেখতে আসে এবং তিনি তা লোকদেরকে দেখাতেন।

(তথ্য : তিরমিযী, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ফতওয়াসমূহের অধিকাংশই লেখা আকারে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খেদমতে হাযির করা হয়। (তথ্য : মুসলিম ভূমিকা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর রেওয়ায়েতসমূহের বিভিন্ন লেখা সংকলন ছিল। কিছু তায়েফবাসী তাঁর এমনি একটি সংকলন তাঁকে পড়ে শুনাবার জন্য হাজির করেন।

(তথ্য : কিতাবুল ইলাল, তিরিমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা)

সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লেখে রেখেছেন।

(তথ্য : দারামী, ৬৯ পৃষ্ঠা)।

'আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পুস্তক 'সাদেকা' তাঁর প্রপুত্র আমর ইবনে শোআইবের কাছে সংরক্ষিত ছিল এবং তিনি তাঁর দাদার কিতাব দেখে রেওয়ায়েত করতেন বলে তাঁকে দুর্বল ভাবা হত। তিনি নিজে হাফেজ ছিলেন না। (তথ্য : তাহযীব, ৮-৪৯)

ওহাব তাবেঈ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্র রেওয়ায়েতসমূহ সংকলন করেন। এটি ইসমাঈল ইবনে আবদুল করীমের কাছে রক্ষিত ছিল এবং তাকে এজন্য দুর্বল মনে করা হত। (তথ্য : তাহযীব, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্র রেওয়ায়েতসমূহের দ্বিতীয় সংকলন প্রণয়ন করেন সুলায়মান ইবনে কায়েস ইয়াশকারী এবং হাদিস শাস্ত্রের ইমাম ও তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত আবু যুবাইর। আবু সুফিয়ান ও শা'বী হযরত জাবের পুস্তকটি তাঁর নিজ মুখেই শোনেছেন।

(তথ্য : তাহযীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

www.bjilibrary.com

সুমরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে থেকে তাঁর পুত্র সুলায়মান একটি হাদিস পুস্তক রেওয়ায়েত করেন এবং তাঁর কাছে থেকে রেওয়ায়েত করেন তাঁর পুত্র হাবিব। (তথ্য : তাহযীবুত তাহযীব, ৪-১৯৮)

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-যাঁর চেয়ে অধিক সংখ্যক হাদিস সাহাবাগণের মধ্যে আর কেউ মুখস্থ করেননি– তাঁর কিছু সংখ্যক রেওয়ায়েত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ সংকলন করেন। হাদিসশাস্ত্রে 'সহীফায়ে হাম্মাম' নামে পরিচিত এ সংকলনটি বিপুল সুখ্যাতি অর্জন করেছে। হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে ৩১২ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তা উদ্ধৃত করেছেন। বশীর ইবনে তাহীক হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ শোনে সংকলন করেন। এরপর তা অন্যের কাছে শুনাবার জন্য তাঁর অনুমতি চান। (কিতাবুল ইলাল, তিরমিযী, ৬৯১ পৃষ্ঠা ও দারামী, ৬৮ পৃষ্ঠা)।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার এক ব্যক্তিকে তাঁর ঘরে আহবান করে বিভিন্ন হাদিস দেখানোর পর বলেন, আমি এসব লিখা হাদিসগুলো রেওয়ায়েত করেছি। বর্ণনাকারী বলেন যে, সেগুলো তাঁর হাতের নয় বরং অন্যের হাতে লেখা ছিল। (ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ১৮৪-১৮৫ পৃষ্ঠা)

বেশি হাদিস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও অন্যতম। তিনি নিজ পুত্রদের বলতেন ঃ 'হে আমার সন্তানগণ! ইল্‌মকে লেখা আকারে সংরক্ষণ কর।' (তথ্য : দারামী, ৬৮)

তাঁর ছাত্র আব্বান তাঁর সামনে বসে তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লেখেন।

(তথ্য : দারামী, ৬৮)

সালমা নামে এক মহিলা বলেন যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র খাদেম আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কার্যাবলি লিখতে দেখেছেন। (তথ্য : ইবনে সা'আদ ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১২৩ পৃষ্ঠা)।

ওয়াকেদী প্রথম যুগের নবিচরিত রচয়িতাগণের মধ্য থেকে একজনের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মান প্রধান মানযার ইবনে শাবীর নামে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্র প্রেরণ করেন তা তিনি ইবনে আব্বাসের কিতাবের সাথে দেখেছেন। (তথ্য : যাদুল মা'আদ, ২-৫৭)

www.bjilibrary.com

ইবনে যুবাইর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা লেখে খলীফা আবদুল মালিকের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। (তথ্য : তাবারী, ১২২৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। তাঁর অভিযোগ ছিল ঃ লোকেরা আমর কাছে এসে শুনে যায়– এরপর তা লেখে রাখে, অথচ আমি কুরআন ব্যতীত অন্য কোন জিনিস লিখা জায়েয মনে করি না। (তথ্য : দারামী, ৬৭)

সা'ঈদ ইবনে জুবাইর তাবে'ঈ বলেন ঃ আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে রাতে রেওয়ায়েত শুনে মোটা চাদরের গায়ে তা লেখে রাখি। সকালে আবার তা পরিষ্কার করে লেখেছি। (তথ্য : দারামী, ৬৯)

হযরত বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে বসে লোকেরা তাঁর রেওয়ায়েতসমূহ লেখতেন। (তথ্য : দারামী, ২৯)

নাফে ৩০ বছর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজের উপস্থিতিতে লোকদেরকে লেখাতেন।

(তথ্য : দারামী, ৬৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পুস্তক বের করে কসম করে বলেন, এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ নিজ হাতে লেখেছেন। (তথ্য : জামে', ১৭)

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন ঃ যখন কোন বিষয়ে আমাদের মতবিরোধ হত, আমরা সেগুলো লেখেছি, এরপর তা লুকিয়ে রেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে হাযির হয়েছি এবং তাঁকে সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি। যদি তিনি আমাদের লেখা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারতেন তাহলে তাঁর ও আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যেত। (তথ্য : জামে', ৩৩)

আস'ওয়াদ সাবে'ঈ বলেন ঃ আমি ও আলকামা একটি পুস্তিকা (সহীফা) পেলাম। তা নিয়ে আমরা ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে এসেছি। তিনি তা নষ্ট করে দেন। (তথ্য : জামে', ৩৩)

www.bjilibrary.com

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তিনিও রেওয়ায়েত লেখে রাখায় সম্মত ছিলেন না। তাই মারওয়ান একটা কৌশল অবলম্বন করে একজন লেখককে পর্দার পেছনে বসিয়ে রাখেন। তিনি যায়েদ ইবনে সাবেতের বর্ণনা অজ্ঞাতে লেখে নেন। (তথ্য : জামে', ৩৩)

হযরত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-ও অনুরূপ কৌশলে তাঁর একটি হাদিস লেখে রাখেন। কিন্তু তিনি তা অনুমান করতে পেরে জোরপূর্বক এ লেখা নষ্ট করে দেন। (তথ্য : আহমদ, ৫-১৮২)

প্রিয় বন্ধুগণ! এ সুদীর্ঘ বর্ণনার পর নিরস ঘটনাপঞ্জী ও ব্যক্তিগণের নাম আপনাদের কাছে সম্ভবত ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে এখন আমরা এমন পর্যায়ে অবস্থান করেছি, যেখান থেকে সোজা ও সুস্পষ্ট পথ দেখা যাচ্ছে। এ উদ্ধৃতিগুলোর দ্বারা আমি এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যে, লেখা বস্তু যদি জগতে বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হতে পারে, তাহলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও সাহাবায়ে কিরাম নিজ হাতে তা লেখেছেন এবং পরবর্তীগণের জন্য তাঁদের এ রচনাগুলো সংরক্ষণ করে গিয়েছেন। পরবর্তীগণও নিজেদের কিতাবসমূহে তা সংযোজন করেছেন। এখন আমার বক্তব্য এটাই যে, সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায়ই তাবেঈগণ দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিয়ে যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের কাছে থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রত্যেকটি বাণী, কাজ-কর্ম এবং তাঁর সম্পর্কিত প্রত্যেকটি ছোট-বড় ঘটনা লেখে রেখেছেন। মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী, হিশাম ইবনে উরওয়া, কায়েস ইবনে আবী হাযেম, আতা ইবনে আবী রিবাহ, সা'ঈদ ইবনে যুবাইর, আবুয্ যানাদ প্রমুখ হাজার হাজার তাবে'ঈ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং তাঁর জীবনের ঘটনা প্রবাহ সংগ্রহ করার জন্য জীবনপাত করেছেন এবং এভাবে আমাদের সামনে সেগুলো স্তূপীকৃত করেছেন। হাদিস ও সীরাতশাস্ত্রের অন্যতম ইমাম শিহাব যুহরী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয় লেখে রেখেছেন। আবুয্ যানাদ বলেন ঃ আমরা শুধু হালাল ও হারাম সম্পর্কিত বিষয়াবলি লেখেছি। আর যুহরী যা কিছু শুনতেন, সবই করেছেন। (তথ্য : জামে' ৩৭)

www.bjilibrary.com

ইবনে কাইসান বলেন ঃ আমি ও যুহরী ছাত্রাবস্থায় এক সাথে অবস্থান করেছি। আমি বলেছি, আমি শুধু সুন্নাতগুলো লেখব। তাই শুধু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয় আমি লিখে নিয়েছি। যুহরী বলেন, সাহাবাগণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোও লেখ, কেননা সেগুলোও সুন্নাত। আমি বলেছি ওগুলো সুন্নাত নয়, এজন্য আমি তা লেখিনি, কিন্তু সে লেখেছে। ফলে দেখা যায়, সে সফলকাম হয়েছে। আর আমি হয়েছি ব্যর্থ। (তথ্য : ইবনে সা'আদ, ২য় খণ্ড, ২য় অধ্যায়, ১৫৫ পৃষ্ঠা)

এসব বিষয় শত শত তাবে'ঈ লেখে রেখেছেন। এর মাঝে ইমাম যুহরীও একজন। শুধু তাঁর নিজের রচনাবলির এত বিরাট স্তূপ গড়ে ওঠে যে, ওলীদ ইবনে ইয়াজীদের হত্যার পর যুহরীর এ রচনাবলি কয়েকটি পশুর পিঠে চাপিয়ে কোষাগার থেকে বাইরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ৫০ হিজরিতে ইমাম যুহরী জন্ম এবং ইন্তিকাল ১২৪ হিজরিতে। তিনি কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও জীবন চরিত সংগ্রহে যে শ্রম ও সাধনা করেছেন তা অনুমান করার জন্য ঐতিহাসিকগণের এ একটি বর্ণনাই যথেষ্ট যে, তিনি মদীনার প্রত্যেকটি আনসারের কাছে গিয়েছেন। যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ এমনকি পর্দানশীন মহিলাগণের কাছে গিয়েও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও জীবনের ঘটনাবলি জিজ্ঞেস করে লেখেছেন। (তথ্য : তাহযীর, তরজমায়ে যুহরী)

তখন অগণীত সাহাবা জীবিত ছিলেন। যুহরীর ছাত্রদের সংখ্যা সংখ্যাতীত। তাঁরা রাতদিন সবাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজকর্ম ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ ও বিন্যস্তকরণ, লেখা শিক্ষাদান, অধ্যাপনা, প্রচার এবং প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। এটিই তাঁদের জীবনেদর একমাত্র অন্যতম কাজ ছিল। এজন্য জগতে আর সব কাজের সাথে তাঁরা সম্পর্ক ত্যাগ করে রেখেছিলেন।

বিভ্রান্তির আলোচ্য বিষয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই যে, সাধারণ লোকেরা মনে করে হাদিস ও নবিচরিত সংকলন ও রচনার কাজ তাবে'ঈগণই শুরু করেছেন। আর তাবে'ঈ তাঁদেরকে বলেন, যাঁরা সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন। তাছাড়া প্রায় একশ বছর পর্যন্ত ছিল সাহাবাগণের সময়কাল। অর্থাৎ

www.bjilibrary.com

তাবে'ঈগণের যামানা যেমন শুরু হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একশ বছর পর এবং অনুরূপ হাদিস ও নবিচরিত সংকলন ও প্রণয়নের কাজও যেন একশ বছর পরই শুরু হয়েছে। অথচ পুরোপুরিই এ ধারণা ভুল। কেননা তাবে'ঈ তাঁদেরকে বলা হয়, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেননি, কিন্তু সাহাবাগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি বা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানার শেষের দিকে তাঁদের জন্ম হয়েছে, তাই তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি বা তাঁর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা সবাই তাবে'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে যদি বিচার করা হয় দেখা যাবে যে, তাবে'ঈগণের যুগ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়ই কমপক্ষে ১১ হিজরি থেকে শুরু হয়েছে। সুতরাং যে কাজ ১১ হিজরি থেকে শুরু হয়েছে, সে সম্পর্কে এ কথা কি করে বলা যেতে পারে যে, তাবে'ঈগণ এ কাজ শুরু করেছেন। তাবে'ঈগণের কার্যারম্ভের জন্য প্রত্যেকটি সাহাবির জগত থেকে বিদায় অপরিহার্য নয় এবং শত বছর অতিক্রান্ত হবার নেই, কোন প্রয়োজনও। শত বছর পর তাবে'ঈগণের যুগও তো শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে এবং এরপর তাবে'ঈ হবার সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কেননা তখন সাহাবাগণের যুগ শেষ হয়েছে এবং সাহাবাগণকে দেখার ফলে লোকেরা তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোটকথা আমার এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, হাদিস ও নবিচরিত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ একশ বছর পর মুসলমানদের মাঝে শুরু হয়েছে-এ কথা বলা একটি বিরাট অজ্ঞতার পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা অবিশ্বাসযোগ্য।

মুসলমানদের মধ্যে সুন্নাত ও জীবনচরিত সংগ্রহ এবং তথ্য সংকলন ও লেখার কাজ তিন পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রথম পর্যায়ে শুধু ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেক শহরে সংগৃহীত তথ্যাবলি একত্রিত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সংগৃহীত তথ্যাবলি একত্রিত করে সেগুলোই বর্তমানে পুস্তকাকারে আমাদের কাছে রয়েছে। সম্ভবত প্রথম পর্যায়ের

www.bjilibrary.com

যুগটি একশ হিজরি পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায়ের যুগটি ১৫০ হিজরি থেকে তৃতীয় শতকের পরও কিছুকাল বর্তমান ছিল। প্রথম যুগটি ছিল সাহাবা ও নেতৃস্থানীয় তাবে'ঈগণের। দ্বিতীয় যুগটি ছিল তাবয়ে-তাবে'ঈগণের এবং তৃতীয় যুগটি ছিল ইমাম বুখারী (রহ.), ইমাম মুসলিম (রহ.), ইমাম তিরমিযী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিগণের। প্রথম যুগের সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব দ্বিতীয় যুগের কিতাবগুলোতে স্থান লাভ করেছে এবং দ্বিতীয় যুগের কিতাবগুলোর যাবতীয় বিষয়বস্তু তৃতীয় যুগের কিতাবসমূহে লেখা হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সমস্ত গ্রন্থসম্পদ আজ হাজার হাজার পাতায় আমাদের কাছে মওজুদ রয়েছে। আর এগুলোই ইতিহাসের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের সমাহার। এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য তথ্য ইতিহাসের ভাণ্ডারে আর বিদ্যমান আছে বলে আমার জানা নেই।

হযরত আল্লামা শিবলী নোমানী (রহ.)-এর ভাষায় বলা যায় ঃ অন্যান্য জাতি যখন 'জগতে এ ধরনের মৌখিক রেওয়ায়েত লেখার সুযোগ পেয়েছে, অর্থাৎ যখন কোন যুগের অবস্থা দীর্ঘকাল পর লেখে রাখার প্রয়োজন হয়েছে, তখন সব রকমের কিংবদন্তি, প্রচলিত গাল-গল্প, উড়ো খবর, গুজব সবকিছুই নির্বিবাদে কাগজের পৃষ্ঠায় স্থান লাভ করেছে। এমন কি এসব ঘটনা বর্ণনাকারীদের নাম-নিশানারও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর এসব ক্ষেত্রে বিশেষ করে গুজবগুলোর মধ্য থেকে এমন সব ঘটনা নির্বাচন করা হয়, যেগুলো অনুমানের সাথে খাপ খায়। কিছুকাল পর এসব গাল-গল্প চমৎকার ইতিহাসরূপে পরিগণিত হয়। ইউরোপের অধিকাংশ রচনার ভিত্তি এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

'কিন্তু মুসলমানরা জীবনচরিত রচনার যে মানদণ্ডের সূচনা করেছে তা এদের তুলনায় অনেক উচ্চপর্যায়ের ছিল। এর প্রথম নীতি ছিল এটাই যে, কোন ঘটনা বর্ণনা করাকালে এমন ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় তা বর্ণিত হতে হবে, যে নিজে সে ঘটনার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। আর যদি বর্ণনাকারী নিজে ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে যে ব্যক্তি সরাসরি ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তার কাছে থেকে ঘটনার ক্রমানুসারে

www.bjilibrary.com

বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করে সাথে সাথে এ বিষয়েও অনুসন্ধান চালাতে হবে যে, ধারাবাহিক বর্ণনায় যে সকল বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ হয়েছে তারা কারা ও কোন ধরনের ব্যক্তি? তাদের কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা কেমন ছিল? জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল কতটুকু? নির্ভরযোগ্য কি-না? সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞানের অধিকারী ছিল, না গভীর জ্ঞানসম্পন্ন? শিক্ষিত ছিল, না অশিক্ষিত? এসব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু শত শত হাজার হাজার মুহাদ্দিস এ তথ্যগুলো উদ্ধার করার জন্য তাঁদের জীবনপাত করে গিয়েছেন। তাঁরা শহরে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, বর্ণনাকারীদের সাথে দেখা করেছেন, তাঁদের যাবতীয় হাল-অবস্থা জিজ্ঞেস করে এ সম্পর্কে তন্নতন্ন করে বিস্তারিত অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এসব অনুসন্ধান ও গবেষণায় তাঁরা 'আসমাউর রিজাল'-এর বিরাট শাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন। এর ফলে কমপক্ষে এক লাখ লোকের জীবন চরিত আজ আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে।'

এ ব্যাপার ছিল শুধুমাত্র ' রেওয়ায়েত' ও ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কিত। তাছাড়াও তাঁরা যাচাই-বাচাই করার নীতি এবং 'দেরায়েত' অর্থাৎ যুক্তিপ্রজ্ঞা ও প্রমাণের কষ্টিপাথরে রেওয়ায়েতগুলোকে চিহ্নিত করার জন্য পৃথক নীতি-নিয়ম নির্ধারণ করে। এ পন্থায় কিভাবে রেওয়ায়েতগুলোকে নির্ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে, তাও তাঁরা নির্ধারণ করেছেন। বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাচাই ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে তাঁরা এত বেশি সততা ও সত্যবাদিতার পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, তাঁদের কার্যাবলি আজ ইসলামের জন্য গর্বের ও মহা সম্পদে পরিণত হয়েছে। বর্ণনাকারীদের বেলায় এমন সব পরাক্রমশালী খলীফা এবং আমরিও ছিলেন, যাঁদের নামে মানুষ কেঁপে ওঠেছে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সকলের পর্দার ভেতর উঁকি মেরেছেন এবং এক্ষেত্রে যে যতটুকু মর্যাদার অধিকারী, ঠিক ততটুকু মর্যাদা তাঁদেরকে প্রদান করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন ইমাম ওয়া'য়। কিন্তু তাঁর পিতা ছিলেন সরকারি অর্থসচিব। তাই তিনি নিজে যখন পিতার কাছে থেকে শুনে রেওয়ায়েত করেন, তখন তাঁর সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনাকারীর

www.bjilibrary.com

নামও অবশ্য উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ একা তাঁর পিতার বর্ণনা কখনো গ্রহণ করেননি। এ সর্তকতা ও সত্যবাদিতার কি কোন তুলনা হতে পারে? (তথ্য : তাহযীবুত তাহযীব, ১১শ খণ্ড ১৩০ পৃষ্ঠা)

মাসউদী ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। ১৫৪ হিজরিতে ইবনে মু'আয দেখেন যে, কিছু বর্ণনা করতে হলে তাঁকে লেখা হাদিসের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন হয়। তাই তিনি সাথে সাথেই তাঁর স্মৃতিশক্তির ওপর অনাস্থা প্রকাশ করেন। (তথ্য : তাহযীবুত তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

এ মুআয ইবনে মুআযকে এক ব্যক্তি দশ হাজার দীনার (যার মূল্য বর্তমানে দশ হাজার গিনির চেয়েও অধিক) শুধুমাত্র এজন্য দিতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন এক ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বা অনির্ভরযোগ্য কিছুই না বলেন অর্থাৎ তাঁর সম্পর্কে যেন নীরবতা অবলম্বন করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ 'আমি কোন সত্যেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারি না।' জগতের ইতিহাসে কি এর চেয়ে অধিক সততার কোন দৃষ্টান্ত পেশ করে কাঁচা-পাকা ভুল ও নির্ভুল, শক্তিশালী ও দুর্বল এবং গ্রহণ ও অগ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতসমূহের বিরাট স্তূপ আজও বর্তমান রয়েছে আর আজও উপরোক্ত নীতিসমূহের মাধ্যমে প্রত্যেকটি রেওয়ায়েতের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা করা যেতে পারে এবং ভেজাল ও নির্ভেজাল পুনরায় পৃথক করা সম্ভব হতে পারে।

প্রিয় বন্ধুগণ! এসব নিরস অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক দিকটি এখন অনেকটা আপনাদের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের যে সমস্ত ঘটনা সংগৃহীত হয়েছে, তার উৎস এবং সেগুলো কিভাবে সংযোজিত ও লেখা হয়েছে, তা এখন আমি আপনাদেরকে উপস্থাপন করে যাব।

প্রথম উৎস, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের সবচেয়ে নির্ভুল অংশের উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। কুরআনের নির্ভুলতা ও নির্ভর-যোগ্যতার ব্যাপারে শত্রুরাও কোনরূপ সন্দেহ করতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় অংশ প্রাক-নবুয়ত জীবন,

www.bjilibrary.com

পিতৃ-মাতৃহীন জীবন, দারিদ্র্য, সত্যের সন্ধান, নবুয়ত, ওহী, ঘোষণা ও প্রচার, মি'রাজ, বিরোধী পক্ষের শত্রুতা, হিজরত, যুদ্ধ, চারিত্রিক অবস্থা ইত্যাদি সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। এর চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জীবন চরিতের সন্ধান জগতে আর দ্বিতীয় পাওয়া অসম্ভব।

দ্বিতীয় উৎসটি হচ্ছে হাদিস। এর সংখ্যা প্রায় এক লাখের কাছাকাছি। এর মাঝে নির্ভুল, দুর্বল ও মনগড়া হাদিসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। মূল্যবান 'সিহাহ সিত্তা'র (অর্থাৎ ছয়টি নির্ভূল হাদিসগ্রন্থ) প্রত্যেকটি হাদিস কঠোর সমালোচনা এবং যাচাই-বাচাইয়ের পর সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপর আছে বিভিন্ন ধারার সমষ্টি। এর মাঝে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও ঘটনাবহুল মুসনাদ। এর মাঝে সবচেয়ে বিপুলায়তন হচ্ছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের গ্রন্থ মুসনাদ। এটি ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ডে মিসরের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির টাইপে মুদ্রিত অন্যূন পাঁচশ পৃষ্ঠা সম্বলিত। তাতে প্রত্যেক সাহাবির রেওয়ায়েত পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ সংকলনসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-বৃত্তান্ত ও শিক্ষাসমূহ ওৎপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

তৃতীয় উৎসটি হচ্ছে মাগাযী। এ গ্রন্থসমূহে মূলত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যান্য ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে উরওয়া ইবনে যুবাইরের (মৃত্যু ৯৪ হিজরি) মাগযী, যুহরীর (মৃত্যু ১২৭ হিজরি) মাগাযী, মূসা ইবনে উতবার (মৃত্যু ১৪১ হিজরি) মাগাযী, ইবনে ইসহাকের (মৃত্যু ১৫০ হিজরি) মাগাযী, যিয়াদ বুকাই'র (মৃত্যু ১৯৩ হিজরি) মাগাযী, ওয়াকেদীর (মৃত্যু ২০৭ হিজরি) মাগাযী ইত্যাদি প্রাচীন।

সাধারণ ইতিহাসের চতুর্থ উৎস হচ্ছে গ্রন্থসমূহ। এগুলোর প্রথমাংশ বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে হচ্ছে 'তাবকাতে ইবনে সা'আদ' এবং ইমাম জাফর তাবারির 'তারিখুর রাসূলে ওয়াল মূলুক', ইমাম বুখারীর তারিখে সগীর ও কবীর, তারিখে ইবনে হিব্বান, তারিখে ইবনে আবী খাইসামা বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৯ হিজরি) ইত্যাদি গ্রন্থ।

www.bjilibrary.com

পঞ্চম উৎস হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত পৃথক গ্রন্থসমূহ। এগুলোকে 'কুতুবে দালায়েল' বলা হয়। যেমন, ইবনে কুতাইবার (মৃত্যু ২৭৬ হিজরি) দালায়েলুন নবুয়ত, আবু ইসহাক হারবীর (মৃত্যু ২৫৫ হিজরি) দালায়েলুন নবুয়ত, দালায়েলে ইমাম বায়হাকী (মৃত্যু ৪৩০ হিজরি) দালায়েল আবু না'ঈম ইসফাহানী (মৃত্যু ৪৩০ হিজরি), দালায়েল মুস্তাগফেরী (মৃত্যু ৪৩২ হিজরি), দালায়েল আবুল কাশেম ইসমা'ঈল ইস্ফাহানী (মৃত্যু ৫৩৫ হিজরি)। এ শাখায় সবচেয়ে তথ্যবহুল গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম সুয়ূতীর খাসায়েসে কুবরা।

ষষ্ঠ উৎসটি হচ্ছে শামায়েল গ্রন্থসমূহ। এসব গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বভাব, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস ইত্যাদি বর্ণনা রয়েছে। সর্বপ্রথম এ শাখায়ও সবচেয়ে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম তিরমিযির (মৃত্যু ২৭৯ হিজরি) শামায়েল। বড় বড় আলেমগণ এর বহুসংখ্যক ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন। এ শাখায় সবচেয়ে বিপুলায়তন ও বৃহত্তম গ্রন্থ হচ্ছে কাজি ইয়াযের কিতাবুশ শিফা ফী হুকূকিল মুস্তফা এবং এর ভাষ্য শিহাব খাফফাজী লেখা নাসীমুর রিয়ায। এ শাখায় অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে আবুল আব্বাস মুসতাগফেরীর (মৃত্যু ৪৩২ হিজরি) শামায়েলুন নবি, এবং সাতেয়ু ইবনুল মুকেররী গার্নাতীর (মৃত্যু ৫৫২ হিজরি) শামায়েলুননূর এবং মাজদুধদীন ফিরোজাবাদীর (মৃত্যু ৮১৭ হিজরি) সফরুস্ সা'আদা।

সপ্তম উৎসটি হচ্ছে মক্কা ও মদীনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাবলি সম্পর্কে লেখা গ্রন্থসমূহ। এসব কিতাবে এ শহরদ্বয়ের সাধারণ বৃত্তান্ত ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের স্থানীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সে সকল স্থানের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল, সেগুলোর নাম পরিচয় ও অবস্থান উল্লেখ রয়েছে। এ শাখায় সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে যারকীর (মৃত্যু ২২৩ হিজরি) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরি) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরি) আখবারে মক্কা, 'ওমরা ইবনে শিবা'র (মৃত্যু ২৬৩ হিজরি) আখবারে মদীনা, ফাকেহীর আখবারে মক্কা ও ইবনে যাবালার আখবারে মদীনা ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! আমি আমার আজকের আলোচনায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনের ঐতিহাসিক তথ্য-সম্পদের যে বিবরণ উত্থাপন করেছি, তা থেকে আমাদের সমর্থক ও বিরোধী সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ও সুদৃঢ়। শুধুমাত্র মুখস্থ বিদ্যা ও বিক্ষিপ্ত স্মারকলিপির ওপরই প্রথম যুগের মুহাদ্দিসগণ ও মুসলিম খলীফাগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরং তাঁরা এসব শাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত (মাগাযী) বিষয়াবলি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষায়তন ও মসজিদসমূহে রীতিমত ক্লাশ শুরু করেছেন। হযরত কাতাদা আনসারি একজন সাহাবি ছিলেন। তাঁর প্রপুত্র আসেম ইবনে ওমর মাগাযীর ইমাম ছিলেন। তিনি ১২১ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে রাজধানী দামেশকের জামে মসজিদে বসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াবলির শিক্ষা দান করতেন। (তথ্য : তাহযীব) মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যামানা থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি ভাষায় তাঁর জীবন-চরিত, জীবনের ঘটনাবলি ও বাণীসমূহ সম্পর্কে যে সমস্ত কিতাব লেখা হয়েছে, এর সংখ্যা কয়েক হাজারেরও বেশি। উপমহাদেশে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলোতে বিগত দুশো বছর থেকে রচনার কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া মৌলিক রচনার কাজ এখানে শুরু হয়েছে মাত্র বিগত ১৮৫০ ঈসায়ী সালের কিছু আগ ও পর থেকে। তবুও এসব ভাষায় ছোট বড় কয়েকশো গ্রন্থ এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে না হয় মুসলমানদের কথা বাদই দিয়েছি। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ এবং তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন তাদের দীন ও ঈমানেরই দাবি। এবার দুশমনদের শিবিরে আসা যাক। ভারতের হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মণসমাজীরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী লেখেছেন। ইউরোপও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল নয়। তবুও সেখানে মিশনারিদের জন্য বা তত্ত্বগত

www.bjilibrary.com

রুচি বা বিশ্ব-ইতিহাসের জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১৬/১৭ বছর পূর্বে দামেশকের 'আল-মুকতাবিস' নামে পত্রিকায় এ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ১৩শ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত আরো যে সমস্ত গ্রন্থ লেখা হয়েছে, সেগুলোকেও যোগ করা হলে এ সংখ্যা বিরাট আকার ধারণ করবে নিশ্চয়। অধ্যাপক D.S. Margoliuth (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি অধ্যাপক) লেখা এবং ১৯০৫ সনে 'হিরোজ অব দি নেশান্স' সিরিজ কর্তৃক মুদ্রিত ইংরেজি গ্রন্থ 'মুহাম্মদ'-এর চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী সংক্রান্ত অধিকতর বিষাক্ত গ্রন্থ আর একটিও লেখা হয়নি। তিনি এ গ্রন্থে প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য উত্থাপন করে নবি-চরিতকে বিকৃত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছেন। তবুও গ্রন্থের ভূমিকায় এ সত্যটি স্বীকার না করে পারেননি যে, 'মুহাম্মদের জীবনীকারদের দীর্ঘধারা শেষ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু তাঁদের মধ্যে স্থান লাভ করা এক বিরাট সম্মানজনক অবস্থান।'

ইংরেজি ভাষায় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন ডেভিনপোর্ট সর্বাধিক সহানুভূতিপূর্ণ গ্রন্থ 'এ্যপলজি ফর মুহাম্মদ এণ্ড দি কুরআন' লেখেছেন। এভাবে তিনি গ্রন্থটির সূচনা করেছেন ঃ

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল আইন প্রণেতা ও বিজয়ীগণের মাঝে একজনও এমন নেই, যার জীবন চরিত মুহাম্মদের জীবন চরিতের চেয়ে অধিক বিস্তারিত ও সত্য।'

অক্সফোর্ড ট্রিনিটি কলেজের ফেলো রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মিথ (Bosworth Smith) ১৮৭৪ সনে 'রয়াল ইনস্টিটিউশান অব গ্রেট বৃটেন'-'মুহাম্মদ' এবং 'মোহামেডানিজম' সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। এতে রেভারেণ্ড সাহেব কি চমৎকারভাবেই না তথ্য প্রদান করেছেন ঃ

---

১. ১৯২৫ সনে এ বক্তৃতাটি প্রদত্ত হয়।

www.bjilibrary.com

সাধারণভাবে 'ধর্ম সম্পর্কে (প্রারম্ভকাল অজ্ঞাত থাকার কারণে) যা কিছু সত্য, দুর্ভাগ্যবশত এ তিনটি ধর্ম ও এদের প্রবর্তকদের সম্পর্কেও তা সত্য। অন্য কোন ভাল নাম না থাকার কারণে আমরা এদেরকে ঐতিহাসিক ভিত্তি বলে থাকি। আমরা ধর্মের প্রাথমিক ও প্রারম্ভিককালের কর্মীবৃন্দের সম্পর্কে খুব কমই এবং তাদের শ্রমের সাথে যারা পরবর্তীকালে নিজেদের শ্রম যোগ করেছেন তাদের সম্পর্কে সম্ভবত অনেক অধিক জানি।

যরথুষ্ট্র ও কনফুসিয়াস সম্পর্কে আমরা সুলান ও সক্রেটিসের চেয়ে অনেক কম জানি। মূসা ও বুদ্ধ সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক কম জানি, যা এ্যামব্রেস ও জুলিয়াস সীজার সম্পর্কে জানি! আমরা আসলে ঈসা-মসীহর জীবনের একটি অংশের আংশিক জ্ঞানই রাখি। যে ত্রিশটি বছর তিন বছরের জন্য পথ পরিষ্কার করেছেন তাকে আবরণমুক্ত করবে কে? আমরা যা কিছু জানি তা হচ্ছে এটাই যে, তিনি জগতের এক তৃতীয়াংশকে জীবিত করেছেন এবং সম্ভবত আরো অনেক বেশি অংশকে জীবিত করবেন। একটি 'আদর্শ জীবন' যা অনেক দূরের আবার অনেক কাছের, যা সম্ভব আবার অসম্ভবও তার কত বিরাট অংশ সম্পর্কে আমরা এখনও অজানা! আমরা ঈসার মায়ের, তাঁর সংসার-জীবন, তাঁর প্রাথমিক বন্ধু-বান্ধব, তাঁদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অধ্যাত্মিক মিশনের পর্যায়ে ক্রমিক অভ্যুদয় বা তার আকস্মিক প্রকাশ সম্পর্কে কি-ই বা জানা আছে! আমাদের এগুলো সম্পর্কে প্রত্যেকের মনে কত প্রশ্নই না উদয় হয়। কিন্তু এগুলো চিরকাল প্রশ্নই থেকে যাবে। কিন্তু ইসলামের প্রত্যেকটি বস্তু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানে কোন অস্পষ্টতার আড়াল ও রহস্য নেই। আমাদের নিকট ইতিহাস রয়েছে। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এত বেশি জানি, যেমন জানি-লুথার ও মিলটন সম্পর্কে। পৌরাণিকতা, কাল্পনিক গল্প ও স্বাভাবিক ঘটনাবলি প্রাথমিক যুগের আরব লেখকগণের রচনা। অথবা যদি কোথাও এগুলোর অস্তিত্ব কিছু থাকেও তাহলে অতি সহজেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলি থেকে সেগুলোকে আলাদা করা সম্ভব। এখানে কেউই নিজকে বা অন্যকে প্রতারণা করতে পারে না। এখানে সমগ্র পরিস্থিতি স্বচ্ছ দিনের মতই পরিষ্কার। প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর সে আলোক পড়ছে এবং তা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছতে পারে।

(তথ্য : পৃষ্ঠাঃ ১৪-১৫ ঃ ১৮৮৯ খৃঃ)

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবন সংক্রান্ত অগণিত গ্রন্থ মুসলমান লেখকগণও রচনা করেছেন এবং আজও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এর প্রতিটি গ্রন্থ অন্যান্য নবিগণের জীবন-চরিত সংক্রান্ত কিতাবগুলোর তুলনায় অধিক স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও ঐতিহাসিক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন-চরিত ও তাঁর হাদিসসমূহের প্রথম গ্রন্থগুলোকে প্রত্যেক লেখকের কাছ থেকে অগণিত লোক শুনেছেন, পাঠ করেছেন এবং তার প্রতিটি শব্দের অর্থ বুঝে নিয়ে অন্যের কাছে পৌঁছিয়েছেন। হাদিসের প্রথম গ্রন্থ 'মুয়াত্তাকে তার লেখক ইমাম মালিক (রহ.)-এর কাছে থেকে ৬০০ লোক শুনেছেন। তাঁদের মাঝে সমকালীন সুলতান, আলেম, ফকীহ, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সূফী অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণির লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারীর রচনা সহিহ বুখারীকে মাত্র তাঁর একজন ছাত্র ফারবারীর কাছে থেকে ৬০ হাজার লোক শুনেছেন। এখন আপনারাই বলুন, কোন ধর্ম প্রবর্তক ও প্রচারকের জীবন চরিত ও বাণী সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য এমন সতর্কতা ও ঘটনা বর্ণনাকারীদের এরূপ ধারাবাহিকতা রক্ষা করার এত বিপুল আয়োজন করা হয়েছে কি? মুহাম্মাদুর ﷺ ব্যতীত আর কার জীবন চরিতের ঐতিহাসিক ভিত্তি এত সুদৃঢ় ছিল এরূপ চিন্তা করা যেতে পারে?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতা প্রদান

বন্ধুগণ! আপনাদের সামনে 'আজ আমি মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতা' সম্পর্কে আলোচনা করব। যে জীবন যতই ঐতিহাসিক অবদানে পরিপূর্ণ হোক না কেন, যতক্ষণ তার মাঝে মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতার বিকাশ লাভ না করে, আমাদের জন্য ততক্ষণ তা আদর্শস্বরূপ হতে পারে না। আবার কোন জীবনে পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলির সমাবেশ ও তা যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত থেকে তখনই প্রমাণিত হতে পারে, যখন তার সমগ্র অংশ আমাদের সামনে প্রকাশিত থাকে। ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সময়কাল লোকের দৃষ্টির সামনে ছিল এবং তাঁর ইন্তিকালের পর বিশ্ব-ইতিহাসের পাতায় তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি দিক পুরোপুরিভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে[১]। তাঁর জীবনের সামান্য অংশও এমন নেই যে, সে সময়ে তিনি তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করে ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিলেন। জন্ম, দুগ্ধপান, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, ব্যবসায়ে যোগদান, চলাফেরা, বিয়ে, নবুয়ত-পূর্বকালের বন্ধু-বান্ধব, কুরাইশদের যুদ্ধ সংক্রান্ত চুক্তিতে অংশগ্রহণ, 'আল-আমীন' উপাধি লাভ, কাবাঘরে পাথর স্থাপন, ধীরে ধীরে নির্জন-প্রিয়তা, হেরা গুহায় নিঃসঙ্গ অবস্থান, ওহি অবতরণ, ইসলামের দাওয়াত প্রদান, প্রচার অভিযান, বিরোধিতা, তায়েফ যাত্রা, মি'রাজ, হিযরত, যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাদের কাছে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ, ইসলাম প্রচার, দীনের পূর্ণতা প্রদান, বিদায় হজ্ব, মৃত্যুর মাঝে কোন যুগটি জগতবাসীর দৃষ্টিসীমার আড়ালে ছিল?

---

১. জগতের যাঁরা বিরাট কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন বিশেষ করে নবিগণ ﷺ তাঁরা সর্বদাই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে থাকেন। আন্দোলনের নেতৃত্বদান এবং সভ্যতার পুনঃনির্মাণে নেতৃত্ব দানকারীদের শক্তির প্রকৃত উৎস হয়ে থাকে বিশেষ ধরণের চিন্তাধারা চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত তাঁদের ব্যক্তি সত্ত্বা। জগতের বুকে মানবিক গুণাবলির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হতে হলে তাঁর জীবন ইতিহাস বা সীরাত অধ্যয়নই হবে অন্যতম উদ্দেশ্য। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.bjilibrary.com

তাঁর কোন অবস্থানটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অজানা? সত্য-মিথ্যা, ভুল-নির্ভুল প্রত্যেকটি বিষয়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তা জেনে নিয়েছে।

দুর্বল রেওয়ায়েত সংরক্ষণ কেন করা হয়েছে?

মুহাদ্দিসগণের হাদিস সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনেক সময় চিন্তা-ভাবনা করি, কেন মনগড়া এবং দুর্বল রেওয়ায়েতসমূহ সংরক্ষিত রেখেছেন? কিন্তু এর পরক্ষণেই মনে হয়েছে যে, এর মাঝে হয়ত আল্লাহর বিরাট উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। অর্থাৎ একথা বলার সুযোগ বিরুদ্ধবাদীদের যেন না থাকে যে, তারা নিজেদের নবির বিভিন্ন দুর্বলতা ঢেকে রাখার জন্য অনেক রেওয়ায়েত বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যেমন বর্তমানে প্রায়ই খ্রিষ্টানদের বইপত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। এজন্য আমাদের মুহাদ্দিসগণ নিজেদের নবিচরিত সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা যাবতীয় বিষয় সামনে রেখে দিয়েছেন, এদের উভয়ের পার্থক্য দেখিয়েছেন এবং এরূপ পার্থক্যের নীতিমালাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন– ওঠা-বসা, ঘুম-জাগরণ, বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, নামায- রোযা, দিন-রাতের ইবাদত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, চলাফেরা, সফর এবং অবস্থান, গোসল, আহার-বিহার, হাসি-কান্না, কাপড় পরিধান, হাসি-ঠাট্টা, আলাপ-আলোচনা, নির্জনে এবং জনসমাজে বিচরণ, মেলামেশা, আচার-ব্যবহার, দেহের বর্ণ এবং গন্ধ, আকৃতি-প্রকৃতি, লম্বা-চওড়া এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, একত্রে শোয়া ও পবিত্রতা অর্জন ইত্যাতি প্রত্যেকটি বিষয়ই সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত, সর্বজনবিদিত এবং সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত মাত্র একটি প্রাচীনতম গ্রন্থ 'শামায়েলে তিরমিযী'র বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনাম পাঠ করে আপনাদের শুনাচ্ছি। আপনারা এ থেকে ধারণা করতে পারবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পর্কিত অতি সামান্য বিষয়ও আমাদের গ্রন্থে লিখা রয়েছে।[১]

---

[১] . এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বড় বড় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে নবিগণ যাঁরা কথা বলেন এবং যাঁদের মাঝে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আবেগ বিরাজ করে তাঁরা যখন কথা বলেন ঃ তখন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মহত্ব গভীর তাৎপর্য ফুটিয়ে তোলেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তাঁর কর্মময়

www.bjilibrary.com

১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দেহাকৃতি এবং গঠনাকৃতির আলোচনা।
২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুলের আলোচনা।
৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাকা চুলের আলোচনা।
৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুল আঁচড়াবার আলোচনা।
৫. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুলে খেজাব লাগাবার আলোচনা।
৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চোখে সুর্মা লাগাবার আলোচনা।
৭. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পোশাকের আলোচনা।
৮. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবন যাপনের আলোচনা।
৯. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মোজার আলোচনা।
১০. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাপোশের আলোচনা।
১১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির মোহরের আলোচনা।
১২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তলোয়ারের আলোচনা।
১৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লৌহবর্মের আলোচনা।
১৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লৌহ শিরস্ত্রাণের আলোচনা।
১৫. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাগড়ীর আলোচনা।
১৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পায়জামার আলোচনা।
১৭. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চলার আলোচনা।
১৮. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখে কাপড় ঢাকবার আলোচনা।
১৯. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বসার আলোচনা।
২০. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিছানা ও বালিশের আলোচনা।
২১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হেলান দেয়ার আলোচনা।
২২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহার করার আলোচনা।
২৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর রুটির আলোচনা।
২৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওযূ করার আলোচনা।
২৫. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহারের পূর্বে ও পরে দোয়া পাঠের আলোচনা।
২৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পেয়ালার আলোচনা।
২৭. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফলের অ লোচনা।

জীবনের মানকে উন্নত করে এবং তাঁদের চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পবিত্রতর করে তোলে। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত।)

www.bjilibrary.com

২৮. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি পান করতেন এর আলোচনা।
২৯. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে পান করতেন এর আলোচনা।
৩০. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খোশবু লাগাবার আলোচনা।
৩১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলার আলোচনা।
৩২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবিতা পাঠের আলোচনা।
৩৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাতে কথাবার্তার আলোচনা।
৩৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম সংক্রান্ত আলোচনা।
৩৫. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'ইবাদতের আলোচনা।
৩৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাসির আলোচনা।
৩৭. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রসিকতার আলোচনা।
৩৮. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাশতের নামাযের আলোচনা।
৩৯. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে নফল পড়ার আলোচনা।
৪০. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযার আলোচনা।
৪১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুরআন পাঠের আলোচনা।
৪২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোনাজারি আলোচনা।
৪৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিছানার আলোচনা।
৪৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নম্রতার আলোচনা।
৪৫. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচার-আচরণের আলোচনা।
৪৬. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষৌর কাজের আলোচনা।
৪৭. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামসমূহের আলোচনা।
৪৮. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা।
৪৯. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম তারিখ ও বয়সের আলোচনা।
৫০. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু আলোচনা।
৫১. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মীরাস ও পরিত্যক্ত বস্তুর আলোচনা।

এগুলো সবই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ। এর মধ্যে প্রত্যেকটি শিরোনামে কোথাও মাত্র কিছু এবং কোথাও বহু বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে। এসব ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটি দিক স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থহীন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের কোন একটি মুহূর্তও পর্দান্তরালে ছিল না। অন্তপুরে তিনি থাকতেন স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে এবং বাইরে আত্মীয়-বান্ধব ও ভক্ত সহচরগণের মজলিসে।

www.bjilibrary.com

প্রিয় বন্ধুগণ! বিরাট প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিও জগতে নিজ ঘরে সাধারণ মানুষের মতই অবস্থান করেন। এজন্য ভল্টেয়ারের কথায় বলা যায়, 'কোন ব্যক্তি নিজ ঘরে হিরো হতে পারে না' (No man is hero to his valet)। বসওয়ার্থ স্মিথের মতে 'এ নীতিটি কমপক্ষে ইসলামের নবির ক্ষেত্রে একান্তভাবেই সত্য নয়।[১] গীবন বলেছেন ঃ 'মুহাম্মদের ন্যায় অন্য কোন নবিই তাঁর অনুসারীগণকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে দেননি। যারা তাঁকে মানুষ হিসেবে অত্যন্ত উত্তমরূপেই জানতেন, তাঁদের সামনে তিনি হঠাৎ নিজেকে নবি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। নিজ স্ত্রী, নিজ গোলাম, নিজ ভাই এবং নিজ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সামনে নিজকে নবি হিসেবে উত্থাপন করেছেন এবং তাঁরা বিনা দ্বিধায় তাঁর দাবি মেনে নিয়েছেন।'

জাগতিক জীবনে মানুষের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়াদি স্ত্রীর চেয়ে বেশি আর কেউ জানতে পারে না। তাহলে এটি কি একটি বাস্তব সত্য নয় যে, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের ওপর সর্বপ্রথম তাঁর স্ত্রী খাদিজা ঈমান এনেছিলেন? নবুয়ত লাভের পূর্বে পনের বছর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জীবন-যাপন করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রতিটি বিষয় উত্তমভাবে জানতেন। এসবের পরও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত দাবি করার পর সর্বপ্রথম তিনিই তাঁর দাবির সত্যতা স্বীকার করেছেন অর্থাৎ ঈমান এনেছেন।

অতি মহান ব্যক্তিও যিনি মাত্র একটি স্ত্রীর স্বামী, তিনিও স্ত্রীকে এ মর্মে ব্যাপক অনুমতিদানের মনোভাব রাখেন না যে, তুমি আমার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অবস্থা ও ঘটনা জনসমক্ষে প্রচার কর এবং যা কিছু গোপন রয়েছে তাও জনসমক্ষে প্রকাশ করে দাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একই সাথে ন'জন স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেককে এ অনুমতি প্রদান করেছিলেন যে, নির্জনে আমার মাঝে যা কিছু দেখ তা কোন প্রকার সংকোচ না করে জনসাধারণের নিকট প্রচার কর। বন্ধ ঘরে যা কিছু দেখ, খোলা পরিবেশে যা দেখ তা সবাইকে জানিয়ে দাও। এবার আপনারাই চিন্তা করুন এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন নবি কি আর জগতের কোথাও পাওয়া সম্ভব হতে পারে?

---

১. বসওয়ার্থ স্মিথের বই 'লাইফ অব মুহাম্মদ' সম্পর্কে বক্তৃতার অংশ বিশেষ। (গ্রন্থকার)

www.bjilibrary.com

আর এগুলোই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যক্তিগত অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনার সমষ্টি। হাদিস গ্রন্থসমূহে তাঁর পবিত্র চরিত্র, উন্নত গুণাবলি ও উত্তম আচার-আচরণের বিস্তারিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বিশেষ করে এক্ষেত্রে কাজি 'ইয়ায আনন্দালুসীর কিতাব 'আশ্‌শিফা' সর্বোত্তম। আমাকে এক ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ফ্রান্সে বলেছিলেন, ইসলামের নবির প্রকৃত গুণাবলি সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার জন্য কাজি 'ইয়াযের 'আশশিফা' গ্রন্থটিকে ইউরোপীয় কোন ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

আমরা এসব সীরাতুননবির দ্বিতীয় খণ্ডে 'শামায়েল' অধ্যায়ে শিরোনামসমূহ সংযোজিত করেছি ঃ যেমন–

'পবিত্র চেহারা, নবুয়তের মোহর, পবিত্র চুল, চলার ভঙ্গী, কথাবার্তা, হাসি, পোশাক, আংটি, বর্ম এবং লৌহ শিরস্ত্রাণ, খাদ্য এবং আহার পদ্ধতি, দৈনন্দিন আহার, উত্তম পোশাক, পছন্দনীয়দ রং এবং অপ্রিয় রং, সুগন্ধি ব্যবহার, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, সওয়ার হবার আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

আর 'নিয়মিত কার্যধারা' অধ্যায়ে করেছি নিচের শিরোনামসমূহ সংযোজন

'সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যা করেছেন, ঘুম, শেষ রাতের ইবাদত, নিয়মিত নামাযসমূহ, বক্তৃতার ধরন, সফর, জিহাদ, রোগীদের খোঁজ-খবর নেয়া, সাধারণ সাক্ষাতকার এবং সবার সাথে লেনদেন এবং আদান-প্রদান ইত্যাদি বিবরণসমূহ।'

'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার

'নবির দরবার, নসিহতের মজলিস, মজলিসের আদব-কায়দা, মজলিসের সময়সূচি, মহিলাদের জন্য বিশেষ মজলিস, নসিহতের ধরন-পদ্ধতি, মজলিসের আনন্দঘন পরিবেশ, সঙ্গলাভের সুফল, কথা বলার ভঙ্গি, বক্তৃতাসমূহের ধরন, বক্তৃতাসমূহের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

www.bjilibrary.com

'ইবাদত' শিরোনামসমূহ

'দোয়া, নামায, রোযা, যাকাত, সাদকা, হজ্ব, সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহ প্রেমের আনন্দ, যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহভীতি, রোনাজারি, আল্লাহর প্রেম, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, ধৈর্যধারণ ও শোকর ইত্যাদি বিষয়সমূহ।'

'নবিচরিত' অধ্যায়ে বিস্তারিত শিরোনাম

পূর্ণাঙ্গ 'নবি-চরিতের আলোচনা'[১], কর্মের দৃঢ়তা, সদ্ব্যবহার, সদাচার ও ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, মেহমানদারি, ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা, সাদকা গ্রহণে অসম্মতি, তোহফা গ্রহণ, কারো অনুগ্রহশীল না হওয়া, বলপ্রয়োগ বিরোধ নীতি, আত্মপীড়ন অপছন্দনীয়, অন্যের প্রচার এবং অযথা প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সারল্য এবং অনাড়ম্বরতা, কর্তৃত্বের প্রকাশ এবং লোক দেখানো মনোভাব থেকে দূরে অবস্থান, সাম্য, নম্রতা, অপাত্রে সম্মান এবং প্রশংসার প্রতি বিরূপ মনোভাব, লজ্জাশীলতা, নিজ হাতে কাজ করা, সাহস এবং দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞা পালন, মিতব্যয়ী এবং অল্পে তুষ্টি, ক্ষমা এবং ধৈর্যধারণ, শত্রুদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত এবং সদ্ব্যবহার, কাফের ও মুশরিকদের সাথে ব্যবহার, ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের সাথে আচার-ব্যবহার, গরিবদের প্রতি ভালাবাসা ও সমবেদনা প্রকাশ, শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন, শত্রুদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মহিলাদের সাথে আচার-ব্যবহার, পশুর প্রতি দয়া প্রদর্শন, সাধারণভাবে সকলের জন্য করুণা ও ভালবাসার প্রকাশ, অন্তরের কোমলতা, রোগীদের দেখাশোনা, মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, নম্র মেজাজ, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা এবং নিজের স্ত্রীগণের সাথে আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়াবলিসমূহ।'

---

১. নবি ﷺ-এর আখলাখ বা স্বভাব চরিত্র ও নৈতিকতার বিবরণ কোন উপশিরোনামে দেয়া অসম্ভব। কেননা তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল সৎচরিত্রের নামান্তর। আপাততঃ এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সত্য আদর্শ একেবারেই মাঠে অবস্থান নিয়ে ছিলেন এবং সমগ্র দেশবাসীর বিরোধিতা ও অত্যাচারের মুখেও অটল ছিলেন। কখনো কোন কঠিনতম পরিস্থিতির মুখেও ভীতি বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। সর্বত্রই অবিচল প্রত্যয় ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। (সূত্র ঐ)

www.bjilibrary.com

হাফিজ ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মা 'আদ' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতের হাল-হাকীকত সবচেয়ে অধিক তথ্য বহুলরূপে আলোচনা করেছেন। শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আলোচ্য সূচির তালিকা এরূপ ঃ যেমন–

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যোগাযোগ পদ্ধতি, আহার ও পানীয় গ্রহণের পদ্ধতি, বিবাহ এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে পদ্ধতি, ঘুম জাগরণ পদ্ধতি, সওয়ার হবার পদ্ধতি, দাস-দাসীকে নিজ খিদমতের জন্য পেশ করার পদ্ধতি, লেনদেন এবং বেচাকেনার পদ্ধতি, মলমূত্র ত্যাগের নিয়মাবলি, দড়ি বানাবার পদ্ধতি, গোঁফ রাখা এবং ছাঁটার পদ্ধতি, কথা বলার পদ্ধতি, নীরবতা, হাসি, কান্না, বক্তৃতার পদ্ধতি, ওযূর পদ্ধতি, মোজার ওপর মসেহ করার পদ্ধতি, তায়াম্মুম করার পদ্ধতি, নামায আদায়ের পদ্ধতি, দু'সিজদার মাঝখানে বসার পদ্ধতি, সিজদা করার পদ্ধতি, শেষ বৈঠকে বসার ধরন, নামাযে বসার ও তাশাহ্হুদের সময় আঙ্গুল ওঠাবার পদ্ধতি, নামাযে সালাম ফেরাবার পদ্ধতি, নামাযে দোয়া পঠ করা, সোহ্-সিজদা করার পদ্ধতি, নামাযে 'সতর' নির্ধারণ করার পদ্ধতি, সফররত এবং স্থির অবস্থা, মসজিদে এবং ঘরে সুন্নাত এবং নফল আদায়ের পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ বা ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম করার পদ্ধতি, তাহাজ্জুদ পড়ার পদ্ধতি, রাতের নামায এবং বিতের পড়ার পদ্ধতি, বিতেরের পর বসে নামায পড়ার পদ্ধতি, কুরআন পাঠের সময় তাঁর হাল অবস্থা, চাশতের নামায পড়ার পদ্ধতি, শোকরের সিজদা আদায় করার পদ্ধতি, জুমআর নামায পড়ার নিয়মাবলি, জুমআর দিন ইবাদতের পদ্ধতি, খুতবাদান পদ্ধতি, দু' ঈদের নামায পড়ার পদ্ধতি, সূর্য গ্রহণের সময় নামায পড়ার পদ্ধতি, অনাবৃষ্টির কারণে নামায পড়ার পদ্ধতি, সফরের পদ্ধতি, সফরে নফল পড়ার পদ্ধতি, দু' নামাযকে এক সাথে পড়ার পদ্ধতি, কুরআন পড়ার ও শুনার পদ্ধতি, পীড়িতদের দেখার ব্যাপারে পদ্ধতি, জানাযার ব্যাপারে পদ্ধতি, জানাযার সাথে দ্রুতপদে চলার পদ্ধতি, মৃতের ওপর কাপড় ঢাকা দেয়ার পদ্ধতি, কোনো লাশ আনা হলে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পদ্ধতি, তাঁর জানাযার নামাযের পদ্ধতি, শিশুদের জানাযা পড়ার ব্যাপারে তাঁর নিয়ম,

www.bjilibrary.com

আত্মহত্যাকারী এবং জিহাদে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযা না পড়া, জানাযার আগে আগে তাঁর চলা পদ্ধতি. অদৃশ্য লাশের জন্য তাঁর জানাযা পড়ার পদ্ধতি, জানাযার জন্য দাঁড়াবার পদ্ধতি, শোক প্রকাশ এবং কবর যিয়ারতের পদ্ধতি, রোযার ব্যাপারে তাঁর পদ্ধতি, রমযানে অধিক ইবাদত করার পদ্ধতি, চাঁদ দেখার সাক্ষী গ্রহণে পদ্ধতি, সফরে রোযা না রাখার ক্ষেত্রে পদ্ধতি, আরাফা দিনে আরাফার কারণে তাঁর রোযা না রাখার শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার রোযা রাখার পদ্ধতি, তাঁর একাধিক্রমে রোযা রাখার পদ্ধতি, তাঁর নফল রোযা রাখার এবং তা ভেঙ্গে যাবার পর আদায় করাকে ওয়াজিব না মনে করার পদ্ধতি, জুমআর দিনটিকে রোযার জন্য বাছাই করার পদ্ধতি, তাঁর এক বছরে দুটি ওমরা আদায়ের পদ্ধতি, হজ্বসমূহের হাল অবস্থা, নিজ হাতে কুরবানি করার পদ্ধতি, হজ্বে চুল মুণ্ডনের পদ্ধতি, হজ্বের দিনগুলোতে খুতবাদানের পদ্ধতি, ঈদুল আযহায় কুরবানি করার পদ্ধতি, আকিকা করার পদ্ধতি, নবজাতকের কানে আযান দেয়ার ও তাঁর নাম রাখার এবং খাতনা করার পদ্ধতি।

নাম ও কুনিয়াত (ডাক নাম) রাখার ব্যাপারে পদ্ধতি, কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন পদ্ধতি এবং শব্দ নির্বাচনে তাঁর পদ্ধতি, ঘরে প্রবেশ করার পদ্ধতি। পায়খানায় প্রবেশ এবং সেখান থেকে বের হবার পদ্ধতি, কাপড় পরিধান করার পদ্ধতি, ওযূর দোয়ার পদ্ধতি, প্রথম তারিখের চাঁদ দেখার পর দোয়া করার পদ্ধতি, খাবার পূর্বে ও পরে দোয়া করার পদ্ধতি, আহারের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় পদ্ধতি, সালামের আনুষ্ঠানিকতায় পদ্ধতি। অন্যের ঘরে অনুমতি নিয়ে প্রবেশের পদ্ধতি, বিবাহে দোয়া পদ্ধতি, কোনো কোনো শব্দের ব্যবহার অপসন্দ করার পদ্ধতি, যুদ্ধ এবং জিহাদের পদ্ধতি, কয়েদিদের ক্ষেত্রে গুপ্তচর-কয়েদি ও গোলামের ক্ষেত্রে গোলামির পদ্ধতি, সন্ধি করার পদ্ধতি নিরাপত্তাদানের পদ্ধতি, জিজিয়া নির্ধারণ করার, আহলে কিতাব এবং মুনাফিকদের সাথে আচার-আচরণে পদ্ধতি, কাফের এবং মুনাফিকদের সাথে পর্যায়ক্রমে ব্যবহারের পদ্ধতি, তাঁর অন্তর এবং দেহের রোগ চিকিৎসার পদ্ধতি ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

আমি আপনাদের সামনে এখানে সামান্য এবং খুঁটিনাটি কাজ-কর্মসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করেছি। আপনারা তা থেকে ধারণা করতে পারেন যে, এসব ছোট ছোট বিষয়কে যখন এভাবে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে, তখন বিরাট বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ কত বিস্তারিত বিবরণ এখানে বর্তমান। মোটকথা একটি মানুষের জীবনের যতগুলো দিক থাকা সম্ভব হতে পারে, সবই এখানে লিখে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

প্রিয় বন্ধুগণ! তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, আমি 'মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতা' বলতে কি বোঝতে চেয়েছি এবং এখন আমার দাবি মোতাবেক এ মানদণ্ডে যদি বিচার করা হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত অন্য কোন নবির জীবন এমন সুষ্ঠ পদ্ধতিতে জীবনচরিত সংরক্ষিত নেই, আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

আর এ আলোচনা সুদীর্ঘ না করে সংক্ষেপেই এবার উত্থাপন করছি। আপনারা উপলব্ধি করুন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্জনে বা জনসমাজে, মসজিদে বা জিহাদের ময়দানে, রাতের নামাযে মশগুল বা সেনাদলের সংগঠনে, ব্যস্ত মিম্বরের ওপর বা নির্জন ঘরে– যেখানে যে অবস্থায় রয়েছেন না কেন, সকল অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি আদেশ দিয়েছেন ঃ 'আমার যাবতীয় অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া কর্মকে জনসমাজে প্রকাশ করে দাও।' তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর নির্জন অবস্থান এবং ঘটনাবলি প্রকাশ করতে থাকেন। মসজিদে নববীর একটি খোলা জায়গা ছিল। সেখানে গৃহহীন আসহাফে সুফফ (ভক্তের দল) অবস্থান করতেন। তাঁরা দিনে একেকজন বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে তা বিক্রি করে খাবারের সংস্থান করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী শোনে, তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও সাহচর্যেই অবশিষ্ট সময় কাটাতেন। ৭০ এর কাছাকাছি ছিল তাঁদের সংখ্যা। হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন তাঁদের অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক রেওয়ায়েত আর কোন সাহাবির ছিল না। এ ৭০ জন অনুগত সহচরের অতি আগ্রহে দিনরাত তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করেছেন। একাধিক্রমে মদীনার সমস্ত বাসিন্দারা ১০ বছর যাবত প্রতিদিন অন্তত

www.bjilibrary.com

পাঁচবার তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কার্যকলাপ লক্ষ করেছেন। যুদ্ধকালে হাজার হাজার সাহাবা দিনরাত তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ এবং কার্যকলাপ লক্ষ করেছেন। যুদ্ধে হাজার হাজার সাহাবা দিনরাত তাঁকে দেখার এবং তাঁর অবস্থা জানার সুযোগ লাভ করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় ১০ হাজার, তাবুক যুদ্ধে ৩০ হাজার এবং বিদায় হজ্বে প্রায় এক লাখ সাহাবা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করেছেন। এভাবে নির্জনে এবং জনসমাজে, ঘরে ও বাইরে, মসজিদে এবং মসজিদের ওঠানে, সাহাবাগণের মজলিসে, শিক্ষালয়ে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে তাঁকে যে অবস্থায় দেখেছেন, তাঁর ব্যাপক প্রচারের শুধুমাত্র অনুমতিই ছিল না বরং নির্দেশ এবং কঠোর নির্দেশও ছিল। এখন আপনারাই বিচার করতে পারেন– তাঁর জীবনের কোন দিকটি পর্দান্তরালে ছিল এবং তাঁর শত্রু এবং বিরোধীরা সব রকমের যাচাই এবং অনুসন্ধান চালাবার পর মাত্র জিহাদ এবং তাঁর স্ত্রীগণের সংখ্যা ব্যতীত তাঁর অন্য কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেনি। তাহলে এমন জীবনকে নিষ্পাপ বলা সঙ্গত, না এমন জীবনকে অসঙ্গত বলা, যার বিরাট অংশ আমাদের দৃষ্টির সমানে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে?

আর অন্যদিকেও ভেবে দেখুন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় শুধু তাঁর ভক্তদল পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন না। বরং তিনি মক্কায় কুরাইশদের মাঝেও অবস্থান করেছেন। নবুয়ত-পূর্ব চল্লিশটি বছর তাদের মাঝে অতিবাহিত করেছেন। তাছাড়া ব্যবসায়ী জীবন, লেনদেন, ব্যবহারিক ও কারবারী জীবন, যেখানে প্রতি পদে পদে অসদ্ব্যবহার, অসদিচ্ছা, ওয়াদা খেলাফি, এরপরও তিনি এমন সতর্কতায় এ পথ অতিক্রম করেছেন যে, তাঁকে জনগণ 'আল-আমীন' উপাধি দান করেছে। নবুয়ত লাভের পরও লোকেরা তাঁকে পূর্বের মতই বিশ্বস্ত মনে করেছে এবং তাদের অর্থ-সম্পদ তাঁরই কাছে আমানত রেখেছে। তাই হিযরতের সময় লোকদের আমানত ফেরত দেয়ার জন্য হযরত আলীকে মক্কায় রেখে গিয়েছিলেন। কোরাইশরা তাঁর নবুয়ত দাবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করে, তাঁর সাথে সব রকমের শত্রুতা করে, তাঁকে গালি দেয়, তাঁর

www.bjilibrary.com

পথরোধ করে, তাঁর ওপর নাপাক আবর্জনা নিক্ষেপ করে, তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে, তাঁকে যাদুকর আখ্যা দেয়, কবি নামে অভিহিত করে, পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহার, কর্ম-চরিত্রের বিরুদ্ধে একটি কথা বলার দুঃহসাহস কেউ করেনি। অথচ অনুগত ও নবির দাবির অর্থই হচ্ছে এটাই যে, দাবিদার নিজের নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও মা'সুম অবস্থা ঘোষণা করছেন। এ দাবি বাতিলের জন্য তাঁর চরিত্র এবং কাজকর্ম সম্পর্কে শুধুমাত্র কয়েকটি শত্রুতামূলক সাক্ষীই যথেষ্ট ছিল। এ দাবিটিও বাতিলের জন্য বিরোধীরা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার ক্ষেত্রে পিছপা হয়নি, এরপরও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি সামান্যতম দোষারোপ করে একে চিরতরে স্তব্ধ করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। তাহলে এ থেকে কি একথা প্রমাণ হয় না যে, বন্ধুদের চোখে তিনি যেমন ছিলেন শত্রুদের চোখেও তা থেকে মোটেই ভিন্ন ছিলেন না? আর তাঁর সম্পর্কিত কোন বিষয়ই মানুষের অগোচরে বা অজানা ছিল না?

কোরাইশদের বড় বড় নেতারা একদিন মজলিস সরগরম করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ -এর সম্পর্কেই চলছিল উত্তপ্ত আলোচনা সমালোচনা। কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকারী হিসেবে নাযার ইবনে হারেস বলে ঃ 'হে কোরাইশরা! তোমাদের ওপর যে বিপদ এসেছে এর কোন সুরাহা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। মুহাম্মদ তোমাদের সামনে শিশু থেকে যুবকে পরিণত হয়েছে, সে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং উত্তম। সে তোমাদের সামনে এসব কথা বলছে। এজন্য তোমরা তাঁকে বলছ যাদুকর, জ্যোতিষী, কবি এবং পাগল। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর কথা শুনেছি। মুহাম্মদের মাঝে এ দোষগুলোর একটিও বিদ্যমান নেই। (ইবনে হিশাম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু আবূ জাহল বলেছে ঃ 'হে মুহাম্মদ! তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছি না, কিন্তু তুমি যা বলছ এবং বোঝাতে চেয়েছে, সেগুলোকেই আমি সত্য মনে করি না।' কুরআনে নিচের আয়াতটি এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে ঃ (তিরমিযী, তফসীরে আন'আম)

www.bjilibrary.com

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ۔

'আমি অবশ্যই জানি, এসব কাফেরদের কথা আপনাকে ব্যথিত করে। কিন্তু তারা তো আপনাকে মিথ্যাবদী বলে না; কিন্তু জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।' (সূরা আনআম : ৩৩)

যখন আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আদেশ করেছেন, তোমার বংশের লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদান কর, তখন তিনি একটি পাহাড়ের পাদদেশে সকলকে সমবেত করে বললেন ঃ 'হে কুরাইশগণ! আমি যদি তোমাদেরকে একথা বলি যে, এ পাহাড়ের পিছন থেকে হঠাৎ একটি সেনাদল এসে তোমাদেরকে আক্রমণ করতে এসেছে, তাহলে কি তোমরা একথা বিশ্বাস করবে? তখন সবাই বলে, 'হ্যাঁ'! কারণ কখনো তোমাকে আমরা মিথ্যা বলতে শুনিনি।' (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত যখন রূমের কাইসারের দরবারে পৌঁছেছেন। কুরাইশ বংশের কাফেরদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ সুফিয়ান, যে একাধিক্রমে ছয় বছর তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছে, তাঁকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবরণ সম্পর্কিত সাক্ষী এবং অনুসন্ধানের জন্য ডাকা হয়। এবার পরিস্থিতির নাজুকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এক শত্রু তার এমন এক শত্রুর পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে যাকে সে মনে-প্রাণে জগত থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছে। এমন এক পরাক্রান্ত বাদশাহর দরবারে এ সাক্ষী প্রদান করতে হচ্ছে যে, তাকে কোনক্রমে রাজি করতে পারলেই মূহূর্তে তার বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে এগিয়ে আসা সম্ভব। এবার সেখানকার প্রশ্নোত্তরগুলো দিকে লক্ষ করুন ঃ

কাইসার ঃ নবুয়তের দাবিদারের বংশগত মান-মর্যাদা কোন পর্যায়ের?

আবূ সুফিয়ান ঃ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত।

কাইসার ঃ এ বংশে ইতোপূর্বে আর কেউ কি নবুয়তের দাবি করেছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ না

www.bjilibrary.com

কাইসার ঃ এ বংশের কেউ বাদশাহ ছিল কি-না?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

কাইসার ঃ যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা দুর্বল না প্রভাবশালী?

আবূ সুফিয়ান ঃ নিতান্তই দুর্বল।

কাইসার ঃ তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বেড়েছে না কমেছে?

আবূ সুফিয়ান ঃ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

কাইসার ঃ তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন এমন কোন ঘটনা কি তোমরা জানতে পেরেছ?

আবূ সুফিয়ান ঃ না।

কাইসার ঃ তিনি কি কখনো নিজের প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন কি-না?

আবূ সুফিয়ান ঃ এখনো পর্যন্ত তো ভঙ্গ করেননি, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা বলা যেতে পারে না।

কাইসার ঃ তিনি মানুষকে কি শিক্ষা প্রদান করেন?

আবূ সুফিয়ান ঃ তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। নামায পড়, পাপ কাজ থেকে দূরে থাক, সত্য কথা বল, আত্মীয়-পরিজনদের হক আদায় কর ইত্যাদি।

আপনারাই এবার চিন্তা করুন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ব্যতীত অন্য কোথাও কি এমন নাযুক অবস্থায় এমন সাক্ষী পাওয়া যেতে পারে? তাঁর মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি জগতে হতে পারে!

এরপর আর একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চেয়েছি। যাঁরা প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর ঈমান এনেছেন, তাঁরা নদী-তীরের মৎস্যজীবী ছিলেন না, তাঁরা মিসরের পরাধীন এবং গোলাম জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, বরং তাঁরা ছিলেন একটি আযাদ জাতির লোক। সে জাতি ছিল বুদ্ধি এবং জ্ঞানের প্রাধান্যে সুপরিচিত এবং তারা কখনো সৃষ্টির শুরু থেকে সে সময় পর্যন্ত কারো আনুগত্য করেনি। তাদের ব্যবসা-

www.bjilibrary.com

বাণিজ্য ইরান, সিরিয়া, মিসর এবং এশিয়া মাইনর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিলেন, যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান, বুদ্ধি মেধার প্রমাণ বিভিন্ন আকারে আজও আমাদের সামনেই আলোচনায় বর্তমান আছে। তাদের মাঝে এমন লোকও আছেন, যারা বিরাট বিরাট সেনাবাহিনীর মুকাবিলা করে বিজয় লাভ করেছেন এবং জগতের শ্রেষ্ঠতর সেনাপতিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা বিরাট দেশে শাসন চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাহলে এক মুহূর্তের জন্য কি কেউ একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, এমন শক্তিশালী, এমন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের দৃষ্টি থেকে কখনো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র কোন অবস্থা আড়ালে থাকতে পারে? বরং তাঁরাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি কাজ অনুসরণ করে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসৃতিকে নিজেদের ক্ষেত্রে বিরাট সৌভাগ্য মনে করেছেন। এটিও তাঁর মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণতার এক প্রধানতম অকাট্য প্রমাণ বলা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন অবস্থা ও জীবনের কোন ঘটনা কখনো পর্দান্তরালে রাখার চেষ্টা করেননি। যেভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সবার কাছে প্রকাশিত এবং পরিচিত ছিল এবং আজও আছে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নয় বছর তাঁর সাথে বসবাস করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'যে তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র নির্দেশাবলির মাঝে থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের কাছে তা প্রকাশ করেননি, তাকে সত্যবাদী মনে করবে না।' (বুখারী, তফসীর নিচের আয়াত)

কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔

অর্থাৎ 'হে রাসূল! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিন। যদি তা না করেন তবে তো তাঁর গয়গাম পৌঁছালেন না।' (সূরা মায়িদা : ৬৭)

www.bjilibrary.com

কোন ব্যক্তিই জগতে তাঁর সামান্যতম দুর্বলতার কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে চায় না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহ্যিক ছোট-খাট ভুলত্রুটির জন্য তাঁকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এর পরেও কুরআনের প্রতিটি আয়াত তিনি লোকদেরকে শুনিয়েছেন। লোকেরা সেগুলো মুখস্থ করে নিয়েছেন। সেগুলো প্রত্যেকটি মুসজিদে এবং মেহরাবে আবৃত্তি হয়েছে। আজও যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম পরিচিত, সেখানে তাঁর অনুসারীগণের মুখে সেগুলোও উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ এ মামুলি ভ্রান্তিগুলোর উল্লেখ যদি কুরআনে না হত, তাহলে আজ জগতে এগুলোর কথা অজানাই থেকে যেত। কিন্তু একটি পবিত্র জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ই দিবালোকে আসার প্রয়োজন ছিল এবং তাই হয়েছেও।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা আরবের অজ্ঞদের কাছে একটি আপত্তিকর বিষয় ছিল। কুরআনে এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র কোন আয়াত লুকিয়ে রাখতে পারতেন, তাহলে এ আয়াতটিকে অবশ্যই লুকিয়ে রাখতেন (যে আয়াতে বিয়ের উল্লেখ আছে।) (মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা) এর ফলে অজ্ঞান লোকদের অনর্থক প্রশ্ন তোলার কোন সুযোগই হতো না। কিন্তু এমন পন্থা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের কোন অংশও অজানা নেই বা ছিল না।

বসওয়ার্থ স্মিথ কি চমৎকারভাবেই না বলেছেন ঃ 'এখানে সব কিছুই উজ্জ্বল দিনের আলোর মত সুস্পষ্ট। এ আলোক প্রতিটি বস্তুর ওপর পড়ে প্রতিটি বস্তু পর্যন্ত তা পৌঁছতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি জীবনের গভীরতম দিকগুলো চিরকালই আমাদের দৃষ্টির বাইরে বিরাজ করবে। কিন্তু আমরা মুহাম্মদের বাহ্যিক জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জানি। তাঁর যৌবন, তাঁর নবুয়তের প্রকাশ, মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অভ্যাস, তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারা এবং এর ক্রমিক উন্নতি, তাঁর ওপর মহান ওহির পর্যায়ক্রমিক অবতরণ, তাঁর ভেতরের জীবনের জন্য তাঁর ক্ষেত্রে ঘোষিত হবার পরবর্তীকালের একখানা কিতাব (কুরআন) আমাদের কাছে রয়েছে।

www.bjilibrary.com

এ গ্রন্থটি নিজের মৌলিকত্বের ব্যাপারে, সংরক্ষিত থাকার এবং অবিন্যস্ত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। এ গ্রন্থের মাঝে আলোচিত বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রশ্নে কখনো কোন ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ করতে পারেনি। যদি এমন কোন গ্রন্থ আমাদের কাছে থাকে, যার মাঝে যামানার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির সত্ত্বা রূপ লাভ করেছে, তাহলে তা হচ্ছে এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যা, সাধারণভাবে কৃত্রিমতা মুক্ত, অবিন্যস্ত, বৈপরিত্যসম্পন্ন, ক্লান্তিকর অথচ বিরাট ও মহৎ চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ। এর মাঝে আবদ্ধ আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একটি চিন্তাশীল মগজ আল্লাহ প্রেমে বিভোর। কিন্তু তার সাথে মানবিক দুর্বলতারও যোগ হয়েছে। এ দুর্বলতা থেকে মুক্ত হবার দাবি তিনি কখনো করেননি এবং এটি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ শ্রেষ্ঠত্ব যে, তা থেকে মুক্ত হবার দাবি করেননি।' (পৃষ্ঠা ১৫)

ঐতিহাসিক গীবনের ভাষায় 'প্রথম যুগের কোন নবির সত্যতার এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হননি, যেমন মুহাম্মদ উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বপ্রথম এমন সব লোকের সামনে নিজেকে নবি হিসেবে উত্থাপন করেছিলেন, যারা মানুষ হিসেবে তাঁর যাবতীয় দুর্বলতা সম্পর্কে জানা ছিল। যারা তাঁকে সবচেয় বেশি জেনেছেন, স্ত্রী, গোলাম, চাচাতো ভাই, সবচেয়ে পুরাতন বন্ধু-যাঁর সম্পর্কে মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন যে, একমাত্র সে বন্ধুই কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি এবং কখনো শঙ্কিত হয়নি– এসব লোকই সর্বপ্রথম অনুসারী হয়েছেন। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে নবিগণের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে, মুহাম্মদ এর ক্ষেত্রে হয়েছে এর ঠিক বিপরীত। যারা তাঁকে জানে না, তারা ব্যতীত অন্যদের কাছে অখ্যাত ছিলেন না তিনি।'

এ উক্তিগুলো উল্লেখ করার অর্থ হচ্ছে এটাই যে, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা যত বেশি জেনেছিলেন, তিনি তাঁর প্রতি ততই শ্রদ্ধা এবং প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সাধারণ নবিগণের ক্ষেত্রে এ নিয়ম ছিল না। সর্বপ্রথম অপরিচিত লোকেরাই তাঁদের ওপর ঈমান এনেছে। এরপর তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা এগিয়ে এসেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত পর্যায়। তাঁকে সর্বপ্রথম তাঁরাই মেনে নিয়েছেন যাঁরা তাঁর অবস্থা, চরিত্র ও অভ্যাসসমূহ সম্পর্কে

www.bjilibrary.com

সর্বাধিক জানতো এবং তাঁদের প্রত্যেকেই নিজেদের ঈমান এবং আকিদার কঠোর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তিন বছর পর্যন্ত 'শিআবে আবু তালিব' উপত্যকায় অবরুদ্ধ ছিলেন। সেখানে তাঁকে ক্ষুধা, অনাহার-অর্ধাহারের জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। যখন চারদিক থেকে শত্রুরা পচাঁদ্ধাবন করছিল তখন রাতের অন্ধকারের হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমন বিছানায় শোয়ে রয়েছেন, যা পরদিন সকালে রক্তরঞ্জিত হওয়ার কথা ছিল। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এমন ক্রীতদাস ছিলেন, যিনি পিতার সন্ধান পাবার পর তাঁর অত্যধিক পীড়াপীড়ির পরও তার নবিকে ত্যাগ করতে কোনক্রমেই সম্মত ছিলেন না।

ক্যাডফ্রে হেগেন্স 'এ্যাপল ঃ জি ফর মুহাম্মদ'-এ বলেছেন ঃ যদি 'খ্রিষ্টানরা একথা মনে রাখে, তাহলে অত্যন্ত মঙ্গলই হবে যে, মুহাম্মদ এর পয়গাম বা নির্দেশনা তাঁর অনুসারীদের মনে এমন নেশার সৃষ্টি করেছিল, যা যীশুর প্রথম যুগের অনুসারীদের মাঝে সন্ধান করা অর্থহীন। যখন যীশুকে শূলদণ্ডের ওপর চড়ান হয়, তখন তাঁর অনুগামীরা পালিয়ে যায়। তাদের ধর্মীয় নেশা কেটে গিয়েছিল এবং নিজেদের শ্রদ্ধেয় নেতাকে মৃত্যুর কবলে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রেখে তারা সরে যায়। অন্যদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীরা তাঁদের মজলুম নবির চারদিকে সমবেত হয়, তারা নিরাপত্তার জন্য নিজেদের জানমাল বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাঁকে শত্রুদের ওপর বিজয়ী করেছেন।' (উর্দু অনুবাদ, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭, ১৮৭৩ সনে বেরিলীতে মুদ্রিত)।

কুরাইশ বাহিনী যখন ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আক্রমণ করে এবং মুসলমানদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন তিনি বলেন ঃ 'কে আমার জন্য প্রাণ দেবে?' এ কথা শোনার সাথে সাথেই সাতজন আনসার বের হয়ে আসেন এবং তাঁদের প্রত্যেকে প্রাণপণ লড়াই করে শাহাদতবরণ করেন। এক আনসার মহিলার পিতা, ভাই এবং স্বামীর ন্যায় প্রিয়জন এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। পর পর এ তিনটি হৃদয় বিদারক সংবাদে কিন্তু প্রতিবারই তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আমার প্রিয় রাসূল

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলে, 'নিরাপদেই আছেন।' আনসার মহিলা কাছে এসে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখে বলেন ঃ كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ ذَامِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নিরাপদ হলে সকল বিপদই তুচ্ছ।

প্রিয় বন্ধুগণ! এ ভালবাসা, এ প্রেম, এ প্রাণ উৎসর্গের প্রেরণা তাঁদের মাঝে ছিল যাঁরা তাঁকে সর্বতোভাবে জেনেছেন। এমন কোন ব্যক্তি যার সহচরদের দৃষ্টিতে তাঁর মাঝে মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণতা অর্জন করেনি, তাঁর জন্য সহচররা কি এভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে? এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাই যে, ইসলাম তার নবির জীবনকে তাঁর অনুসারীগণের জন্য আদর্শে পরিণত করেছে এবং তাঁর অনুসৃতিকে করেছে আল্লাহর ভালবাসার মাধ্যম হিসেবে পরিণত। যেমন আল্লাহর নির্দেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ۔

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।"

তাঁর আনুগত্য এবং জীবনের অনুস্মৃতিকে আল্লাহর ভালবাসার মানদণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। দীনের নেশায় এক মুহূর্তে বিভোর হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করা সহজ। কিন্তু সারা জীবন প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রতিটি অবস্থায় তাঁর অনুসৃতি এমনভাবে অতিক্রম করা– যেন কোন পদক্ষেপেই সুন্নাতে মুহাম্মদী থেকে সামান্য পরিমাণও এদিক-ওদিক না হতে পারে– এ এক বড়ই কঠিন পরীক্ষা। এ অনুসৃতির পরীক্ষায় সকল সাহাবা পূর্ণ সাফল্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং এ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহাবা, তাবে'ঈন, তাবেই-তাবে'ঈন, মুহাদ্দিসগণ, ঐতিহাসিক এবং নবিচরিত রচয়িতাগণ তাঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি বিষয় এবং প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যত বংশধরদের জানানো নিজেদের একান্ত কর্তব্য মনে করেছেন, যেন প্রত্যেক মুসলমান সে অনুসারে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ -এর অনুসারীগণের দৃষ্টিতে তাঁর

www.bjilibrary.com

জীবনে মানবিক গুণাবলির পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল। এজন্যই তাঁরা তার অনুগমনকে পরিপূর্ণ মানবিকতার মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ। তাই এ আদর্শের সকল দিক প্রত্যেকের সামনে থাকা উচিত এবং অবশ্যই তা সবার সামনে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাঁর জীবনের কোন একটি বিষয়ও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। কোন একটি ঘটনাও পর্দান্তরালে নেই। ইতিহাসের পাতায় তাঁর জীবনের সবকিছুই প্রতিফলিত হয়েছে। কোন একটি জীবনের পরিপূর্ণতা, নিস্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক হওয়ার ওপর বিশ্বাস করার এটিই একমাত্র প্রধান উৎস। তাছাড়া যে জীবনের প্রত্যেকটি দিক এমনিভাবে উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বিবদত হয়ে থাকে, একমাত্র সে জীবনটিই মানুষের ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতীক রূপে চিহ্নিত হতে পারে।

জগতের বুকে ব্যবিলন, অ্যাসিরিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, সিরিয়া, গ্রীস এবং রোমে বিরাট বিরাট শক্তিশালী সভ্যতার জন্ম হয়েছে; নৈতিকতা সম্পর্কে চমকপ্রদ মতবাদের প্রচলন রয়েছে; সংস্কৃতির উন্নততর নীতি নির্ধারিত হয়েছে; ওঠা-বসা, পানাহার, মেলামেশা, পরিধান, বসবাস, শয়ন-জাগরণ, বিবাহ, জীবন-মৃত্যু, দুঃখ-আনন্দ, আমন্ত্রণ, সাক্ষাত, মুসাফাহা, সালাম, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, রোগীর সেবা, শোক প্রকাশ, অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানানো, কাফন-দাফন ইত্যাদির অনেক নিয়ম-কানুন, শর্ত এবং নির্দেশ প্রণীত হয়েছে ও এসবের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সামাজিকতার নীতি নির্ধারিত হয়েছে। এসব নির্ণীত হয়েছে শত শত বছরে এবং এরপরও এগুলো বিকৃত হয়েছে। এগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচেষ্টা-সাধনায় সমাজে স্থান লাভ করে, তবুও এগুলো বিলুপ্ত হয়েই যাচ্ছে। ইসলামের এ সভ্যতা-সংস্কৃতি কিন্তু মাত্র কয়েক বছরেই জন্মগ্রহণ করে সুগঠিত হয়েছে। এরপর এক হাজার চারশত বছর থেকে সারাজগতে শত শত জাতির মাঝে একই ধারায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা এর উৎস একটি মাত্র এবং তা হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন। সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শে

www.bjilibrary.com

নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন এবং এর প্রতিফলন হয়েছে পরবর্তী সময়ে তাবেঈগণের জীবনে। এভাবে তা সারা মুসলিম জগতে রীতি-প্রকৃতিও কাজে পরিণত হয়েছে। এ পবিত্র জীবনটি ছিল কেন্দ্রবিন্দু, সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে দেখায় এবং পরবর্তীগণ তাঁকে বৃত্তে পরিণত করেছেন। যদিও এ সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফল আজ পরিদৃশ্য নয়, তবুও এর পদচিহ্ন তখনো বিরাজমান এবং তারই অনুসরণে জগতের সমস্ত মুসলমান প্রভাবিত হচ্ছে। যা একদিন ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন– তাই সমস্ত সাহাবার জীবনধারায় পরিণত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা সারা মুসলিম জগতে জীবনধারার রূপে পরিগ্রহ করেছে। আজও সে পরিপূর্ণ দৃশ্য আমাদের মাঝে বিরাজমান। আফ্রিকা বা ভারতবর্ষের কোন গোত্র যখন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তাদেরকে ধর্মের প্রশিক্ষণ ইঞ্জিল থেকে প্রদান করা হলেও সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং কর্মজীবনের শিক্ষাদান করা হয় ইউরোপে সৃষ্ট সভ্যতাসমূহের ভিত্তিতে। কিন্তু যখন জগতের অসভ্য এবং বর্বর জাতি মুসলমান হয়, তখন তারা যেখান থেকে ধর্মলাভ করে সেখান থেকেই সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সামাজিকতা শিক্ষা এবং মুসলমান হবার পর ইসলামে নবির সারাজীবন মানবিক প্রয়োজন ও অবস্থাসহ তাদের সামনে উপস্থাপন হয় এবং এ সক্রিয়, জীবন্ত এবং জাগ্রত দৃশ্য প্রত্যেক মুসলমানের জীবনের প্রতিটি কাজ ও স্পন্দনে আয়নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। একজন সাহাবীকে এক ইহুদি ব্যঙ্গ করে বলে ঃ তোমাদের নবি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন এবং মামুলি কথাও বলেন, তখন সাহাবি বলেছিলেন ঃ 'অবশ্যই আমাদের নবি প্রত্যেকটি বস্তুর শিক্ষাদান করেন আমাদেরকে। এমনকি তিনি আমাদেরকে ইস্তিঞ্জা এবং হাত প্রক্ষালনের শিক্ষাও দেন।' আমরাও আজ সে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষামূলক জীবনকে জগতে উপস্থাপন করি। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন যেন জগতের গৃহ-মুকুর। এর মাঝে নিজের দেহ-আত্মা, ভেতরে-বাইর, কথা-কাজ, কণ্ঠ-হৃদয়, রসম-রেওয়াজ, নিয়ম-পদ্ধতি, চাল-চলন ইত্যাদির প্রতিফলন লক্ষ করে প্রত্যেকে সেগুলোর সংস্কার এবং সংশোধনের উদ্যোগী হতে পারে। এজন্যই মুসলিম জাতি নিজের সভ্যতা, সংস্কৃতি,

www.bjilibrary.com

সামাজিকতা ও নৈতিকতার জন্য তার ধর্মের এবং তার রাসূলের জীবনের বাইরে থেকে পৃথক কোন কিছু গ্রহণ করতে রাজি নয়। আর চাওয়ার কোন প্রয়োজনও হয় না। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জীবন ও চরিত্র মুসলিম জগতের জন্য এক বিশ্বমুকুর। এর সামনে দাঁড়ালে ভালমন্দ ও সুন্দর-অসুন্দরের রহস্য সকলের কাছে উদ্ভাসিত হয়। কেননা এরূপ ব্যাপকতা এবং পরিপূর্ণতার সাথে কোন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন জগতে চিহ্নিত নেই, এজন্য সমগ্র মানব জাতির জন্য এটিই একমাত্র পরিপূর্ণ আদর্শ এবং এমন জীবনই পরিপূর্ণ এবং আবরণহীন মানবজাতির ক্ষেত্রে আদর্শের প্রতীক হওয়ার একান্তভাবেই উপযোগী।[১]

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবন চরিত অধ্যায়ে এ শিক্ষাই আমাদের অর্জিত হয় তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামে সাধরণ এবং কঠিনতম পরিস্থিতিতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রেরণা সঞ্চারিত হবে আর হৃদয় মনে সে মহান ব্যক্তির প্রতিটি কাজের ধারা অনুসারে ভক্তি ও ভালবাসার জন্ম নেবে, যিনি মানবতার সবচেয়ে বড় সেবক ছিলেন এবং যিনি সবচেয়ে বড় উপকার ষাধন করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে হৃদয় আপ্লুত হবে এবং গভীর ভালবাসায় মন-প্রাণ ভরে ওঠবে। ইসলাম এটাই কামনা করে। রাসূল ﷺ-এর জীবন চরিতের আলোকে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে কুরআন, হাদিস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে যেসব কঠিনতম পরিবেশ-পরিস্থিতি, বিপদ, মসিবত, বাধা-বিপত্তি, আঘাত আক্রমণ একজন সত্যিকার মু'মিনের জীবনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তা আমাদের জীবনে না আসে তাহলে আমাদের চলার পথ এবং তার গন্তব্য সঠিক আছে কি পুনর্বিবেচনা করতে হবে। আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে আমরা যাকে ইসলামের পথ মনে করছি তা কুফর ও জাহিলিয়াতের পথ তো নয়। (সম্পাদক কর্তৃক সংযোজিত)

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

নবি জীবনের সর্বজনীনতার দৃষ্টান্ত

বন্ধুগণ! আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবার জন্য প্রত্যেক ধর্মে একটি মাত্র পথের নির্দেশনা রয়েছে। তা হচ্ছে সে ধর্মের প্রর্বতক যেসব উত্তম উপদেশ প্রদান করেন, সেগুলোকে মেনে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা। কিন্তু ইসলামে এর চেয়েও সুচিন্তিত এবং উত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইসলাম তাঁর নবির বাস্তব কর্মজীবন সবার সামনে উপস্থাপন করেছে এবং সে কর্ম জীবনের অনুকরণ এবং আনুগত্যকে আল্লাহ্‌র ভালবাসার যোগ্য এবং তাঁর প্রিয়পাত্র হবার উপায় হিসেবে তুলে ধরেছে। ইসলামের আছে দুটি জিনিস ঃ কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলি, যা কুরআন মজীদের দ্বারা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আর সুন্নাতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পথের ওপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, সে পথ। অর্থাৎ তাঁর বাস্তব কর্মজীবন, যার দৃশ্য আমরা শব্দের আবরণে হাদিসসমূহে পেয়ে থাকি। এজন্য একজন মুসলমানের সাফল্য এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে যে বস্তুটির একান্ত প্রয়োজন, তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর সুন্নাত বা আদর্শ অনুসরণ।

কোন ধর্মের আওতায় যেসব লোক প্রবেশ করে তাদের সকলেরই মানব জাতির কোন এক বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হওয়া অসম্ভব। কর্মের বৈষম্যের মাধ্যমেই এ জগতে সমাজ জীবনের বুনিয়াদ গড়ে ওঠেছে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন বৃত্তি ও কর্মের মাধ্যমেই জগত পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বাদশাহ বা জননায়কের প্রয়োজন যেমন আছে তেমনি অধীনস্থ জনগোষ্ঠী এবং প্রজার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা মোকাবেলায় জন্য বিচারক এবং জজের প্রয়োজন যেমন অপরিহার্য- তেমনি সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং অফিসারদের প্রয়োজনও রয়েছে। এখানে ধনী আছে আবার গরিবও আছে, রাতের ইবাদতকারী ও কৃচ্ছ্রসাধনকারীও আছে। আবার দীনের মুজাহিদ এবং সৈনিকও। সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসায়ী-

www.bjilibrary.com

বণিক, নেতা এবং জননায়কও রয়েছে। মোটকথা, এ জগতে আইন-শৃঙ্খলা এ সকল শ্রেণির অস্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠায় নির্ভরশীল। এজন্য এসব শ্রেণি তাদের নিজেদের জীবনের জন্য বাস্তব আদর্শের মুখাপেক্ষী। ইসলাম জগতের সকল মানুষকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসৃতি এবং আনুগত্যের আহ্বান জানায়। এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন মানবশ্রেণির জন্য নবির বাস্তব কর্মজীবনের মধ্যে আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই প্রমাণ হয় যে, ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা, ইসলামের নবির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ মানব জাতির সকল গোষ্ঠী ও শ্রেণির জন্য অধীনের জীবন এবং অধীনের জন্য শাসকের জীবন, আবার ধনীর জন্য গরিবের জীবন এবং গরিবের জন্য শাসকের জীবন, পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে না। এজন্য এমন একজন বিশ্বজনীন এবং স্থায়ী নবির জীবনের প্রয়োজন, যেখানে সে সমস্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলির সমাবেশ ঘটেছে! শ্রেণিগত দিক ছাড়া খোদ ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন মুহূর্তের বিভিন্ন কর্মের সর্বজনীনতা লক্ষ করার মত! আমরা চলাফেরা, ওঠা-বসা, খাওয়া-পরা, লেন-দেন, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি করে থাকি। আমরা মারি এবং মার খেয়ে থাকি, নিজে খাই আবার অন্যকে খাওয়াই, উপকার করি এবং উপকার গ্রহণ করি, প্রাণ দান করি, আবার প্রাণ রক্ষা করি, ইবাদত এবং দোয়া করি-আবার ব্যবসা-বাণিজ্যও পরিচালনা করি, আমরা মেহমান হই, আবার মেহমানদারীও করি। আমাদের দেহের কর্মের সাথে জড়িত এ সমস্ত বিভিন্ন নতুন অবস্থায় নতুন পথ-নির্দেশ এবং নতুন নেতৃত্বদানের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা প্রদান করবে।

মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব কর্মসমূহের পর হৃদয় ও মস্তিষ্কের সাথে বহু কর্মও জড়িত। এগুলোকে আমরা মানসিক কর্ম বা প্রেরণা এবং অনুভূতি বলে চিহ্নিত করি। প্রায় প্রতি মুহূর্তে একটি নতুন মানসিক কর্ম বা প্রেরণা অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হই। আমরা কখনো সন্তুষ্ট আবার কখনো অসন্তুষ্ট হয়ে থাকি। কখনো আনন্দিত, কখনো দুঃখিত হই। কখনো বিপদের মুখোমুখি হই, আবার কখনো সুখ-শান্তিতে অবস্থান করি,

www.bjilibrary.com

কখনো ব্যর্থতার মুখোমুখি হই আবার কখনো সাফল্যও অর্জন করি। এসব অবস্থায় আমরা নানা প্রেরণায় এবং আবেগে অধীনে থাকি। উন্নতর নৈতিক চরিত্র অধিক মাত্রায় নির্ভর করে সে সমস্ত প্রেরণা, আবেগ এবং অনুভূতির ভারসাম্য রক্ষা ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। এজন্য এসবের ক্ষেত্রে আমাদের একটি বাস্তব জীবনের প্রয়োজন। তার হাতে থাকবে আমাদের সে সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহী ও চপল শক্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ। সে আমাদের আত্মার ভারসাম্যহীন শক্তিসমূহকে সে পথে নিয়ে যাবে, যে পথে একদিন মদীনার নিষ্কলুষ মানবাত্মার সমাবেশে পরিণত হয়েছিল।

সাহস, দৃঢ়তা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, নির্ভরতা, ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্টি, বিপদ সহ্য করা, ত্যাগ, অল্পে তুষ্টি, স্বাবলম্বিতা, কুরবানি, দানশীলতা, নম্রতা, উন্নতি এবং অনুন্নতি, ছোট ও বড় সব ধরনের নৈতিক বৃত্তি বিভিন্ন মানুষের মাঝে বিভিন্ন অবস্থায় বা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব নির্দেশ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তা কোথায় পাওয়া যেতে পারে। তা একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছেই পাওয়া সম্ভব হতে পারে। হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে থেকে আমরা দুরন্ত সাহসিকতার দৃষ্টান্তমূলক প্রেরণা লাভ করতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে কোমল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত লাভ করতে পারি না। হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোমল ব্যবহারের অজস্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর জীবনচরিতে কর্ম-তৎপরতা ও রক্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী শক্তি অনুপস্থিত। আর এ উভয় ধরনের শক্তির ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানই মানুষের প্রয়োজন। তাই জগতে এ উভয শক্তির ব্যাপক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনেই পাওয়া সম্ভব আর তা জোর দিয়ে বলা যায়।

মানব সমাজে যে ব্যক্তি-চরিত্রে সকল গোষ্ঠী শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটেছে এবং যেখানে সকল বিষয়ে সঠিক মনোভাব এবং পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতার সমাবেশ লক্ষ করা যায়, তা হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ। যদি তুমি ধনী হয়ে থাক, তাহলে মক্কার ব্যবসায়ী এবং বাহরাইনের অর্থশালীর অনুগামী হও। যদি

www.bjilibrary.com

তুমি গরিব হয়ে থাক, তাহলে আবু তালেব গিরিসঙ্কটের কয়েদি এবং মদীনার প্রবাসীর অবস্থা শোন। যদি তুমি বাদশাহ হয়ে থাক, তাহলে কুরাইশদের অধিপতিকে এক নজর দেখ। যদি বিজয়ী হয়ে থাক, তাহলে বদর এবং হুনায়নের সিপাহসালারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি তুমি পরাজিত হয়ে থাক, তাহলে ওহুদ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। যদি তুমি শিক্ষক হও, তাহলে 'সুফফা'র শিক্ষালয়ের মহান শিক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। যদি ছাত্র হয়ে থাক, তাহলে জিব্‌রাঈল (আ.) সামনে উপবেশনকারীর দিকে তাকিয়ে দেখ। যদি বক্তৃতা এবং উপদেশদানকারী হয়ে থাক, তাহলে মদীনার মসজিদে মিম্বরের ওপর দাঁড়ানো ব্যক্তির কথা শোন। যদি তুমি নিঃসঙ্গ এবং অসহায় অবস্থায় সত্যের প্রতি আহবানকারীর দায়িত্ব পালন করতে চাও, তাহলে মক্কার সহায়-সম্বলহীন নবির আদর্শ তোমার ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ করবে। যদি তুমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে শত্রুদের পরাজিত এবং বিরোধীদের দুর্বল করতে সক্ষম হয়ে থাক, তাহলে মক্কাবিজয়ীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত কর। যদি তুমি নিজের ব্যবসা এবং পার্থিব বিষয়াবলির ব্যবস্থাপনা ঠিক করতে চাও, তাহলে বনি নাযির, খয়বর এবং ফিদাকের ভূ-সম্পত্তির মালিকের কাজ-কারবার এবং ব্যবস্থাপনা দেখে নাও। যদি ইয়াতিম হয়ে থাক, তাহলে আবদুল্লাহ এবং আমিনার কলিজার টুকরার দিকে লক্ষ কর। যদি শিশু হয়ে থাক, তাহলে হালিমা সা'ঈদার আদরের সন্তানকে দেখ। যদি যুবক হয়ে থাক, তাহলে মক্কার মেষপালকের জীবনী পাঠ কর। যদি ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী হয়ে থাক, তাহলে বসরা সফরকারী দলের অধিনায়কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। যদি আদালতের বিচারক এবং পঞ্চায়েতের বিবাদ মীমাংসাকারী হয়ে থাক, তাহলে কাবাঘরে সূর্যকিরণ প্রবেশের পূর্বে প্রবেশকারী এবং 'হাজরে আসওয়াদকে' পুনস্থাপনজনিত বিবাদ মীমাংসাকারীকে দেখে নাও। মদীনার কাঁচা মসজিদের বারান্দায় উপবেশনকারী বিচারকের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যাঁর দৃষ্টিতে বাদশাহ-ফকির, আমীর-গরিব সকলেই ছিল সমান।

www.bjilibrary.com

যদি তুমি স্বামী হয়ে থাক তাহলে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মহান স্বামীর পবিত্র জীবন পাঠ কর। যদি তুমি সন্তানের পিতা হয়ে থাক, তাহলে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পিতা এবং হাসান হোসাইনের নানার অবস্থা জিজ্ঞেস কর। আর তুমি যা-ই হও না কেন এবং যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার জীবনের ক্ষেত্রে আদর্শ, তোমার চরিত্র সংশোধনের উপকরণ, তোমার অন্ধকার ঘরের আলোকবর্তিকা এবং পথ নির্দেশক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক জীবনাদর্শের মাঝে সর্বক্ষণ এবং প্রতি মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব। তাই ঈমানি আলোকবর্তিকার অনুসন্ধানরত প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনই একমাত্র হিদায়াতের উৎস এবং নাজাত লাভের উপায় উপকরণ। তার সামনে আছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন, আবার নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আইয়ূব (আ), মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনও তার সামনে সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। কিন্তু অন্য সকল নবির জীবন যেন এমন কতকগুলো দোকান, যেখানে একটি মাত্র পণ্য পাওয়া যায়, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিত জগতের বৃহত্তম বিপণীর মত, যেখানে প্রত্যেক বস্তুর ক্রেতা ও প্রত্যেকটি জিনিস অনুসন্ধানকারীর ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে।

আজ থেকে[১] ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে পাটনার বিখ্যাত বাগ্‌মী মরহুম মাস্টার হাসান আলী 'নূর ইসলাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাতে তিনি তাঁর এক শিক্ষিত হিন্দু বন্ধুর স্বচ্ছ চিন্তা-চেতনামূলক মতামত উল্লেখ করেছিলেন। তাতে বলা হয় ঃ একদিন এ হিন্দু-বন্ধুটি মাস্টার সাহেবকে বললেন, 'আমি আপনাদের নবিকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে মনে করি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমাদের নবির তুলনায় আপনি হযরত ঈসা (আ)-কে কিরূপ মনে করেন? জবাবে বললেন, 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র তুলনায় ঈসা (আ)-কে এমন মনে হয়, যেমন কোন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির সামনে একটি ছোট্ট শিশু বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন ইসলামের নবিকে জগতে সর্বাধিক

---

১. হিসেবটা হবে ১৯২৫ সন থেকে হবে। (সম্পাদক)

www.bjilibrary.com

পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে চিন্তা-ভাবনা করেন? জবাবে বললেন, তাঁর জীবনে একই সাথে এতগুলো পরস্পর বিরোধী বিচিত্র গুণের সমাবেশ লক্ষ করা যায়, যা ইতিহাসে কখনো একই ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হতে দেখা যায় না। তিনি এমন বাদশাহ একটি দেশ যার পুরোপুরি কর্তৃত্বাধীন। আবার এমনি অসহায় খোদ নিজের ওপর নিজের অধিকার আছে বলে বিশ্বাস করেন না; বরং সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর অধিকারই স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি এমন ধনী, অর্থসম্পদ বহন করে উটের পর উট তাঁর রাজধানীতে প্রবেশ করছে, আবার এমন দরিদ্র মাসের পর মাস তাঁর ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলে না, একাদিক্রমে কয়েকদিন তাঁকে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। তিনি এমন সিপাহসালার মুষ্টিমেয় প্রায় নিরস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে পূর্ণরূপে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত অগণীত সৈন্যের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে এমন শান্তিপ্রিয় অনুগত প্রাণ উৎসর্গকারী সহচরের উপস্থিতিতেও নির্বিবাদে সন্ধি করেছেন। তিনি এমন সাহসী এবং বীর অগণীত লোকের বিরুদ্ধে একাকী অবতীর্ণ হন এবং এমন কোমল হৃদয় যিনি নিজ হাতে কখনো মানুষের সামান্যতম রক্ত প্রবাহিত করেননি। তাঁর মাটির সাথে সম্পর্ক এতই গভীর যে, আরবের প্রতিটি ধূলিকণার জন্য চিন্তিত, দরিদ্র এবং অভাবী মুসলমানদের ক্ষেত্রে চিন্তিত, মানবজাতির জন্য উদ্বিগ্ন। মোটকথা, সমগ্র জগত সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেছেন। আবার নিরাশক্তিও এত প্রবল যে নিজের আল্লাহ ব্যতীত সবাইকে ভুলে যান। কখনো ব্যক্তিগত কারণে নিজের বিরোধীদের কাছে থেকে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। সর্বদা নিজের ব্যক্তিগত শত্রুদের কল্যাণে সব সময় দোয়া করে তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন।

কিন্তু দুশমনদের কখনো আল্লাহর ক্ষমা করেননি এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারীদের সর্বদা জাহান্নাম এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। তাঁকে একই সময়ে ধারাল অস্ত্রধারী এবং রাতে জাগরণকারী চরিত্রে দেখা যায়। তাঁকে যে মুহূর্তে বিপুল পরাক্রমশালী বিজয়ী বলে ধারণা হয়, ঠিক সে সময়ে তিনি নবিসুলভ নিষ্কলুষতার সাথে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। আমরা তাঁকে যে মুহূর্তে আরবের কবি বলে উল্লেখ করেছি, ঠিক সে মুহূর্তেই তাঁকে দেখেছি খেজুরের ছোবড়ার বালিশে ভর

www.bjilibrary.com

দিয়ে মোটা চাটাইর ওপর বসা উপদেশ দানকারী রূপে। যেদিন আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে ধন-দৌলত এসে তাঁর মসজিদে স্তূপীকৃত হয়েছিল, ঠিক সে দিনই দেখা যায় তাঁর ঘরের লোকজন অনাহারী। যে যুগে যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসীরূপে মুসলমানদের ঘরে ঘরে পাঠান হত, ঠিক সে যুগেই তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.) এসে নিজের হাতের ফোসকা ও বুকের দাগ পিতাকে দেখালেন– যাঁতা পিষতে এবং মশক ভরতে ভরতে তাঁর হাত ও বুকে এসব ফোসকা এবং দাগ পড়েছিল। যখন অর্ধ আরব তাঁর কর্তৃত্বাধীন সে সময় একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর দরবারে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নবি ঘরের আসবাবপত্র দেখেছেন। তখন তিনি ছিলেন একটি বিশ্রামরত মোটা দড়ির খাটে। তখন তাঁর পবিত্র শরীরে দড়ির দাগে জর্জরিত। ঘরের এক কোণে এক মুঠি জোয়ার রাখা আছে। আর একটি খুঁটির গায়ে শুকনা মশক ঝুলছে। বিশ্বজাহানের নেতার ঘরে এ হলো অবস্থা এবং আসবাবপত্র দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কেঁদে ফেলেন। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করছে, কাইসার এবং কিস্‌রা আর আপনি নবি হয়ে এ দুরবস্থায় আছেন, এর চেয়ে অধিক দুঃখজনক বিষয় আর কি হতে পারে? জবাবে বললেন 'হে ওমর! তারা জগতের সম্পদ ভোগ করবে, আর আমরা লাভ করব আখিরাতের উচ্চ মর্যাদা, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে না?'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরম শত্রু ছিলেন আবু সুফিয়ান। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয় দেখেছিলেন। নানান রঙের পতাকার ছায়াতলে ইসলামের তরঙ্গে মুখরিত হয়েছিল। আজ আরব উপজাতিদের দুরন্ত মিছিল, অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ানের দৃষ্টিও সেদিকে ছিল। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন ঃ 'আব্বাস! তোমার ভাতিজা এখন বিরাট বাদশাহ হয়ে যাচ্ছে।' হযরত আব্বাসের দৃষ্টি অন্য দৃশ্যের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। বললেন ঃ 'হে আবু সুফিয়ান, এটা বাদশাহী নয়, নবুয়ত।'

ইতিহাস বিখ্যাত হাতেম তাঈর পুত্র ছিলেন আদী ইবনে হাতেম তাঈ গোত্র প্রধান। তিনি ঈসায়ি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ্

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। সাহাবায়ে কিরামের ভক্তি ও জিহাদের সাজসরঞ্জাম দেখে বুঝতে পেরেছিলেন না যে, হযরত মুহাম্মদ বাদশাহ না, অন্য কিছু। হঠাৎ মদীনার একটি দারিদ্র্য ক্রীতদাস এসে সেখানে দাঁড়িয়ে বলে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু কথা বলতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন, দেখ, মদীনার যেখানেই তুমি আমাকে আহবান করবে সেখানেই দাঁড়িয়ে তোমার কথা শুনব– এ বলে তিনি ওঠে দাঁড়ালেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করলেন। এমন এ বাহ্যিক শান-শওকতের অন্তরালে নম্রতা, কোমলতা এবং উদারতা দেখে হাতেম-পুত্র আদী বিস্মিত হয়ে মনে মনে চিন্তা করেন– অবশ্যই এটা নবিসুলভ শান-শওকতেরই বহিপ্রকাশ। তখনই তিনি গলা থেকে ক্রুশ নামিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন।

মোটকাথা ইতোপূর্বে যা কিছু আমি বলেছি তা নিছক কবিত্ব নয় বরং তা ঐতিহাসিক সত্য। যে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে মানুষের সকল শ্রেণির, সকল দলের ও সকল গোষ্ঠীর জন্য পথনির্দেশ, দৃষ্টান্ত ও আদর্শ নমুনা বিদ্যমান আছে, একমাত্র তিনিই এ বিচিত্র ধারা ও পেশায় পরিপূর্ণ জগতের বিশ্বজনীন ও চিরন্তন নেতৃত্বদানে সক্ষম। যে আমাদেরকে ক্রোধ, করুণা, দয়া, দানশীলতা, দারিদ্র্য, অভাব, অনাহার, সাহসিকতা, বীরত্ব, কোমলতা, সংসার বুদ্ধি, আল্লাহ্জ্ঞান এবং দীন-দুনিয়ার উভয়ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আলো প্রদান করেন, তিনি জগতের বাদশাহীর সাথে সাথে আসমানের বাদশার বাদশাহীরও সুখবর প্রদান করেন এবং উভয় বাদশাহীর নিয়ম-কানুন কর্মধারায় নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দেন, একমাত্র তিনিই মানব-জাতির নেতৃত্বদানের একমাত্র যোগ্য। জগতে সাধারণভাবে ক্ষমা, দয়া, করুণা এবং কোমলতাকে মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বিবেচনা করা হয়। বরং এসব গুণাবলিকেই একমাত্র পূর্ণতার উপায় বলে বিবেচনা করা হয়। তাই যে ব্যক্তির চরিত্রে শুধু এ একমুখী গুণের সমাবেশ দেখা যায়, তাঁকেই মানবতার সবচেয়ে বড় শিক্ষক এবং কল্যাণ সাধনকারী মনে করা হয়। কিন্তু এখন বলুন, মানুষের চরিত্রে কি শুধু এ শক্তিগুলোই রয়েছে? অথচ

www.bjilibrary.com

এর বিপরীত শক্তিগুলোরও সেখানে সমাবেশ ঘটেছে। একই মানুষের মাঝে ক্রোধ, দয়া, ভালবাসা, শত্রুতা, বাসনা, পরিতৃপ্তি, প্রতিশোধ স্পৃহা, ক্ষমা সব রকমের বিপরীত গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাই তিনিই একমাত্র একজন আদর্শ ও পরিপূর্ণ শিক্ষক হতে পারেন, যিনি এ সমস্ত শক্তি এবং আবেগের মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি করে এগুলোর যথার্থ প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণে সক্ষম। যে সকল ধর্ম দাবি করে যে, তাদের নবিগণের জীবন শুধু দয়া, করুণা, ক্ষমা ও কোমলতায় পরিপূর্ণ, তাদের অনুসারীরা কি আমাকে বলতে পারেন যে, সামগ্রিকভাবে তারা কতদিন সে নবিগণের জীবনাদর্শ মোতাবেক চলতে পারেন? প্রথম খ্রিষ্টান বাদশাহ কনস্ট্যান্টন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী কত রাজা-বাদশাহইনা রাজত্ব করেছেন এবং কত নতুন নতুন খ্রিষ্টধর্মানুসারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের মাঝে কোন বাদশাহ তাদের নবির জীবন এবং চরিত্রের অনুসরণ এবং আনুগত্যকে তার রাষ্ট্রের আইন বলে ঘোষণা করেছেন কি? তাহলে বাস্তব জগতে যে জীবনচরিত সকল দিক দিয়ে তার অনুসারীদের জন্য আদর্শ হবার যোগ্যতা রাখে না, তাকে কি করে সর্বগুণসম্পন্ন বলা যেতে পারে?

হযরত নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন ছিল কুফরির বিরুদ্ধে অবস্থান। হযরত ইবরাহীমের জীবনচরিত মূর্তি ভাঙ্গার অবস্থা উত্থাপন করে। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবন কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ এবং রাজকীয় শাসন-শৃঙ্খলা, সমাজ-বিধান, আইনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। হযরত ঈসার জীবন নম্রতা, কোমলতা, উদারতা, ক্ষমা ও পরিতুষ্টির বিস্তারিত শিক্ষায়তন। হযরত সুলায়মানের জীবন রাজকীয় শান-শওকতের, দৃঢ়তা, পরাক্রম এবং শক্তিমত্তায় পরিপূর্ণ। হযরত আইয়ূবের জীবন ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ও আদর্শ। হযরত ইউনুসের জীবন অনুতাপ, লজ্জা, প্রভুর নৈকট্যলাভ এবং ভুলের স্বীকারোক্তির প্রকাশ। হযরত ইউসুফের জীবন জেল-যুলুমে এবং হকের দাওয়াত এবং সত্য প্রচারের ব্যাপক প্রেরণার শিক্ষা, হযরত দাউদের জীবন কান্নাকাটি, দোয়া এবং আল্লাহর প্রশংসার পরিপূর্ণ কিতাব, হযরত ইয়াকুবের জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা,

www.bjilibrary.com

আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আশ্বাসের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন ও চরিতে নূহ এবং ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা, সুলায়মান এবং দাউদ, আইয়ুব এবং ইউনুস, ইউসুফ ও ইয়াকুব প্রমুখ নবিগণের সবার জীবনচরিত একত্রিত ও সুসংবদ্ধভাবে বিরাজমান।

মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী একটি দুর্বল হাদিস বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের সময় আওয়াজ এল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেশে দেশে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে যায়, যেন সমস্ত জগতে তাঁর নাম ও নিশানা জানতে চিনতে পারে, জিন-ইনসান, পশু-পাখীসহ প্রত্যেকটি প্রাণির সামনে তাঁকে নিয়ে যায়। তাকে আদমের ব্যবহার, শীশের তত্ত্বজ্ঞান, নূহের সাহসিকতা, ইবরাহীমের বন্ধুত্ব, ইসমাঈলের বাকশক্তি, ইসহাকের সন্তুষ্টি, সালেহ্‌র মধুর ভাষণ, লুতের হিকমত, মূসার কঠোরতা, আইয়ুবের সবর, ইউনুসের আনুগত্য, ইউশার জিহাদ, দাউদের কণ্ঠ, দানিয়েলের প্রেম, ইলিয়াসের গাম্ভীর্য, ইয়াহ্‌ইয়ার চারিত্রিক পবিত্রতা এবং ঈসার কৃচ্ছ্রসাধনা দান করে সকল নবিগণের চরিত্রের মাঝে তাঁকে নিমজ্জিত করে। যে সকল আলেম এ হাদিসটিকে তাঁদের কিতাবে স্থান দিয়েছেন, তাঁদের একমাত্র প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের নবির যাবতীয় গুণাবলিকে প্রকাশ করে তাঁর মর্যাদা দান করা। অর্থাৎ অন্যান্য নবিগণকে পৃথক পৃথকভাবে যা কিছু দান করা হয়েছিল, তা সব একত্রিত করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাঁর সে সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ গুণাবলির উজ্জ্বল চিত্র লক্ষ করা যায়। যখন মক্কার নবিকে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে যেতে হয়েছে তখন কি আপনারা সে নবির চিত্র দেখেন না যিনি মিসর থেকে মাদায়েনে হিজরত করেন? হেরা পর্বতের গুহাবাসী এবং সিনাই পর্বতে আল্লাহর নির্দশন প্রত্যক্ষকারীর মাঝে একদিক দিয়ে কত গভীর সামঞ্জস্য ছিল। এক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে ছিল শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, হযরত মূসার চোখ উম্মীলিত ছিল আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ ছিল মুদ্রিত। হযরত মূসা (আ)

www.bjilibrary.com

দেখেছিলেন বাইরে আর তিনি দেখেছেন ভেতরে। যয়তুন পর্বতে উপদেশ দানরত নবি হযরত ঈসা আর সাফা পর্বতে আরোহণ করে 'হে কুরাইশরা' বলে আহবানকারীর মাঝে কত সামঞ্জস্য ছিল! বদর এবং হুনায়েন এবং আহযাব ও তাবুকের সিপাহসালার এবং মাওয়াবী, উমুনী ও মূরীগণের সাথে যুদ্ধরত নবির (মূসা) মাঝে কতই না সাদৃশ্য বিদ্যমান! কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার সাতজন সর্দার প্রধানের জন্য বদদোয়া করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর জীবনের সাথে হযরত মূসার ব্যাপক মিল রয়েছে। কেননা, হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য 'মুজিযা' দেখানোর পরও তাঁর ওপর ঈমান না আনার কারণে ফিরাউনদের জন্য বদদোয়া করেছেন। আবার যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদে তাঁর শত্রু ও প্রাণ সংহারকগণের কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন, তখন তাঁর মাঝে দেখা যায় হযরত ঈসার চিত্র-যিনি কখনো শত্রুদের অমঙ্গল কামনা চাননি।

যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেন মসজিদে নববীর আদালতে ও পঞ্চায়েতসমূহের সালিসী মজলিসে বা যুদ্ধ এবং জিহাদের ময়দানে, তখন তাঁর মাঝে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিপাত করুন হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চিত্র। কিন্তু যখন তাঁকে নিজের ঘরে, পর্বতগুহায় এবং রাতের নির্জনতায় ও অন্ধকারে দেখেন, তখন তাঁর মাঝে হযরত ঈসার জীবনচিত্র লক্ষ্য করা যায়। দিন-রাতে তাঁর মুবারক কণ্ঠ থেকে দোয়া ও মুনাজাতের আওয়ায শুনে 'যবুরে' বর্ণিত দলগুলোর চিত্র চোখের সামনে ভেসে আসে। মক্কা বিজয়ের শান-শওকত এবং জ্ঞান ও বিচারের ছায়াতলে তাঁকে দেখে শান-শওকত, পরাক্রম ও সেনাদল পরিচালনাকারী সুলায়মানের কথা মনে পড়ে যাবে। যদি তাঁকে আবু তালিব গিরিসঙ্কটে তিন বছর এমনতর অবস্থায় দেখেন যে, সামান্যতম খাবারও বাইর থেকে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না, তখন মিসরের জেলে আটক হযরত ইউসুফের চিত্র মানস পটে ভেসে ওঠবে। হযরত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এনেছেন আইন, হযরত দাউদ (আ) এনেছেন দোয়া এবং মুনাজাত, হযরত ঈসা (আ.) এনেছেন কৃচ্ছ্রতা ও সদ্ব্যবহার নিয়ে,

www.bjilibrary.com

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইন এনেছেন, দোয়া এবং মুনাজাতও এনেছেন এবং কৃচ্ছ্রতা ও আচার-ব্যবহারও এনেছেন। শাব্দিক এবং অর্থগতভাবে এসব কুরআনে উল্লেখ এবং কাজের দিক দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিতে বিদ্যমান রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

প্রিয় বন্ধুগণ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতের আর একটি দিক এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। জগতে রয়েছে দু' ধরনের শিক্ষায়তন। এক ধরনের শিক্ষায়তনে শুধু একটি বিষয়েরই শিক্ষা দান করা হয়। সেখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে পৃথক এবং স্থায়ী শিক্ষাগার থাকে। যেমন মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্ট কলেজ, কমার্স কলেজ, কৃষি শিক্ষা নিকেতন, আইন কলেজ এবং ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। এসবের মাঝে প্রত্যেকটি শিক্ষক শুধু এক ধরনের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু ডাক্তার সৃষ্টি হয়। কৃষি কলেজ থেকে শুধু কৃষি বিশেষজ্ঞ। আইন কলেজ থেকে শুধু আইনবিদ। বাণিজ্য শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শুধু ব্যবসা বিশেষজ্ঞ। বিদ্যা এবং শিল্পকেন্দ্র থেকে শুধু বিদ্বান এবং শিল্পী তৈরি হয়। সাহিত্য শিক্ষায়াতন থেকে শুধু লেখক এবং সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। ক্যাডেট কলেজ থেকে শুধু উচ্চ শ্রেণির সৈনিক সৃষ্টি হয়। আর এভাবেই বিভিন্ন শিক্ষায়তনে উৎপাদন চলতে থাকে। আবার কোথাও বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকে যেগুলো দ্বিতীয় ধরনের শিক্ষায়াতন। এ শিক্ষায়তনসমূহ তাদের ব্যাপকতা এবং ক্ষমতা মোতাবেক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রদান করে। তাদের পরিচালনাধীনে থাকে মেডিকেল কলেজ, আবার শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রও, কৃষি আর প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থাকে, আবার সামরিক কলেজও থাকে। সেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্ররা এসে নিজের রুচি, প্রকৃতির প্রয়োজনে ক্ষমতা অনুযায়ী এক একটি কলেজ বা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করে। এরপর সেখানে সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং সৈনিক, আদালতের জজ এবং আইনবিদ, ব্যবসায়ী এবং এ্যাকাউন্টেন্ট, ডাক্তার, শিল্পী ও শিল্পী বিশেষজ্ঞ সবই তৈরি হয়। যদি একটু চিন্তা করলে

www.bjilibrary.com

বুঝা যাবে, শুধু একই ধরনের শিক্ষা, একই ধরনের শিল্প এবং একই ধরনের বিদ্যা আহরণে তার মাধ্যমে মানব-সমাজে পরিপূর্ণতা আসে না। বরং এর সবগুলো একত্রিত হলে তাহলেই মানব-সমাজ পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়। যদি শুধু একটি বিদ্যা এবং একটি শিল্প বিশেষজ্ঞ দ্বারা জগত ভরে যায়, তাহলে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কারখানা মুহূর্তেই রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং মানুষের যাবতীয় কাজ সহসাই স্তব্ধ হয়ে যাবে। এমনকি সারাজগত যদি নির্জনবাসী সাধনাকারীদের দ্বারা ভরে যায়, তখনো জগতে পরিপূর্ণতা সৃষ্টি হবে না। এবার আসুন, বিভিন্ন নবি-রাসূলের জীবনকে আমরা এ মানদণ্ডে বিচার করি। হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথায় বলা যায়, 'ফলেই গাছের পরিচয়।' শিক্ষায়াতনসমূহের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আধ্যাত্মিক সন্তান এবং ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে। নবিগণ ছিলেন সব শিক্ষায়তনের শিক্ষক, তাই এবার একবার সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন। প্রথমে কোথাও দশ-বিশ জন, কোথাও ষাট-সত্তর জন, কোথাও দু-একশ, কোথাও হাজার দু'-হাজার, আবার কোথাও পনের-বিশ হাজার ছাত্র দেখা যাবে।

কিন্তু এবার দেখুন নবুয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শিক্ষায়াতনটি। সেখানে একই সময়ে এক লাখেরও অধিক ছাত্র দেখতে পাবেন। তাছাড়া অন্যান্য নবির শিক্ষায়তনসমূহের ছাত্রগণের অবস্থা যদি জানতে চান, তাদের বসবাস কোথায় ছিল, তাদের পরিচয় কী, তারা কীভাবে তৈরি হয়েছিল, তাদের আচার, ব্যবহার, আধ্যাত্মিক অবস্থা, অন্যান্য বিষয় কেমন ছিল ও তাদের শিক্ষা এবং অনুশীলনের বাস্তব ফলশ্রুতি কেমন ছিল, তাহলে এ প্রশ্নগুলোর কোন জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু আপনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষায়তনের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে পারেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছাত্রের নাম, পরিচয়, অবস্থা, জীবনচরিত, শিক্ষা এবং অনুশীলনের ফলাফল, প্রত্যেকটি বস্তু ইসলামের ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল্যভাবে লেখা রয়েছে।

এবার আরো সামনে তাকিয়ে দেখুন। নবুয়ত এবং ধর্মের দাওয়াতের প্রতিটি শিক্ষায়াতন আজ দাবি করছে যে, এর দুয়ার প্রত্যেক জাতির জন্য

www.bjilibrary.com

খোলা আছে। কিন্তু সে শিক্ষায়াতনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শিক্ষকের জীবনী পাঠ করুন। তাঁর যুগে কোন একটি দেশের, একটি গোত্রের ও একটি খান্দানের ছাত্ররা কি সেখানে ভর্তি হয়েছে এবং তাদের কি ভর্তি হবার অনুমতি দান করা হয়েছে বা তাদের দাওয়াতে কি এমন কোন সর্বজনীনতা বিশ্বজনীনতা দেখা যায়, যে কারণে প্রত্যেকটি আদমসন্তান এবং ধরাপৃষ্ঠে প্রতিটি মানুষ তার মাঝে কার্যত প্রবেশ করতে পেরেছে বা প্রবেশ করার জন্য তাকে আহবান করা হয়েছে কি-না? তাওরাতের সকল নবি ইরাক, সিরিয়া বা মিসর দেশের সীমানা অতিক্রম করেননি। অর্থাৎ তাদের নিজের দেশে যেখানে তাঁরা রয়েছেন সেখানেই তাঁদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল এবং নিজেদের বংশ ও গোত্র ব্যতীত অন্যকে তাঁরা দাওয়াত প্রদান করেনি। তাঁদের প্রচেষ্টার কেন্দ্র ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু বনি ইসরাইল বংশেই সীমাবদ্ধ। আরবের প্রাচীন নবিগণও তাঁদের নিজেদের জাতির দায়িত্বই গ্রহণ করতেন। তাঁরা কেউ বাইরে যাননি। যীশুর শিক্ষায়তনে অইসরাঈল ছাত্রদের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ছিলেন শুধু ইসরাইলদের হারানো মেষগুলোর সন্ধানে। (তথ্য : মোথি: ৭ম অধ্যায়: ২৪শ আয়াত) আর অন্য জাতির লোকদের শিক্ষাদান করতেন না। (তথ্য : ইঞ্জিল) ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের আহবায়ক 'পবিত্র আর্যবর্ত্যে'র বাইরে যাবার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। যদিও গৌতম বুদ্ধের অনুসারী রাজারা তাঁর বাণীকে বাইরের জাতিদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল যথার্থই খ্রিষ্টানদের দেখাদেখি পরবর্তীকালের বৌদ্ধদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ফসল। তাদের ধর্মের আহবায়কের নিজের জীবন চরিতে এ সর্বজনীনতা ও বিশ্বজনীনতার দৃষ্টান্ত খোঁজে পাওয়া যায় না।

এবার আরবের এ উম্মী নবির শিক্ষায়াতন পর্যালোচনা করা যাক! তার ছাত্ররা কারা? তাঁরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ও যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ মক্কার কুরাইশ বংশীয় ছাত্র। তাঁরা কারা? তাঁরা আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মক্কার বাইরের তাহামা এলাকার গফফার গোত্রের লোকজন। তাঁরা কারা? তাঁরা আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও তোফায়েলদ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ইয়ামন দেশের দুসী গোত্রের লোকজন। তাঁরা কারা? তাঁরা আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মুআয ইবনে

www.bjilibrary.com

জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁরাও ইয়ামন দেশের অন্য গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি যিয়াদ ইবনে ছাআলাবা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উযদু গোত্রের লোক। ইনি কে? ইনি খাব্বাব ইবনে ইর্ত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, তামীম গোত্রের লোক। ---তাঁরা হচ্ছেন আবদুল কায়েস গোত্রের মুনকায ইবদে জাম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মানযার ইবনে আসেদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, এসেছেন বাহরাইন থেকে। আর তাঁরা হচ্ছেন আম্মানের সর্দার উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ইনি হচ্ছেন মাআন অর্থাৎ সিরিয়া অধিবাসী ফারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এ কৃষ্ণকায় লোকটি কে? ইনি হচ্ছেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। আর ইনি কে? ইনি হচ্ছেন রোমের অধিবাসী সোহায়েব রুমী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। এসব লোকজন কারা? তাঁরা হচ্ছেন ইরানের সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ফিরোজ দাইলামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সাইখাত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও মারকাবুদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁরা পুরুষানুক্রমে ছিলেন ইরানের অধিবাসী।

হিজরি ষষ্ঠ শতকে হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এমন একটি চুক্তিপত্র তৈরি করা হয় যা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যের পরিপূরক। অর্থাৎ কুরাইশ এবং মুসলমান উভয়পক্ষে যুদ্ধ মূলতবী করতে হবে এবং মুসলমানরা যেখানে ইচ্ছা তাদের ধর্মের দাওয়াত দান করে যাবে। এ বিরাট সাফল্যলাভের পর ইসলামের নবি কী করেছেন? সে বছর ৬ হিজরিতে তিনি সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাঠান এবং তাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশনা পৌঁছিয়ে দেন। দেহিয়া কালবী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রুমের কায়সার হিরাক্লিয়াসের দরবারে, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহামী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইরানের প্রভাবশালী বাদশাহ খসরু পারভেজের দরবারে; হাতিব ইবনে বালতায়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মিসরের গভর্নর মুকাওকাসের দরবারে, আমর ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজজাশীর দরবারে, সুজা' ইবনে দাহাবুল আসাদী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সিরিয়া প্রধান হারেস গাসসানীর দরবারে এবং সালীত ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইয়ামামার প্রধানগণের দরবারসমূহে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র বহন করে নিয়ে যান যে, তাঁর শিক্ষায়াতনের দ্বার সবার জন্যই উন্মুক্ত ছিল।

প্রিয় বন্ধুগণ! এসব জ্ঞানগর্ভ তথ্যমূলক আলোচনা থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষায়াতনের সর্বজনীনতার এ দিকটি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে,

www.bjilibrary.com

এর মাঝে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বর্ণ ও আকৃতি, দেশ এবং রাষ্ট্র, জাতি ও বংশ, ভাষা ও উচ্চারণ ভঙ্গিমার কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং এর দ্বার জগতের সকল জাতি, সকল বংশ, সকল দেশ ও সকল ভাষাভাষীর মানুষের জন্য সমানভাবেই উন্মুক্ত ছিল।

এবার আসুন এ শিক্ষায়তনের অবস্থা এবং মর্যাদা পর্যালোচনা করা যাক। এটি কি এমন একটি স্কুল বা কলেজ, যেখানে একটি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়? অথবা এটি একটি ব্যাপক এবং সর্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয়- যেখানে রুচি, প্রকৃতি ও সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের লোকজন ও প্রত্যেক জাতির ব্যক্তিরা শিক্ষা লাভ করে থাকেন। হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষায়তনের লক্ষ করুন! সেখানে শুধু সিপাহী, ইউশার ন্যায় সেনানায়ক এবং বিচারপতি ও সামান্য সংখ্যক ধর্মীয় পদাধিকারীই পাওয়া যায়। হযরত ঈসা (আ.)-এর ছাত্রদের সন্ধান করুন! সামান্য কিছু কৃচ্ছ্রসাধনকারী ফকিরকে দেখতে পারেন ফিলিস্তিনের গলি পথে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এখানে কি দেখবেন? একদিকে আছেন আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী, বাদশাহ আসমাহা, মাআনের প্রধান ফারদা, হামীরের প্রধান যুলকোলা, হামদান গোত্রের প্রধান আমির ইবনে শাহর, ইয়ামনের প্রধান ফিরোজ দায়লামী এবং মারকাবুদ, আম্মানের প্রধান উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং অপরদিকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সোহাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আবূ ফকীহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-র ন্যায় গোলাম এবং সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, লোবীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যীযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, নাহদীয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং উম্মে উবাইস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মত বাঁদীগণ। এবার গভীরভাবে নিরীক্ষণ করুন, এখানে আমীর-গরিব, বাদশাহ-ফকির, প্রভু-ভৃত্য সবাইকে এক সারিতে দণ্ডায়মান দেখা যাবে।

একদিকে বুদ্ধিজীবীগণ, প্রকৃতির রহস্যজ্ঞানী, দেশশাসক এবং পরিচালকগণ তাঁর শিক্ষাগার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বের হয়েছেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আলী মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মুআবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত বিশাল ভূ-খণ্ড শাসন করেছেন

www.bjilibrary.com

এবং এমনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন যে, তাঁদের সামনে মহা প্রতাবশালী বাদশাহ এবং শাসকগণের রাজনীতি, কূটনৈতিক কার্যক্রম ও শাসন-শৃঙ্খলা সম্পর্কিত বিধান এবং যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিষ্প্রভ ও অস্থিত্বহীন বলে গণ্য হয়। তাঁদের ইনসাফ এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানসমূহ ইরানী শাসনতন্ত্র এবং রোমীয় আইনকে মূল্যহীন করে দেয় এবং জগতের রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাসে এমন এক স্থান অধিকার করে, যার কোন দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায় না।

অন্যদিকে আছেন খালিদ ইবনে ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবূ উবাইদা ইবনে জাররা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁরা মাত্র কয়েক বছরে যালিম, পাপাসক্ত ও মানবতার জন্য অভিশাপ স্বরূপ পূর্ব এবং পশ্চিমের দুটি বিশাল সাম্রাজ্যকে জগত থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এভাবে তাঁরা জগতের শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক ও বিজয়ী রূপে প্রমাণিত হন। আজও তাঁদের বিজয় অভিযানের কাহিনি মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করে। সাআদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইরাক ও ইরানের রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে ইসলামের পদতলে নিক্ষেপ করেন। খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবু উবাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রোমীয়দেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করে, ইবরাহীম (আ.)-এর প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডের আমানত মুসলমানদের হাতে তুলে দেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফিরাউনের দেশ নীল নদের অববাহিকা রোমান সাম্রাজ্যের হাত থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও ইবনে আবী সারাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আফ্রিকার বিশাল ভূ-খণ্ড শত্রুদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নেন। এ বিশ্ববিখ্যাত বিজেতা এবং সেনানায়কগণের যোগ্যতা ইতিহাসের পাতায় শুধু স্বীকৃতিই লাভ করেনি বরং ইতিহাস তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রমাণ উত্থাপন করেছে। তৃতীয় দিকে বাযান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে হাসান (ইয়ামন), খালেদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে সাঈদ (সানয়া), মুহাজির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে উমাইয়া (কান্দা), যিয়াদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে লোবীদ (হাদরামাউত), আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু (তাইমা), আলা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে হাযরামী (বাহরাইন) প্রমুখ অসংখ্য সাহাবা সাফল্যজনকভাবে বিভিন্ন শহর এবং প্রদেশ শাসন করে আল্লাহর সৃষ্ট জীবকুলের জীবন সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলেছেন সে দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পাতায় লেখা রয়েছে।

www.bjilibrary.com

চতুর্থ দিকে রয়েছেন ওলামা এবং ফকীহগণের দল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে খাত্তাব, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে খাত্তাব, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইবনে আবী তালেব, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা, হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ সাহাবীগণ ইসলামি ফিক্‌হ এবং আইন শাস্ত্রের ভিত রচনা করে জগতে আইন প্রণেতাগণের মাঝে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

পঞ্চম কাতারে আছেন সাধারণ হাদিস সংকলনকারী এবং ইতিহাস রচয়িতাগণ। যেমন হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবূ মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত ইবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, হযরত বারায়া ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রমুখ অসংখ্য সাহাবি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা এবং ঘটনাবলি সংগ্রহ এবং বর্ণনা করেছেন।

সাহাবাগণের ষষ্ঠ দলটিতে রয়েছেন সত্তরজন আসহাবে সুফ্‌ফা। মসজিদে নববীর আঙ্গিনা ব্যতীত তাঁদের মাথা গুঁজার দ্বিতীয় আর কোন স্থান ছিল না। দেহের সাথে জড়ানো কাপড়টি ব্যতীত জগতে তাঁদের মালিকানায় আর দ্বিতীয় কোন বস্তু ছিল না। তাঁরা দিনে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে তা বিক্রি করে নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেছেন, তা থেকে ব্যয়ও করেছেন আল্লাহর রাস্তায় এবং রাতে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন।

সপ্তম পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করুন! আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখা যাবে জগতের বুকে তাঁর চেয়ে অধিক সত্যভাষী আজও জন্ম নেয়নি। তাঁর মতে আজকের খাবার পরবর্তী দিনের জন্য জমা রাখাও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার বিরোধী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'মসীহুল ইসলাম' উপাধি প্রদান করেছেন। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখুন, তিনি তাকওয়া এবং কৃচ্ছ্রসাধনার স্তম্ভের প্রতীক। আবুদল্লাহ ইবনে ওমরকেও দেখুন। ত্রিশ বছর তিনি পূর্ণ অনুসৃতি

www.bjilibrary.com

ও ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। আর যখন তাঁর কাছে খেলাফত গ্রহণের দাবি তোলা হয় তখন বললেন, যদি এর দরুন মুসলমানদের একবিন্দুও রক্তপাত হয়, তখন আমার কাছে এ খেলাফত অগ্রহণযোগ্য। মুসাআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও দেখুন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাকম (পরিধেয় রূপে ব্যবহৃত এক জাতীয় সূক্ষ্ম ও মোলায়েম এবং অতি মূল্যবান চামড়া) ও রেশমী বস্ত্র পরিধান করতেন। তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্য এবং বিলাসিতায় লালিত-পালিত হন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর মোটা এবং তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন এবং যখন শাহাদত লাভ করেন তখন তাঁর কাফনের পুরা কাপড়ও পাওয়া যায় না, অবশেষে তাঁকে পায়ের ওপর ঘাস ছড়িয়ে দিয়ে দাফন করা হয়েছে।

ওসমান ইবনে মাযঊন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও দেখুন। তাঁকে বলা হয় ইসলামের প্রথম সূফী। আবার মুহাম্মদ ইবনে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দেখুন। তিনি ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার যুগে বলতেন, 'যদি কোন মুসলমান তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে প্রবেশ করে তাহলেও আমি তার ওপর আঘাত হানব না। আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কেও দেখুন। তাঁর রাতের নামাযে এবং দিন রোযায় অতিবাহিত হয়েছে।

আর একদিকে দেখুন! দুঃসাহসী কর্মবীর এবং বিচক্ষণ আরবদের দল এটি। তাঁদের মাঝে রয়েছেন তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সাআদ ইবনে মুআয রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, সাআদ ইবনে ইবাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, উসাইদ ইবনে হুযাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, আসআদ ইবনে যিয়ারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। মক্কার ব্যবসায়ী এবং সওদাগরদের দেখুন আর মদীনার কৃষকদের প্রতিও লক্ষ করুণ। তাদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু, এবং সাআদ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মত ধনী ব্যক্তিও দেখা যায়।

আর একটি দল হচ্ছে শহীদ এবং নিরপরাধ নিহত ব্যক্তিদের। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের প্রিয় জীবন ত্যাগ করেছেন, তবুও সত্যের সঙ্গ ত্যাগ করতে সম্মত হননি। হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-র প্রথম স্বামীর পুত্র হালাকে তলোয়ারের অসংখ্য আঘাতে কেটে কুচি কুচি করা হয়। হযরত

www.bjilibrary.com

আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মা সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবূ জাহলের বর্শার আঘাতে নিহত হন। হযরত ইয়াসের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কাফেরদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত খোবাইব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তরবারির নিচে গলা বাড়িয়ে দেন। হারাম ইবনে মালাহাম এবং তাঁর উনসত্তর জন সাথী বীরে মাউনায় আসীয়াতুর রেহেল এবং যাকয়ান উপজাতিদ্বয়ের হাতে নির্দয়ভাবে শাহাদত বরণ করেন। রাজীয়ের ঘটনায় হযরত আসেম এবং তাঁর সাতজন সঙ্গীর দেহ বনু লাহিয়ানের একশজন তীরন্দাজের তীরের আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়! সপ্তম হিজরিতে ইবনে আবী রজার ৪৯ জন সাথী বনু সালীম গোত্রের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত কাব ইবনে ওমর সাফফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর সঙ্গী-সাথীসহ 'যাতেইতলাহে'র ময়দানে শাহাদতবরণ করেন। জগতের একটি বহুল পরিচিত ধর্ম মাত্র একটি শূলবিদ্ধ মৃত্যুকে নিয়ে আত্মগরিমা প্রকাশ করে কিন্তু ইসলামের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখুন, সেখানে অসংখ্য শূলবিদ্ধ মৃত্যু ও নির্মম হত্যা এবং শত শত কুরবানি গাহের নীরব সাক্ষী আজও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে রয়েছে।

তরবারি এবং বর্শার আঘাত বা শূলদণ্ড এগুলো সাময়িক কষ্ট। কিন্তু সত্যানুসারীর জীবন এর চেয়ে অধিক দৃঢ়তা এবং এর চেয়ে অধিক ধৈর্য ও পরীক্ষায় পরিপূর্ণ। একমাত্র সত্যেরই খাতিরেই তাঁরা বছরের পর বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁরা জ্বলন্ত-আগুনে এবং উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুয়ে রয়েছেন এবং বড় বড় পাথরখণ্ড নিজেদের বুকের ওপর ধারণ করেছেন। তাঁদের গলায় দড়ি বেঁধে টানা-হেঁচড়া করা হয় তবু জিজ্ঞাসিত হলে বার বার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালেমাই তাঁদের মুখে উচ্চারিত হয়, 'আবু তালেব গিরিসঙ্কটে' তাঁরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন-যাপন করেছেন। সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, এক রাতে ক্ষুধার তাড়নায় একটি শুকনা কাপড় পেয়ে সেটিকে ধুয়ে আগুনে ভাজা করে পানি মিশিয়ে খেয়েছি। আম্বাসা ইবনে গাযাওয়ান বলেন, আমরা সাতজন মুসলমান ছিলাম। অনভ্যস্ত খাদ্য খেয়ে খেয়ে আমাদের ঠোঁট ও জিভের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন

www.bjilibrary.com

কাফেররা তাঁকে জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুইয়ে দেয় এবং তাঁর শরীরের চর্বি গলে গলে এ আগুন নিভে যায়। বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে দুপুরের উত্তপ্ত মরু-বালুকার ওপর হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দেয়া হত এবং বুকের ওপর স্থাপন করা হত বড় বড় পাথর। তাঁর গলায় দড়ি বেঁধে অলি-গলিতে টেনে নেয়া হত। আবু ফকীহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-র পায়ে দড়ি বেঁধে পথে পথে ঘুরানো হয়। তাঁর গলা টিপে ধরা হয়। তাঁর বুকের ওপর এত বড় পাথর রাখা হত, তাতে তাঁর জিভ বেরিয়ে পড়ে। আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে উত্তপ্ত মরু বালুকার ওপর শুইয়ে নির্মমভাবে মারপিট করা হত। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু- কে তাঁর চাচা চাটাইয়ে জড়িয়ে নাকের মাঝে ধোঁয়া প্রবেশ করাত। সাঈদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু- কে দড়ি দিয়ে বেঁধে উৎপীড়ন করা হত। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু- কে তাঁর চাচা দড়ি দিয়ে বেঁধে মারপিট করে। এসব কিছু সংঘটিত হচ্ছিল, কিন্তু এরপরও যে নেশায় তাঁরা বিভোর হয়েছিলেন এর ঘোর কেটে যাচ্ছিল না। এ আবার কেমন নেশা? এ ছিল কাওসারের পানি যিনি পান করাচ্ছিলেন তাঁর চিরন্তন পানশালার পানীয় পানের নেশার মতই।

প্রিয় বন্ধুগণ! চিন্তা করুন, এরা সে বর্বর মূর্তিপূজারি ও অসভ্য আরব ছিল! এদের মাঝে একি বিপ্লব সংঘটিত হয়? এক নিরক্ষর ব্যক্তির শিক্ষা মূর্খ আরবদেরকে বুদ্ধিমান, স্বচ্ছ চিন্তা ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং আইনবিদে পরিণত করে কেমন করে! এক নিরস্ত্র নবির আবেগময় প্রচারে কিভাবে দুর্বল আরবদেরকে সেনানায়ক ও বীর যোদ্ধায় পরিণত করে নতুন প্রাণ শক্তি শৌর্যবীর্যে পরিণত করে। যারা আল্লাহ্‌র নামও জানত না তারা আবার কেমন করে এহেন রাতে জাগরণকারী সাধক মুত্তাকী ও আনুগত্যশীল বান্দায় পরিণত হলো! আপনারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষায়তন বা মদীনার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন শেষ করেছেন। সেখানে সকল বর্ণের ও সকল রুচি-প্রকৃতির ছাত্র লক্ষ করেছেন। আলেম, আইন প্রণেতা, সৈনিক, আদালতের বিচারক, শাসক এবং গভর্নর, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত, বাদশাহ ও আমীর, গোলাম, প্রভুও যোদ্ধা দেখেছেন, মৃত্যুবরণকারীও, সত্যের পথে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকেও দেখেছেন। তা থেকে আপনারাই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

www.bjilibrary.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে মানবিক গুণাবলির যোগ্যতা এবং শক্তির যে পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল, এ কথার স্বীকৃতি ব্যতীত এসব থেকে আর কোন সিদ্ধান্তে আপনি পৌঁছতে পারেন? আর এসবই ছিল তাঁর সর্বজনীন গুণাবলির বিচিত্র এবং বৈশিষ্ট্যময় প্রকাশ। এসব গুণাবলি কখনো সিদ্দিক ও ফারুকরূপে প্রতিভাত হয়েছে, কখনো যুন্নুরাইন এবং মুর্তযার রূপ ধারণ করেছে, কখনো খালিদ ও আবূ উবাইদা এবং কখনো সা'দ ও জাফর তাইয়ার রূপে উপস্থাপন হয়েছে, কখনো ইবনে ওমর এবং আবু যর এবং সালমান এবং আবু দারদারূপে মসজিদ এবং মেহরাবে দৃশ্যমান রয়েছে। কখনো তা ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব এবং যায়েদ ইবনে সাবিত ও আবুদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রূপে জ্ঞান ও শিক্ষায়তন ও বুদ্ধিতত্ত্ব জ্ঞানের পর্যায়ে রূপধারণ করেছে। আবার কখনো বিলাল এবং সোহায়েল এবং আম্মার ও খোবাইবের পরীক্ষায় হৃদয় ও আত্মার সান্ত্বনার বাণী হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অস্তিত্ব ছিল বিশ্ব উজ্জ্বলকারী সূর্যের মত। সুউচ্চ পাহাড়, বালুকাময় মরুভূমি, প্রবহমান স্রোতস্বিনী, শস্যশ্যামল ক্ষেতে সবাই নিজেদের ক্ষমতা এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তা থেকে উত্তাপ ও আলো সংগ্রহ করেছে। অথবা এ ছিল যেন বর্ষার মেঘমালা। পাহাড় পর্বত, বন-জঙ্গল, ক্ষেত-খামার, মরু-প্রান্তর, বাগান সব কিছুই এ বারিধারায় প্লাবিত হয়। প্রত্যেকেই সাধ্য অনুসারে এ বারিধারা পান করে বিভিন্ন বর্ণের পত্র-পুষ্পে সুশোভিত রূপ ধারণ করেছে।

এ বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নজনের যোগ্যতার পার্থক্যের পরও একটি বিষয় সবার মাঝে সাধারণ ছিল। আর তা হচ্ছে একই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ যা সকলকেই স্পন্দিত করছিল। একই জীবনশক্তি যা সকলের বুকে সঞ্চারমান ছিল। বাদশাহ-ফকির, আমীর-গরিব, শাসক-শাসিত, বিচারক-সাক্ষী, সেনানায়ক-সিপাহী, শিক্ষক-ছাত্র, ইবাদতকারী, কৃচ্ছ্রসাধক ও ব্যবসায়ী, ধর্মযোদ্ধা বা শহীদ সবার ক্ষেত্রে তাওহীদের জ্যোতি, আন্তরিকতার প্রবাহ, ত্যাগের প্রেরণা, মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা সর্বত্র ছিল সক্রিয়। তাঁরা যে পর্যায়েরই হোন, যেখানেই থাকেন এবং যে কাজই করুন না কেন,

www.bjilibrary.com

তাঁদের সবার মাঝে এ প্রেরণাগুলো ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। রুচি-প্রকৃতি ও পথের পার্থক্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ সকলেরই এক, একই কুরআন, একই রাসূল, একই কাবা সকলেই মেনে চলেছেন। সকল রুচি, সকল পথ ও কাজের উদ্দেশ্য ছিল জগতের সংশোধন, সৃষ্টি ক্ষেত্রে সহানুভূতি, আল্লাহর নামকে বুলন্দ করা এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবায়িত করা। এ ছাড়া তাদের সামনে আর অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্যই ছিল না।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আজকের বক্তৃতায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বজনীন গুণাবলির বিভিন্ন বৈচিত্যময় দিক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। যদি বিশ্ব-প্রকৃতিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর আপনারা বিশ্বাস করেন যে, এ জগতে মানুষের রুচি-প্রকৃতি, যোগ্যতা এবং সামর্থ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, তাহলে আপনাদেরকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বজনীন এবং সর্বগুণাধার ব্যক্তিত্ব ব্যতীত অন্য কোন মানুষ সর্বশেষ, চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন নেতা হতে পারে না। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ۔

"যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা পোষণের দাবি করে থাক, তাহলে আমার আনুগত্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" যদি তোমরা বাদশাহ হও, তাহলে আমার আনুগত্য কর। যদি তোমরা প্রজা হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি সিপাহসালার ও সিপাহী হয়ে থাক, তাহলেও আমার আনুগত্য কর। যদি শিক্ষক ও অধ্যাপক হয়ে থাক, তবু আমার আনুগত্য কর। ধনী হলেও আমার আনুগত্য কর এবং গরিব হলেও আমার আনুগত্য কর। অসাহায় ও মজলুম হলেও আমার আনুগত্য কর। আল্লাহর ইবাদতকারী এবং জাতির খাদেম হলেও আমার আনুগত্য কর। মোটকথা, তোমরা যে কোন কল্যাণকর পথই অবলম্বন কর এবং যত উন্নত এবং শ্রেষ্ঠতম আদর্শের প্রত্যাশী হও আমার আনুগত্যেই একমাত্র তা পাওয়া সম্ভব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্র

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

'আল্লাহর রাসূলের জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আর্দশ।'

প্রিয় বন্ধুগণ! এখন আমি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য কোন ব্যাপারে এবং কিভাবে করা উচিত এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁর জীবন চরিতের বাস্তব দিকগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। এটি একটি নবি ও ধর্মপ্রবর্তকগণের জিবনের এমন অধ্যায়, যার প্রায় সব অংশটুকুই শূন্য। কিন্তু এ অধ্যায়টিই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের সবচেয়ে ব্যাপক এবং বিস্তৃত। নবিগণের নেতা ও সর্বশেষ নবি কে হতে পারেন, এ সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য এমন একটি মানদণ্ডই যথেষ্ট। সদুপাদেশ, মধুর বাণী ও উন্নত শিক্ষার অভাব এখানে নেই, অভাব হচ্ছে প্রচারিত নীতি এবং বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে। বর্তমান ধর্মগুলোর প্রবর্তক ও প্রচারকগণের জীবন-কথার সবটুকু যদি পাঠ করা যায় সেখানে উৎকৃষ্ট মতবাদ, মনোরম কাহিনি, বক্তাসুলভ বিরাট দাবি, বক্তৃতার আবেগ, মুখরোচক ও সুবিন্যস্ত শব্দ এবং অত্যধিক আবেগ ও উৎসাহ পাওয়া যাবে। কিছুক্ষণের চমৎকার উপমা হৃদয় জয় করে নেবে, কিন্তু যে বিষয়টি সেখানে পাওয়া যাবে না, তা হচ্ছে নিজের প্রচারিত আদেশ-নিষেধগুলো সর্বপ্রথম নিজে পালন ও কার্যকর করে দেখানো। মানুষের কর্ম জীবনের নাম হচ্ছে চরিত্র। কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে কি তার প্রবর্তকের স্বপক্ষে এ দ্ব্যর্থহীন সাক্ষী প্রদান করেছে যে, তিনি বাস্তব কর্মজীবনের মানদণ্ডেও উন্নততর মানুষ ছিলেন? কিন্তু কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে এবং বন্ধু এবং শত্রুদের সমাবেশে ব্যক্ত করেছে ঃ

وَإِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۔ وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۔

www.bjilibrary.com

'আর আপনার জন্য অবশ্যই অফুরন্ত বিনিময়; আর অবশ্য আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।' (সূরা আল কালাম, আয়াত-৩-৪)

এখানে 'আর' যদিও ব্যাকরণের দৃষ্টিতে নিছক একটি অব্যয় পদ এবং তা পূর্বাপর দুটি বাক্যকে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আয়াতের অন্তর্নিহিত রহস্য ও বাক্য সংযোজনের দিক দিয়ে যদি বিচার করা হলে দেখা যায় যে, একটি হচ্ছে ঘটনা আর অন্যটি হচ্ছে তা কারণ। অর্থাৎ একটি হচ্ছে দাবি, অপরটি হচ্ছে তার প্রমাণ। প্রথম বাক্যে তাঁর (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র) পারিতোষিক (বিনিময়) শেষ না হবার দাবি উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে এর স্বপক্ষে যুক্তি এবং প্রমাণ হিসেবে তাঁর কর্ম ও চরিতকে উত্থাপন করা হয়েছে। কেননা তাঁর কর্মজীবন ও চরিত্রই প্রমাণ করে যে, তাঁর পারিতোষিক (বিনিময়) কখনো শেষ হবার নয়। মক্কার উম্মী শিক্ষক মুহাম্মদ ﷺ-কে আহবান জানিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ۔

"তোমরা যা কর না, তা বল কেন?" (সূরা আস্ সফ-২)

একথা ঘোষণা করার অধিকার তাঁর ছিল। কেননা তিনি যা কিছু বলেছেন একে বাস্তবে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন। তূর পাহাড়ের বক্তা ও তার উপদেশক (হযরত ইউশা) এবং সাফা পাহাড়ের প্রচারক (মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্) উভয়ের জিবন-কাহিনি এ দৃষ্টিতে তুলনা করুন। তাহলে জানা যাবে যে, একজনের চরিত্রে এর ছিটেফোঁটাও নেই, আর অন্যজনের চরিত্রে তা পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান। শক্তিলাভ করার পর ক্ষমা ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত পেশ করা উন্নত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন অক্ষম, দুর্বল ও শক্তিহীনের নীরবতাকে ক্ষমা ও ধৈর্য আখ্যা দান করা যায় না। এক ব্যক্তি কাউকেও আঘাত করেনি, কাউকেও হত্যা করেনি, কারোর সাথে অশুভ আচরণ করেনি, কারোর অর্থ লুট করেনি, কোন ঘর নির্মাণ করেনি, কিছুই সঞ্চয় করেনি। কিন্তু এসব হচ্ছে নেতিবাচক গুণ। এখন বলুন, সে কাউকেও আঘাত করেনি– একথা ঠিক। কিন্তু সে কোন অভাবী ও দুর্বলকে সাহায্য

www.bjilibrary.com

করেছে কি? কাউকেও হত্যা করেনি, কিন্তু কারোর প্রাণরক্ষা করেছে কি? কারোর সাথে অসদ্ব্যবহার করেনি, কিন্তু কারোর সাথে সদ্ব্যবহার করেছে কি? কারোর সম্পদ লুট করেনি, কিন্তু কোন গরিব ও অভাবীকে কিছু দান করেছে কি? নিজের জন্য কোন ঘর তৈরি করেনি, কিন্তু কোন গৃহহীন ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছে কি? নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করেনি, কিন্তু অন্যের জন্য কিছু করেছে বা করিয়েছে কি? জগতের প্রয়োজন এ ইতিবাচক গুণাবলির নামই হচ্ছে বাস্তব কর্মজীবনের ক্ষেত্রে।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ۔

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তুমি তাদের জন্য কোমল। (হে মুহাম্মদ) আর যদি তুমি কঠোর হৃদয় হতে তাহলে অবশ্য তারা (যারা তোমার চারপাশে জমা হয়েছে) তোমার পাশ থেকে সরে যেত।'

এ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোমল হৃদয়ের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা। দাবি ও প্রমাণসহ তা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ যদি তিনি কোমল হৃদয় এবং দয়ালু না হতেন, তাহলে এ বর্বর, নির্ভীক এবং উগ্র মেজাজের অধিকারী আরবেরা কোন দিন তাঁর চারপাশে সমবেত হত না।

আরেক স্থানে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকে একজন নবি এসেছেন। তোমাদের কষ্ট তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তোমাদের উপকার করার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি ঈমানদারদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।' (সূরা আত্ তাওবা : আয়াত-১২৮)

www.bjilibrary.com

আল্লাহ্ এ আয়াতগুলোতে সমগ্র মানবজাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকরুণ হৃদয়ানুভূতির উল্লেখ করেছেন। এজন্য বলেছেন ঃ হে মানবজাতি! তোমাদের কষ্ট এবং বিপদ, তোমাদের পাপাচার এবং যুদ্ধ ও জিহাদের কারণে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরকে ব্যথিত করে এবং তোমাদের উপকার এবং কল্যাণের জন্য তিনি সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন। মানবজাতির প্রতি এত কল্যাণ কামনাই তাঁকে তোমাদের মাঝে সত্য প্রচার এবং তোমাদের সত্য পথে আহ্বান জানানো ও উপদেশ দানে উদ্বদ্ধ করেছে। যারা তাঁর আহবান এবং উপদেশ গ্রহণ করে তাদের সাথে তিনি স্নেহপূর্ণ ও কোমল ব্যবহার করেন।

মোটকথা, এ আয়াতে এ কথার সাক্ষী প্রদান করা হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকামী এবং বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি তিনি স্নেহশীল এবং কোমল হৃদয়। তাঁর বাস্তব চরিত্র সম্পর্কে এ হচ্ছে আল্লাহ্র সাক্ষী। ইসলামের বিধি-বিধান ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে মানুষকে যে শিক্ষা দান করা হয়েছে, তার সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে একজন কর্মতৎপর নবি হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবন চরিতের কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। তাঁর ওপর যে বিধান নাযিল করা হয়েছে, তিনি নিজেই তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। ঈমান, তাওহীদ, সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত, সাদকা, খয়রাত, জিহাদ, ত্যাগ, কুরবানি, হিম্মত, দৃঢ়তা, সবর, শোকর এবং এ ছাড়াও সৎকাজ ও সচ্চরিত্র সম্পর্কে যত কথা তিনি বলেছেন, সব কিছুতেই নিজের বাস্তব কর্মজীবন থেকে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যা কিছু কুরআনে রয়েছে তার সবই তাঁর জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠেছে। কিছু সাহাবি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে হাজির হয়ে বললেন ঃ হে উম্মূল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র ও স্বভাব বর্ণনা করুণ। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জবাবে বললেন ঃ তোমরা কি কুরআন পাঠ করনি?

كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلْعَمَ اَلْقُرْاٰنَ۔

অর্থাৎ 'সমগ্র কুরআনটিই ছিল তাঁর চরিত্র'। (আবূ দাউদ)

www.bjilibrary.com

কুরআন হচ্ছে শব্দ ও বাক্যের সমষ্টি আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতের ব্যাখ্যা।

মানুষের চরিত্র, অভ্যাস ও কাজ সম্পর্কে স্ত্রীর চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু- কে বিয়ে করার পনর বছর পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দাবি করেন। একজনের পক্ষে অপরাজনের স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ইত্যাদি যথার্থরূপে জানার জন্য পনের বছরের সংসর্গ যথেষ্ট। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে নবুয়তের দাবি উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তা নির্ধিদায় গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুয়তের বিরাট দায়িত্ব লাভ করে ঘাবড়ে যান, তখন হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে শান্ত্বনা প্রদান করেন ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় ফেলবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় করেন, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করেন, গরিবকে সাহায্য করেন, মেহমানকে আপ্যায়িত করেন, হকের পক্ষাবলম্বন করেন, বিপদে মানুষের সাহায্য করেন।" (বুখারী) চিন্তা করুন, এগুলো হচ্ছে তাঁর জীবনের বাস্তব কর্মময় জীবনের তৎপরতার দৃষ্টান্ত। তিনি নবুয়তের পুর্বেও এসব কাজ সম্পাদন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণের মাঝে হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নয় বছর তাঁর সাহচর্যে রয়েছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে অভিশাপ দেয়া, কারো নিন্দা করা বা কারো সাথে কর্কশ আচার-আচরণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। দুষ্কর্মের বিনিময়ে দুষ্কর্ম করতেন না বরং ক্ষমা করে দিয়েছেন। গোনাহর কাজ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেছেন। কখনো কারোর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কখনো কোন চাকর-চাকরাণী, পুরুষ বা নারী এমনকি কোন পশুকেও কোনদিন আঘাত করেননি। কখনো কারো বৈধ আবেদন এবং অনুরোধ নাকোচ করেননি।

আত্মীয়দের মাঝে তাঁর দিনরাতের অবস্থা ও চরিত্র সম্পর্কে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর চেয়ে বেশি কেউই ওয়াকিফহাল ছিলেন না। তিনি শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি

www.bjilibrary.com

বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় প্রফুল্ল, কোমল স্বভাবের এবং সদাচারী ছিলেন। তাঁর প্রকৃতি ছিল করুণাসিক্ত। তিনি কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না। কখনো কোন মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের হত না। মানুষের দোষ এবং দুর্বলতা খুঁজে অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন না। কারোর কোন অনুরোধ যদি তাঁর অপছন্দনীয় হত, তাহলে নীরব থাকতেন। সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে তাকে ব্যথিত করতেন না এবং মঞ্জুরীও দান করতেন না। বুদ্ধিমান লোকেরা এ ব্যবহারের দ্বারাই প্রকৃত বিষয় বুঝতে পারে। এর কারণ হচ্ছে এটাই যে, কারো আশা নষ্ট করতে চান না, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিনিয়ে নিয়ে কারো হৃদয়কে ব্যথিত করতেন না, আহত হৃদয়ে প্রফুল্লতা সৃষ্টি করা ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। কেননা তিনি ছিলেন দয়ালু হৃদয় এবং করুণাশীল।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন ঃ তিনি উদারচেতা, অত্যন্ত দানশীল, সত্যভাষী ও কোমল স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা তাঁর কাছে বসে উৎফুল্ল হত। যে ব্যক্তি প্রথমবার তাঁকে দেখেছে সে ভীত হত। কিন্তু এরপর যতই তাঁর সংস্পর্শে অবস্থান করেছে ততই তাঁকে বেশি ভালবাসতে শুরু করেছে। (শামায়েলে তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনি পাঠ করে ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন হুবহু এ মতের প্রতিধ্বনি ব্যক্ত করেছেন।

হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রথম স্বামীর পুত্র হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোমল স্বভাব প্রকৃতির ছিলেন, তিনি কঠোর ছিলেন না। কারো হৃদয়ে দুঃখ দেননি। কারো মর্যাদা বিরোধী কোন কথা বলতেন না। সামান্য সামান্য ব্যাপারেও অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। কোন জিনিসকে মন্দ বলতেন না। যে প্রকারের খাবারই সামনে এসেছে– আহার করেছেন, একে মন্দ বলতেন না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো রাগান্বিত হতেন না, কারো কাছে থেকে তিনি বিনিময় বা প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং কারো হৃদয়ে দুঃখ দেয়া অপছন্দ করতেন, কিন্তু যদি কেউ কোন সত্য কথার বিরোধিতা করেছে; তাহলে সত্যের পক্ষাবলম্বনে রাগান্বিত হতেন এবং এ সত্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাতেন। (শামায়েল)

www.bjilibrary.com

যারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে কাছাকাছি এবং তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন, তারাই হচ্ছে তাঁদের সাক্ষী। তাঁর বাস্তব কর্মময় জীবনে যে কত উন্নত ছিল, এসব বিবরণ থেকেই তা অবগত হওয়া যাবে।

তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতার প্রথম দিক হচ্ছে এটাই যে, নবি হিসেবে নিজের অনুসারীগণকে যেসব উপদেশ প্রদান করেন সর্বপ্রথম নিজেই সেগুলো পালন করেছেন।

তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন সবসময় আল্লাহ্কে স্মরণ করতে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে। এ উপদেশের যে প্রভাব সাহাবাগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে তা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর নিজ জিবনে আল্লাহর স্মরণ কি পরিমাণ ছিল? দিনরাতের এমন সময় খুব কমই ছিল যখন তাঁর হৃদয় আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর কণ্ঠ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ থেকে বিরত থেকেছে। ওঠা-বসা, চলাফেরা, পানাহার, নিদ্রা, জাগরণ, কাপড় পরিধান ইত্যাদি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র নাম ও প্রশংসাবাণী তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হত। বর্তমান হাদিস গ্রন্থসমূহের একটি বিরাট অংশে তাঁর সেসব পবিত্র বাণী এবং দোয়াগুলো বর্ণিত রয়েছে। এগুলো বিভিন্ন সময় এবং বিভিন্ন অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখ জারি হয়েছে। দু'শ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থটি শুধু এসব বাণী এবং দোয়ারই সমষ্টি। এর প্রতিটি বাক্য এবং ছত্র আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব এবং আল্লাহভীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র পবিত্র মুখ সব সময়ই ছিল এ প্রশংসায় নিমজ্জিত।

আল্লাহ সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে নির্দেশ করে বলেছেন ঃ

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ

'তারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশের ওপর শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।' (সূরা আলে-ইমরান-১৯১)

আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব জীবনের চিত্র। এজন্য হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সময় এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

তিনি মুসলমানদেরকে নামায পড়ার আদেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের অবস্থা কিরূপ ছিল? তাঁর অনুসারীগণকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু নিজে আট ওয়াক্ত নামায পড়তেন। সূর্যোদয়ের পর ইশরাক, এরপর দিনের কিছু অংশ অতীত হলে চাশত, এরপর যথাক্রমে যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা। এরপর শেষরাতে তাহাজ্জুদ এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফযরের নামায নিয়মিত পড়তেন। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ফযরে দু'রাকাত, মাগরিবে তিন রাকাত এবং অবশিষ্ট তিন ওয়াক্তে চার রাকাত করে নামায ফরয। অর্থাৎ দিনরাতে মাত্র সতের রাকাত নামায ফরয। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনরাত কমবেশি পঞ্চাশ-ষাট রাকাত নামায পড়তেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হবার পর তাহাজ্জুদের নামায সাধারণ মুসলমানদের জন্য মাফ করে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নামাযটিও সারাজীবন প্রতি রাতেই আদায় করেছেন। আর তাঁর পবিত্র নামাযই বা কেমন ছিল? রাতভর দাঁড়িয়ে থেকেছেন। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তাঁর পবিত্র পা দুটি ফুলে যেত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন ঃ আল্লাহ্ তো আপনাকে সকল দিক দিয়ে মাফ করে দিয়েছেন, এরপরও আপনার এত কষ্ট করার কি প্রয়োজন? বলতেন ঃ হে আয়েশা! আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হব না? অর্থাৎ এ নামাযের উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ভয় নয় বরং আল্লাহ্ প্রেম। রুকুতে বহুক্ষণ ঝুঁকে থেকেছেন, এমনকি লোকেরা মনে করেছে যে সিজদা করা ভুলে গিয়েছেন।

তিনি নবুয়তের সূচনাকাল থেকে নামায পড়তেন, কাফেররা তাঁর ঘোর বিরোধী ছিল। কিন্তু তবু তিনি হারেম শরীফে গিয়ে সবার সামনে নামায পড়তেন। অনেকবার নামায পড়া অবস্থায় কাফেররা তাঁর ওপর আক্রমণও করেছে। তবুও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত হননি। কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে নামায পড়া ছিল সবচেয়ে কঠিন এবং সংকটজনক অবস্থা। দু'দলের সেনারা যুদ্ধে লিপ্ত। তীর-তরবারি এবং বর্শা মানুষের বুক বিদীর্ণ করছে। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হয়। সাথে সাথেই সাহাবাগণকে নামাযের জন্য কাতারবদ্ধ করেছেন। বদরের যুদ্ধে সকল মুসলিম সেনাদল কাফেরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আর

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র কাছে সিজদায় ঝুঁকেছিলেন। সারা জীবনে তাঁর কোন নামায নির্ধারিত সময় থেকে ব্যতিক্রম হয়নি। আর দু'ওয়াক্ত ব্যতীত তাঁর কোন ওয়াক্তের নামায কাযাও হয়নি। একবার খন্দক যুদ্ধে ঘোরতর আক্রমণ চলাকালে কাফেররা আসরের নামায আদায়ের সুযোগ দেয়নি। আর একবার আর একটি যুদ্ধে-সফরে সারারাত পথ চলার পর ফযরের নামাযের সময় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাই পরে কাযা নামায আদায় করেছেন। এর চেয়েও কঠিন অবস্থা ছিল তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন। কষ্ট হচ্ছিল বর্ণনাতীত। কিন্তু নামায এমনকি জামাতের সাথে নামায পড়াও ত্যাগ করেননি, চলার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, এরপরও সাহাবাগণের কাঁধে ভর দিয়ে মসজিদে এসেছেন। তিনি ইন্তিকালের তিনদিন পূর্বে একবার ওঠার চেষ্টা করে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনবারই এ অবস্থা হয়। তখন তাঁকে জামাতের সাথে নামায পড়া ত্যাগ করতে হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার আদেশ দিয়েছেন। তা মুসলমানদের ওপর সারা বছরে মাত্র ত্রিশ দিন রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তাঁর নিজের কি অবস্থা ছিল? রোযা ছাড়া তাঁর একটি সপ্তাহ এবং একটি মাসও অতিবাহিত হয়নি। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন ঃ যখন রোযা রাখা শুরু করতেন, তখন মনে হত আর কোন দিন ইফতার করবেন না। তিনি মুসলমানদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেন, তাঁর নিজের অবস্থা ছিল এটাই যে কখনো কখনো দুতিন দিন কিছুই খেতেন না এবং একাদিক্রমে দু-তিন দিন রোযা রেখেছেন। এ সময়ে এক তিল পরিমাণ খবারও তাঁর মুখে প্রবেশ করেনি। সাহাবাগণ যদি এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করতে চেয়েছেন তাহলে বলতেন ঃ তোমাদের মাঝে কে আমার মত? আমাকে তো আমার প্রভু পানাহার করান। বছরের দু'টি মাস রমযান এবং শাবান তাঁর পুরোপুরি রোযা আদায়ে অতিবাহিত হয়। প্রত্যেক মাসেই কয়েকদিন রোযার মাঝে অতিবাহিত করতেন। প্রতি সপ্তাহে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ ছিল রোযার ব্যাপারে তাঁর বাস্তব জীবনের করণীয় কাজ।

www.bjilibrary.com

তিনি মুসলমানদেরকে যাকাত এবং সাদকাদানের আদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বপ্রথম নিজে এ বিষয়ে আমল করে দেখিয়েছেন। হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-র সাক্ষী আপনারা শুনেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্তদের ঋণ শোধ করে দেন, গরিব ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেননি যে, তোমরা সবকিছু ত্যাগ করে আমার পেছনে এসে দাঁড়াও। তিনি ঘর-সংসার যথাসর্বস্ব দিয়ে দেয়ার আদেশও দেননি এবং আসমানি সাম্রাজ্যের দুয়ার ধনীদের জন্য বন্ধও করে দেননি। বরং শুধু এতটুকু আদেশ দিয়েছেন যে, নিজেদের আয়ের এক অংশ অন্যদের দান করে আল্লাহ্র হক আদায় কর।

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের যে সম্পদ প্রদান করেছি এর একটি অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর।" কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর নিজের নীতি ছিল এটাই যে, তাঁর কাছে যা কিছু এসেছে সবই আল্লাহ্র পথে খরচ করে দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বিজয় অভিযানের ফলে অর্থসম্পদের আমদানি অপ্রচুর ছিল না। কিন্তু সেসব ছিল অন্যের জন্য, তাঁর নিজের জন্য কিছুই ছিল না। দারিদ্র্যতা ও অনাহার ছিল তাঁর চিরসাথী। খায়বার বিজয়ের পর অর্থাৎ সপ্তম হিজরি থেকে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর মহিয়সী এবং পবিত্রচরিতা স্ত্রীগণকে সারা বছরের খোরাক দান করতেন। কিন্তু বছর শেষ হবার আগেই তাঁদের শস্য ফুরিয়ে যেত। কেননা, শস্যের বিরাট অংশ অভাবীদের কাছে চলে যেত। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দান করতেন রমযান মাসে। জীবনে কারো আবেদনের জবাবে তিনি কখনো 'না' বলেননি। কখনো কোন জিনিস একাকী খেতেন না। যৎসামান্য পরিমাণ জিনিসই হোক না কেন, উপস্থিত সবাইকে তাঁর সাথে শরিক করতেন। তিনি সাধারণ আদেশ জারি করেছিলেন যে, 'যে মুসলমান ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার সংবাদ আমাকে জানাবে, আমি তার ঋণ শোধ করব। আর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হবে

www.bjilibrary.com

তার ওয়ারিসগণ।' একবার এক বেদুইন এসে বলে ঃ 'হে মুহাম্মদ! এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার পিতারও নয়। এগুলো আমার উটের পিঠে চাপিয়ে দাও।' তিনি জোয়ার এবং খেজুর দিয়ে তার উটের পিঠ বোঝাই করে দেন এবং এভাবে বলার জন্য মোটেই রাগান্বিত হলেন না। তিনি নিজে বলতেন,

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ۔

অর্থাৎ "আমি তো হচ্ছি বিতরণকারী ও খাজাঞ্চী এবং প্রকৃত দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্।" হযরত আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, একবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলাম। পথে তিনি বললেন ঃ হে আবু যর! যদি ওহুদের এ পাহাড়টি আমার জন্য সোনায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে তিনরাত পর এর মাঝ থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকা আমি পছন্দ করব না। কিন্তু যদি কোন ঋণ থাকে তাহলে তা শোধ করার জন্য হয়তো কিছু রাখব।'

বন্ধুগণ! এগুলো শুধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র মনোমুগ্ধকর বাণীই ছিল না বরং এ ছিল তাঁর যথার্থ সঙ্কল্পের প্রকাশ এবং তিনি এ-সবই কার্যকর করেছেন। বাহরাইন থেকে একবার রাজস্ব বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওগুলো মসজিদের সামনে ঢেলে দেয়া হোক! ফযরের নামাযের জন্য যখন তিনি মসজিদের এলেন তখন ধন-সম্পদের স্তূপের দিকে চোখ ওঠিয়ে দেখলেন না। নামাযের পর স্তূপের কাছে বসে বিতরণ শুরু করলেন। যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন জামা-কাপড় ঝেড়ে এমনভাবে ওঠে পড়লেন যেন এগুলো ছিল ময়লা আবর্জনা এবং এগুলো লেগে তাঁর জামা-কাপড় নষ্ট হয়েছিল। একবার ফিদাক থেকে চারটি উট বোঝাই শস্য এলো। কিছু ঋণ ছিল, হযরত তা আদায় করলেন। কিছু ভাগ করলেন। এরপর তিনি বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আর কিছু অবশিষ্ট নেই তো? জবাব এল ঃ আর কোন প্রার্থী নেই, তাই কিছুটা রয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যতক্ষণ জগতের এ সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি ঘরে প্রবেশ করতে পারি

www.bjilibrary.com

না। কাজেই রাতটি মসজিদে কাটালেন। সকালে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এসে সুখবর শুনালেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্বমুক্ত করেছেন।' অর্থাৎ যা কিছু ছিল সবই বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করলেন। একবার আসরের নামাযের পরই ঘরে প্রবেশ করলেন, আবার সাথে সাথে বের হয়ে এলেন। লোকেরা অবাক হলো। তিনি বললেন, 'নামাযের মাঝে আমার মনে হলো যে, ছোট এক টুকরা সোনা আমার ঘরে রয়ে গিয়েছে। মনে হলো, রাত আসা পর্যন্ত যেন তা মুহাম্মদের ঘরে পড়ে না থাকে। হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত এবং বিষণ্ন অবস্থায় ঘরের ভেতর এলেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করেছি। বললেন, 'উম্মে সালামা! গতকাল যে সাতটি দীনার এসেছিল, তা আজ সারাটি দিন অতীত হয়ে যাবার পরও এখন সন্ধ্যা নাগাদ আমার বিছানার ওপর পড়ে আছে।' এর চেয়েও বড় ঘটনা হচ্ছে এটাই যে, তিনি যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত, ভীষণ রোগকষ্ট ও অস্থিরতা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ মনে হলো কয়েকটি আশরাফী ঘরে রয়েছে। আদেশ হলো, 'এখনই ওগুলো বিতরণ করে দাও। মুহাম্মদ কি তার প্রতিপালকের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার পেছনে তার ঘরে আশরাফী পড়ে থাকবে?'

এ অধ্যায়ে বর্ণিত এ বিষয়গুলোই তাঁর কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রতিফলন। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন এবং অল্প-তুষ্টির শিক্ষা দান করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর নিজের কর্ম পদ্ধতি কি ছিল? আগেই শুনেছেন যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ জিযিয়া, খারাজ, উশর, যাকাত ও সাদকা মদীনায় স্তূপীকৃত হত। কিন্তু সমগ্র আরবের শাসনকর্তার ঘরে আগেরই মত অভাব এবং অনাহারের ধারাই চলছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর হযরত 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জগত থেকে চলে গিয়েছেন, কিন্তু কখনো দুবেলা পেট ভরে খেতে পারেননি।' তিনি আরো বলেন, ' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর ঘরে সেদিনের খাবার জন্য সামান্য জোয়ার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আর কয়েক সের জোয়ারের বিনিময়ে এক ইহুদির কাছে তাঁর লৌহবর্ম

www.bjilibrary.com

বন্ধক রাখা ছিল। তিনি বলতেন ঃ আদম সন্তানের এ কয়েকটি বস্তু ব্যতীত আর কোন কিছুরই অধিকার নেই ঃ বসবাসের জন্য একটি কুঁড়েঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা কাপড় এবং ক্ষুধা মেটাবার জন্য শুকনো রুটি ও পানিই যথেষ্ট।' (তিরমিযী)

এগুলো নিছক চিত্তাকর্ষক কথাই ছিল না কিন্তু এ ছিল তাঁর জীবনযাত্রার বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রতিফলন। তাঁর বসবাসের জন্য ছিল মাত্র একটি ঘর। তার দেয়াল ছিল কাঁচা এবং ছাদ ছিল খেজুর পাতা এবং উটের চুলে ছাওয়া। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাপড় কখনো পাট করে সাজিয়ে রাখা হত না। অর্থাৎ তিনি যে কাপড় পরতেন, তা ছাড়া কোন অতিরিক্ত কাপড়ও তাঁর ছিল না, যা পাট করে রাখা যায়। একদিন এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে এসে বলে, 'আমি বড় ক্ষুধার্থ।' তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে বলে পাঠালেন কিছু খাবার যদি থাকে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে থেকে জবাব এল, ঘরে পানি ব্যতীত আর কিছুই নেই। হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি মসজিদে মাটির ওপর শুয়ে আছেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় এপাশ-ওপাশ করছেন। একবার সাহাবাগণ তাঁর খিদমতে অনাহারের অভিযোগ করলেন এবং পেটের কাপড় সরিয়ে দেখালেন সেখানে একটি পাথর বাঁধা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর পেটের কাপড় সরালেন, সেখানে একটির পরিবর্তে দু'টি পাথর বাঁধা ছিল। অর্থাৎ তিনি দু'দিন থেকে অনাহারে ছিলেন। অধিকাংশ সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে যেত। একদিন ঘর থেকে বের হলেন, তখন অনহারে ছিলেন। তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঘরে যান। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বাগান থেকে খেজুর কেটে এনে আহারের ব্যবস্থা করলেন। খাবার সামনে আসার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রুটির ওপর সামান্য গোশত রেখে বললেন, এটি ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে পাঠাও, কয়েকদিন থেকে তার ভাগ্যে খাবার জোটেনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং দৌহিত্র হাসান হোসাইনকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। কিন্তু আরবের শাসনকর্তা তাঁর এ

www.bjilibrary.com

ভালবাসাকে মূল্যবান পোশাক এবং সোনা-রূপার অলংকারের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। একবার তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু প্রদত্ত একটি সোনার হার হযরত ফাতিমার গলায় দেখে বললেন ঃ হে ফাতিমা! তুমি কি লোকের মুখ থেকে একথা শুনতে চাও যে মুহাম্মদের কন্যা গলায় আগুনের শিকল বেঁধে নিয়েছে? হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তখনই গলা থেকে হার খুলে বিক্রি করে দেন এবং এর মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে আযাদ করেন। অনুরূপভাবে একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সোনার কঙ্কন পরিধান করলে তিনি তা খুলে দেন এবং বলেন 'এটি মুহাম্মদের স্ত্রীর উপযোগী নয়।' তিনি বললেন, 'একজন মুসাফিরের জন্য যে পরিমাণ পাথেয় প্রয়োজন মানুষের জন্য জগতে ঠিক ততটুকুই যথেষ্ট।' এসব তাঁর উক্তি। তাঁর কাজও ছিল এর সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল। একবার কিছু সাহাবা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এসে দেখেন, তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইর গভীর দাগ পড়ে রয়েছে। বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আমরা আপনার জন্য একটি নরম তোষক তৈরি কারে আনতে চাই। জবাবে বললেন, 'জগতের সাথে আমার কি সম্পর্ক? জগতের সাথে আমার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু একজন ঘোড়সওয়ারের সম্পর্ক গাছের ছায়ার সাথে, যে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে। এরপর আবার নিজের পথে এগিয়ে চলে।' নবম হিজরিতে যখন ইসলামি রাষ্ট্র ইয়ামান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আসবাবপত্রের মাঝে ছিল ঃ পরনের একটি তহবন্দ, একটি বিছানা ছাড়া খাট, খোর্মার ছালে ভরা একটি বালিশ, এক কোণে সামান্য পরিমাণ জোয়ার, একদিকে একটি পশুর চামড়া এবং খুঁটিতে ঝুলানো একটি পানির মশক। তিনি যে কৃচ্ছ্র সাধন এবং অল্পতুষ্টির শিক্ষা দান করেছিলেন একে নিজের জীবনে এভাবে বাস্তবায়িত করেছিলেনও।

বন্ধুগণ! ত্যাগ এবং কুরবানি সম্পর্কে অনেককে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন। কিন্তু তাদের কারো জীবনে এর বাস্তব চিত্রও দেখেছেন কি? এর চিত্র দেখতে পারেন, মদীনার অলিতে-গলিতে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ত্যাগের শিক্ষা দান করেছেন এবং এ সাথে তাদের সামনে

www.bjilibrary.com

নিজের আদর্শও স্থাপন করেছেন। বলাবাহুল্য হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর অবস্থা এরূপ ছিল যে, যাঁতা পিষতে পিষতে তাঁর হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল এবং মশকে করে পানি আনতে আনতে বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় একদিন পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে একটি খাদেম দান করার জন্য আবেদন করেন। জবাবে বললেন ঃ 'হে ফাতিমা! এখনো সুফ্ফার গরিবদের সুরাহা করতে পারিনি। এমতাবস্থায় তোমার আবেদন কেমন করে পূর্ণ করা যাবে? বর্ণনান্তরে বলা হয়েছে ঃ

'হে ফাতিমা! বদরের ইয়াতিমরা তোমার পূর্বে আবেদন জানিয়েছে। একবার তাঁর কাছে চাঁদর ছিল না, এক মহিলা সাহাবি একটি চাঁদর এনে তাঁকে দেন। তখনই এক ব্যক্তি বলেন, কি চমৎকার চাঁদর! তিনি চাঁদরটি তাকে দিয়ে দেন। এক সাহাবির ঘরে কোন উৎসব ছিল, কিন্তু তাঁর কাছে কোন আহার্য দ্রব্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আয়েশার কাছে গিয়ে আটা চেয়ে নিয়ে এস।' তিনি গিয়ে আটা আনলেন। অথচ সেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে সে আটা ব্যতীত আর কোন খাবার বস্তুই ছিল না। একদিন সুফ্ফার গরিবদের নিয়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঘরে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'যা খাবার আছে হাজির কর।' আটার ভূষির হালুয়া হাজির করা হলো। তা যথেষ্ট হলো না। আরো কিছু খাবার চান। তখন খোর্মার হারীরা (পানীয়) পেশ করা হলো। এরপর দুধের পেয়ালা এল কিন্তু মেহমানদারীর জন্য এটিই ছিল ঘরের সর্বশেষ অবলম্বন মাত্র। এসব ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ত্যাগ। নিজের জীবনে তিনি এভাবেই তার বাস্তব রূপ দেখিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার চিত্র দেখতে হলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র দিকে দৃষ্টিপাত করুন। আল্লাহর নির্দেশ ছিল ঃ

وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔

www.bjilibrary.com

'মহাপরাক্রমশালী নবি-রাসূলগণ যে সবর এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তুমিও তেমনি সবর এবং দৃঢ়তা দেখাও।' অবশ্য তিনি ঠিক তেমনি সবর ও দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। এমন একটি মূর্খ এবং অশিক্ষিত জাতির মাঝে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা তাদের বিশ্বাস ও আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে রাজি ছিল না এবং এজন্য প্রাণ সংহারে উদ্যোগী হত। কিন্তু তিনি কখনো এসবের পরোয়া করেননি। হারেম শরীফে গিয়ে তিনি তাওহীদের আওয়াজ বুলন্দ করতেন এবং সেখানে সবার সামনে নামায পড়তেন। হারেম শরীফের সামনে বসত কুরাইশ সর্দারদের মজলিস। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রুকু ও সিজদা করতেন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔

'হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে হুকুম করা হয়, তা সরবে ঘোষণা কর।' আয়াতটি নাযিল হবার পর তিনি সাফা পাহাড়ে ওঠে কুরাইশগণকে আহবান জানালেন ও আল্লাহর হুকুম শুনিয়ে দেন।

কুরাইশরা তাঁর সাথে চরম দুর্ব্যবহার করেছে। হারেম শরীফের তাঁর পবিত্র শরীরে নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করেছে। গলায় চাঁদর জড়িয়ে তাঁকে ফাঁসি দেয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এরপরও আল্লাহর পথে তাঁর পদদ্বয় একটুও টলমল করেনি। পথ থেকে এক চুলও বিচ্যুত হননি। আবূ তালিব যখন তার সমর্থন ওঠিয়ে নেয়ার 'ইঙ্গিত দেয়, তখন তিনি কেমন আবেগ এবং উৎসাহভরে বললেন ঃ 'চাচাজান! যদি কুরাইশরা আমার ডান হতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে রাখে, তবুও আমি এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।' অবশেষে তাঁকে বনু হাশেমের গিরিসঙ্কটে প্রায় তিন বছর আবদ্ধ করে রাখা হয়। তাঁর এবং তাঁর খান্দানকে সামাজিক বয়কট করা হয়। ভেতরে শস্য সরবরাহ বন্ধ করা হয়। শিশুরা ক্ষুধায় চিৎকার করতে থাকে। যুবকরা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। অবশেষে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। এসব কিছুই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো সবর এবং দৃঢ়তাহারা হননি।

www.bjilibrary.com

হিজরতের সময় 'সাওর' গুহায় আশ্রয় নেন। কাফেররা তাঁর অনুসরণ করে গুহার মুখে পৌঁছে যায়। নির্বান্ধব এবং অসহায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর শত্রু সশস্ত্র কুরাইশ দলের মধ্যে মাত্র কয়েক গজের ব্যবধান ছিল। সাথী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শঙ্কিত হন। বলেন, 'হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ! আমরা মাত্র দুজন।' কিন্তু বিশ্বাস এবং প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ একটি আওয়াজ হলো ঃ 'হে আবূ বকর! আমরা দুজন নই, তিনজন لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ভীত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।'

এ হিজরতের পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে গ্রেফতার করার জন্য সুরাকা ইবনে জাসাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে বর্শা হাতে নিয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসে। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন ঃ 'হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ। আমরা গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছি।' কিন্তু রাসূলে আল্লাহ ﷺ তখনো যথারীতি কুরআন পাঠ করে চলেছেন। তাঁর অন্তর তখনো গভীর প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ ছিল।

মদীনায় পৌঁছার পর ইহুদি মুনাফিক এবং কুরাইশ হামলাকারীদের ভয় সৃষ্টি হয়। সাহাবাগণ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র আবাসস্থল পাহারা দেন। সে যমানায়ই একদিন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাকে লোকদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।' তখন তিনি খিমা থেকে মাথা বের করে প্রহরারত সৈনিকদেরকে বললেন ঃ "তোমরা চলে যাও, আমাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও! আমার আল্লাহ্ নিজেই আমার রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন।"

তিনি নাজদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একটি গাছের তলায় বিশ্রাম করছিলেন। আর সাহাবাগণ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন খোলা তরবারি নিয়ে হাজির হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জেগে ওঠেন। পরিস্থিতির ভয়াবহতার কথা একবার চিন্তা করুন! বেদুইন জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে মুহাম্মদ! এবার তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে?' গভীর প্রশান্তি এবং নিরুদ্বেগ আওয়াজ ধ্বনিত হয় ঃ 'আল্লাহ্'! এ শক্তিপূর্ণ জবাবে শত্রু প্রভাবিত হয়। তার তরবারি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

বদরের যুদ্ধ চলছে। প্রায় তিন'শ নিরস্ত্র মুসলমান এক হাজার লৌহবর্ম পরিহিত সশস্ত্র কুরাইশ সেনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। কিন্তু সে তিন'শ সৈনিকের সিপাহসালার কোথায়? তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পৃথক একস্থানে আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলে দোয়ায় নিমগ্ন। কখনো কপাল মাটিতে ছোঁয়াচ্ছেন, আবার কখনো আসমানের দিকে হাত তুলে বলছেন ঃ 'হে আমার আল্লাহ্! যদি আজ এ ছোট্ট দলটি জগত থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এ জগতে তোমার ইবাদতকারীদের আর কোন নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।'

এমন সময়ও উপস্থিত হয়েছিল যখন মুসলমানরা নিজেদের স্থান ছেড়ে দিয়ে পেছনে সরে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্যের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল এবং পরিপূর্ণ নির্ভরকারী নবি পাহাড়ের ন্যায় স্বস্থানে অটল এবং অবিচল রয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলমান পেছনে সরে এল কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে অটল রয়েছেন, পাথরের আঘাত সহ্য করেছেন, তীর, তরাবারি ও বর্শার দ্বারা তঁর ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। লৌহ শিরস্ত্রাণের কড়া তাঁর পবিত্র মাথায় বিদ্ধ হয়েছিল, তাঁর দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছিল, মুখমণ্ডল আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিল, কিন্তু তখনো তিনি ইস্পাত কঠিন মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন এবং আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা রেখেছেন এবং নির্ভর করেছেন, কেননা আল্লাহর হিফাজতের ওপর তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। হুনায়েনের ময়দানে একবার যখন দশ হাজার তীর বারিধারার ন্যায় নিক্ষেপ হয়েছিল তখন কিছুক্ষণের জন্য মুসলমানরা সরে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বস্থানে অবিচল থাকেন। এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ হয়েছিল এদিক ওদিকে।

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ۔

'আমি মিথ্যা নবি নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের প্রপুত্র' এর আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছিল। তিনি সওয়ারী থেকে নীচে নেমে বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং নবি' এরপর আবার দোয়া জন্য হাত ওঠালেন।

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! আপনারা কি এমনি অদ্ভুত বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার অধিকারী সিপাহসালারের কথা শুনেছেন যিনি নিতান্তই স্বল্পসংখ্যক সহযোগী এবং নিরস্ত্র হওয়ার পরও এবং সঙ্গীগণের পচাঁদপসরণের পরও নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন করেননি, আত্মরক্ষার জন্য তরবারিও ওঠাননি, বরং পর্থিব অস্ত্রে নিরস্ত্র হয়েও শুধু আসমানি শক্তি দ্বারা শক্তিমান হবার জন্য আবেদন করেছেন?

এ পথে এ ছিল তার কর্মজীবনের বাস্তব দৃষ্টান্ত। আপনারা শত্রুকে ভালবাসার উপদেশ শুনেছেন। কিন্তু তার বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখেননি। আসুন! মদীনার রাসূলের মধ্যে আমি আপনাদেরকে তা দেখাচ্ছি। মক্কার অবস্থার কথা বাদই দিয়েছি। কেননা আমার মতে অধীনতা, অসহায়তা এবং অক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমা, করুণা ও দয়ার সমর্থক। হিজরতের সময় কুরাইশ সর্দাররা ঘোষণা করে যে, যে মুহাম্মদের শিরচ্ছেদ করে আসবে, তাকে একশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে।

সুরাকা ইবনে জা'সাম এ পুরস্কারের লোভে তাঁর পেছনে ঘোড়া ছুটায়। সে কাছে পৌঁছে যায়। হযরত আবু বকর শঙ্কিত হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন। তিনিবার তার ঘোড়ার পা বালির মাঝে বসে যায়। সুরাকা তীর এবং পাঞ্জা বের করে অদৃষ্ট গণনা করে। প্রতিবার জবাব আসে মুহাম্মদের অনুসরণ করবে না। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সুরাকা ভীত হয়ে পড়েছিল। সে ফিরে যাবার সঙ্কল্প করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে সে প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়ে বলে ঃ যখন আপনাকে আল্লাহ কুরাইশদের ওপর বিজয় দান করবেন, তখন অনুগ্রহ করে আমার প্রাণরক্ষা করতে হবে। তিনি এ সম্পর্কিত ওয়াদাপত্র লিখিয়ে তার হাতে সোপর্দ করলেন। মক্কা বিজয়ের পর সে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেদিন তার অপরাধ সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞেস পর্যন্ত করেননি।

আবূ সুফিয়ান কে? যে বদর, ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধী সেনাদলের সর্দার ছিল। যে হাজার হাজার মুসলমানের জীবননাশের কারণ। যে নিজে কয়েকবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে' হত্যা

www.bjilibrary.com

করার চেষ্টাও করেছিল। যে প্রতি পদে-পদে ইসলামের ঘোরতর শত্রু প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পূর্বে যখন হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমানে হাজির হলো, তখন যদিও তাঁর প্রতিটি অপরাধ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের দাবি করছিল, তবুও করুণার মূর্তপ্রতীক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ সুফিয়ানকে বললেন ঃ 'ভয়ের কোন কারণ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশোধ গ্রহণের অনেক ঊর্ধ্বে।'

এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু তাঁকে ক্ষমাই করলেন না বরং এটাও বললেন ঃ

مَنْ دَخَلَ دَارَ اَبِىْ سُفْيَانَ كَانَ اٰمِنًا۔

অর্থাৎ 'যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সেও নিরাপত্তা লাভ করবে।'

হিন্দা আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। ওহুদের যুদ্ধে সে তার সহচরদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল। রণোন্মাদনা সৃষ্টিকারী গান গেয়ে কুরাইশ সেনাদের মনোবল সৃষ্টি করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় চাচা এবং ইসলামের বীরযোদ্ধা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর লাশের সাথে চরম বেয়াদবি করেছিল। তাঁর বুক চিরে ফেলেছিল, তাঁর নাক-কান কেটে হার বানিয়েছিল এবং তাঁর কলিজা দাঁত দিয়ে চিবোতে চাচ্ছিল। যুদ্ধ শেষে এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন সেও ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে হাজির হলো এবং এখানেও বেয়াদবি করতে কসুর করে না। তবু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না- তুমি এমন করছ কেন? এ সর্বজনীন ক্ষমার অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে চিৎকার করে বলে ঃ হে মুহাম্মদ! আজকের আগে আমার কাছে তোমার খিমার চেয়ে অন্য কারো খিমা অধিক ঘৃণ্য ছিল না, কিন্তু আজ তোমার খিমার চেয়ে আর কারোর খিমা আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়।

তায়েফ বিজয়ের পর হযরত হামযা (র)-এর হত্যাকারী 'ওয়াহশী' পলায়ন করে। এরপর সে স্থানটিও মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। তখন

www.bjilibrary.com

সে অন্য কোন আশ্রয় পেল না। লোকেরা বলে ঃ 'হে ওয়াহশী! তুমি এখনও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে চিনতে পারনি। একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আশ্রয় ব্যতীত তোমার জন্য দ্বিতীয় কোন নিরাপদ আশ্রয় নেই। ওয়াহশী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাজির হয়, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে চোখ নামিয়ে নেন। প্রিয় চাচার শাহাদতের দৃশ্য তাঁর চোখে ভেসে ওঠে। দুচোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। হত্যাকারী সামনে হাজির, কিন্তু তিনি শুধু এতটুকু বললেন ঃ 'হে ওয়াহশী! আমার সামনে এস না। তোমাকে দেখলে আমার শহীদ চাচার স্মৃতি মনে পড়ে যায়।'

ইসলাম, মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে বড় শত্রু এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সবচেয়ে কষ্টদানকারী আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। ইকরামা নিজেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু যখন মুসলমানরা মক্কা জয় করেন তখন তাঁর নিজের এবং খান্দানের সকল অপরাধের কথা স্মরণ করে ইয়ামনে পলায়ন করে। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথার্থ রূপে চেনেন। তিনি নিজে ইয়ামনে গিয়ে ইকরামাকে অভয় দান করে এবং তাকে সাথে করে মদীনায় আসে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আসার খবর শুনেন। তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এত দ্রুত ওঠে দাঁড়ালেন যে, তাঁর পবিত্র দেহে চাঁদরও থাকে না। এরপর আনন্দের আতিশয্যে বললেন ঃ

مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ ـ

'হে হিজরতকারী সওয়ার! তোমার আগমন মুবারক হোক।' চিন্তা করুন, কাকে এ মুবারকবাদ দান করা হচ্ছে! কার আগমনে এ আনন্দ! কাকে এভাবে ক্ষমা করা হচ্ছে। যার পিতা তাঁকে মক্কায় সব চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছিল, তাঁর পবিত্র শরীরে ময়লা নিক্ষেপ করেছিল, নামাযরত অবস্থায় তাঁর ওপর হামলা করতে চেয়েছিল, তাঁর গলায় চাঁদর বেঁধে তাঁকে ফাঁসি দিতে চেয়েছিল, দারুন্নদওয়ায়' তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল, বদরের যুদ্ধ শুরু করেছিল এবং সব রকমের সন্ধি এবং চুক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আজ তার দৈহিক স্মৃতি- পুত্রের আগমনে এ আনন্দ মুবারকবাদ!

www.bjilibrary.com

হেবার ইবনুল আসওয়াদ একদিকে রাসূল-দুহিতা হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা-এর হত্যাকারী এবং অন্যদিকে ইসলামের আরো বহু ক্ষতি করেছে। মক্কা বিজয়ের সময় তার রক্ত হালাল ঘোষণা করা হয়। সে ইরানে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরে কি চিন্তা করে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে বলে ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ধৈর্যের কথা স্মরণ করে ফিরে এসেছি। আমার অপরাধের যেসব বিবরণ আপনি শুনেছেন তা যথার্থ। এতটুকু শুনতেই তাঁর রহমতের দুয়ার খুলে যায় এবং বন্ধু এবং শত্রুর পার্থক্য ওঠে যায়।

উমাইর ইবনে ওহাব বদর যুদ্ধের পর এক কুরাইশ সর্দারের ষড়যন্ত্রক্রমে নিজের তরবারিতে বিষ মাখিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে সুযোগ মত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার অপেক্ষায় থাকে। এ সময় হঠাৎ একদিন সে গ্রেফতার হয়ে যায়। তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত করা হয়। তার অপরাধ প্রমাণিত হয় কিন্তু তবুও তিনি তাকে মুক্তিদান করেছেন।

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করার জন্য উমাইর-কে পঠিয়েছিল এবং তার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, এ অভিযানে যদি সে নিহত হয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্র পথে ইয়ামন চলে যাবে। আর উমাইর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-খিদমতে হাজির হয়ে বলে ঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! গোত্র-প্রধান সাফওয়ান ভয়ে পলায়ন করছে, সে নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চায় ' জবাবে বলেন ঃ যাও তাকে বল– তাকে নিরাপত্তা দান করা হলো।' উমাইর আরো বলে ঃ এ নিরাপত্তার কোন প্রতীক দান করুন, যেন সে বিশ্বাস করতে পারে।' তিনি নিজের পাগড়ি প্রতীকস্বরূপ তাকে দান করলেন। উমাইর এ পাগড়ি নিয়ে সাফওয়ানের কাছে পৌঁছে। সাফওয়ান বলে ঃ মুহাম্মদের কাছে যেতে আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি।' যে উমাইর বিষ মেশানো তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হত্যা করতে গিয়েছিল, সে সাফওয়ানকে বলে ঃ 'হে সাফওয়ান! এখনো তুমি মুহাম্মদের ধৈর্য এবং ক্ষমার কথা জান না।' সাফওয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাজির হয়ে বলে ঃ 'আমাকে বলা হয়েছে

www.bjilibrary.com

যে তুমি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছ, এ কথা কি সত্য?' বললেন ঃ হ্যাঁ, সত্য। সাফওয়ান বলে ঃ কিন্তু আমি তোমার দীন কবুল করতে পারব না। আমাকে দু'মাসের সময় দেয়া হোক।' বললেন, দু'মাসের কেন, চার মাসের সময় দেয়া হলো। কিন্তু এ সময় শেষ হবার আগেই হঠাৎ তার মনের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

ইহুদি মহিলা কর্তৃক খাবারে বিষ প্রয়োগ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বরে যান। এটি ছিল ইহুদি শক্তির প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধ হলো। তিনি শহর জয় করেন। এক ইহুদি তাঁকে দাওয়াত করে। তিনি ইতস্তত না করেই দাওয়াত কবুল করেন। ইহুদি মহিলা খাবারে বিষ মিশিয়ে দেয়। তিনি খাবারে মুখ দিয়েই বুঝতে পারেন। ইহুদি মহিলাকে ডাকা হলো। সে অপরাধ স্বীকার করে। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের দরবার থেকে তাকে কোন শাস্তি দান করা হলো না। অথচ তিনি এ বিষের প্রভাব সারাজীবন অনুভব করেছিলেন।

নজদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি একাকী একটি গছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁর তরবারি গাছের ডালে ঝুলছিল। কাছে কেউ ছিল না। এক বেদুঈন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সাহাবাগণ এদিক-ওদিক গাছের ছায়ায় শায়িত ছিল। সে সোজা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসে। গাছ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে কোষমুক্ত করে বলে ঃ 'হে মুহাম্মদ! এবার কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?' হযরতের অবিচলিত কণ্ঠের আওয়াজ এল– 'আল্লাহ্ আমায় রক্ষা করবেন।' এ অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে বেদুঈন হতচকিত এবং ভীত হয়ে যায়। সে তরবারি কোষবদ্ধ করে। সাহাবাগণ পৌঁছে যান। বেদুঈন বসে যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বললেন না। একবার একজন কাফেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পৌঁছে তাঁকে দেখে ভীত হয়। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ 'তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইলেও হত্যা করতে সক্ষম হবে না।'

www.bjilibrary.com

মক্কা যুদ্ধে ৮০ জনের একটি দল গ্রেফতার হয়। তারা তানঈম পাহাড় থেকে নেমে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন ঃ 'ওদেরকে ছেড়ে দাও।'

প্রিয় বন্ধগণ! তায়েফের নাম শুনেছেন? যে তায়েফ মক্কা জীবনের কঠোর নির্যাতনকালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আশ্রয় দান করেনি। এমন কি তাঁর কথাও শুনতে চায়নি। সেখানকার সর্দার আবদ ইয়ালীলের খান্দান তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল। বাজারের লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্রূপ করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছিল। শহরের গুণ্ডাদল চারদিক থেকে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর সর্দার প্রধানেরা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন দু'দিক থেকে তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল। এমন কি তাঁর পবিত্র পা দুটি আহত হয়ে গিয়েছিল এবং জুতা রক্তে ভরে গিয়েছিল। তিনি ক্লান্ত হয়ে যখন বসে পড়েছিলেন, তখন সে দুষ্টের দল তাঁর হাত ধরে তুলে দেয়। তিনি পুনরায় চলতে শুরু করলে ওরা পাথর নিক্ষেপ করে। সেদিন তাঁর এত কষ্ট হয়েছিল যে, নয় বছর পর একদিন হযরত আয়েশা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! সারাজীবনে আপনার ওপর সব চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর দিন এসেছিল কোন সময়?' জবাবে তিনি এ তায়েফের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

৮ম হিজরিতে মুসলিম সেনাদল তায়েফ অবরোধ করেন। অবরোধ বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। দুর্গ বিজিত হয় না। বহু মুসলমান শহীদ হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে যাবার সঙ্কল্প করলেন। উৎসাহী মুসলমানরা মানতে রাজি হলো না, তারা তায়েফের জন্য বদ দোয়া করার আবেদন জানান। তিনি হাত ওঠালেন। কিন্তু কি বললেন? 'হে আমার আল্লাহ! তায়েফকে হিদায়াত দান কর। একে ইসলামের কাছে নত কর।' বন্ধুগণ! কোন শহরের জন্য তিনি এ দোয়া করছেন? যে শহর তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে, তাঁকে আহত করেছিল এবং আশ্রয় দানে অস্বীকার করেছিল।

ওহুদ-যুদ্ধে শত্রুরা আক্রমণ করে। মুসলমানরা পিছু হটে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেন। তাঁর ওপর তীর, তরবারি ও

www.bjilibrary.com

পাথর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে যায়। শিরস্ত্রাণের লৌহ শলাকা-মাথায় বিদ্ধ হয়। মুখমণ্ডল রক্তাপ্লুত হয়। এ অবস্থায়ও তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় ঃ 'সে জাতি কেমন করে মুক্তি লাভ করবে যে তার নবিকে হত্যা করতে উদ্যোগী! হে আমার আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দান কর। কেননা তারা কিছুই জানে না।' 'তোমার শত্রুকে ভালবাস' –যয়তুন পাহাড়ে প্রদত্ত উপদেশের এ হচ্ছে কার্যকর রূপ। এ শুধু কবিত্ব নয় বরং কাজের বিপজ্জনক রূপ মাত্র।

যে আবদে ইয়ালীলের খান্দান তায়েফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যুলুম করেছিল, তার পুত্র যখন তায়েফের প্রতিনিধিদল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে পবিত্র মসজিদে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রত্যেক দিন ইশার নামাযের পর তার সাথে দেখা করতে যেতেন এবং মক্কার দুঃখের কাহিনি তাকে শুনাতেন! কাকে? যে তাঁকে পাথর দ্বারা আহত করেছিল, যে তাঁকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত করেছিল। এ হচ্ছে নিজের শত্রুকে ক্ষমা করা এবং ভালবাসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যখন মক্কা বিজিত হয়, তখন হারেম শরীফের বারান্দায় যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেয়া হয়েছিল, যেখানে তাঁর ওপর নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছিল বিজত কুরাইশ সর্দাররা। তাদের মাঝে এমন লোকও ছিল, যে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমন কি যে তাঁকে মিথ্যা বলে দাবি করেছে, তাঁর নিন্দাবাদ করেছে, তাঁকে গালি দিয়েছে, যে তাঁর সাথে বেয়াদবি করার দুঃসাহস পোষণ করেছে, তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করেছে, তাঁর পথে কাঁটা বিছাত, যে তাঁর ওপর তরবারি ওঠিয়েছিল, তাঁর আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বুক বিদীর্ণ করেছিল এবং তাদের হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীভুঁড়ি কেটে টুকরা টুকরা করেছিল, যে দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের বুকের ওপর নিজেদের অত্যাচারের আগুনের- মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে আগুনের মত উত্তপ্ত বালুর

www.bjilibrary.com

ওপর শায়িত করেছে, জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তাদের অঙ্গে দাগ দিয়েছে এবং বর্শাঘাতে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করেছ। এ সব অপরাধীর দল সেদিন পরাজিত এবং পর্যুদস্ত অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়েছিল। পেছনে দশ হাজার রক্তপিপাসু তরবারি শুধুমাত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল। অকস্মৎ তিনি মুখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে কুরাইশগণ! বল, আজ তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত।' জবাব এল 'মুহাম্মদ! তুমি আমাদের শরীফ ভাই ও শরীফ ভাতিজা।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজ আমি তোমাদেরকে তাই বলছি যা হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর যালিম ভাইদেরকে বলেছিলেন।

অর্থাৎ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ 'আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।' اِذْهَبُوْا اَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।'

এ হচ্ছে শত্রুদেরকে ভালবাসর এবং মাফ করার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ হচ্ছে নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাস্তব আদর্শ এবং বাস্তব শিক্ষা। আর তা শুধু মুখরোচক বক্তৃতা এবং সুমিষ্ট ভাষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং সত্যিকার ঘটনা এবং কাজের দৃষ্টান্তে প্রকাশ।

এ কারণেই অন্যান্য ধর্মগুলো তাদের নবির এবং ধর্ম প্রবর্তকগণের সুমিষ্ট বাণীসমূহের দিকে জগতকে আহবান করে বার বার সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করে। কেননা এগুলো ব্যতীত অন্য বস্তু তাদের কাছে নেই। অন্যদিকে ইসলাম তার নবির শুধু কথা নয় বরং কাজের দিকে মানুষকে দাওয়াত প্রদান করে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগত থেকে বিদায় নেয়ার সময় বলেছিলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمُ الثَّقِيْلَيْنِ كِتَابُ اللهِ وَسُنَّتِيْ۔

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি ঃ 'আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার সুন্নাত।' এ ভারী বস্তু দু'টি এখনো কায়েম আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।'

www.bjilibrary.com

এ জন্যই ইসলাম আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে সাথে নিজের নবির সুন্নাতের অনুসৃতির দাওয়াত প্রদান করে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন অনুসরণযোগ্য এক সুমহান আদর্শ।'

ইসলাম নিজে তার নবিকে আল্লাহর কিতাবের বাস্তব চিত্র, আদর্শ হিসেবে উত্থাপন করে। সারাজগতে একমাত্র ইসলামের নবিই এ মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি নিজের শিক্ষা এবং নীতির সাথে সাথে নিজের কাজ এবং দৃষ্টান্তও উত্থাপন করেছেন। নামাযের পদ্ধতি যে জানে না তাকে বলেন ঃ

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ۔

'আল্লাহ্‌র জন্য ঠিক সেভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ।' স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের কল্যাণ কামনার শিক্ষা এভাবে প্রদান করেন ঃ

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِيْ۔

'তোমাদের মাঝে সে সর্বোত্তম যে তার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম। আর আমার স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য আমি তোমাদের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ হজ্ব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবির চারদিকে এক লাখ পতঙ্গের ভীড় জমে ওঠেছে। মানুষকে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ পয়গাম শুনানো হচ্ছে। আরবের বাতিল রসম-রেওয়াজ এবং বংশানুক্রমিক যুদ্ধের সিলসিলা আজ ভেঙে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার সাথে সাথে দেখুন নিজের ব্যক্তিগত নজির এবং বাস্তব দৃষ্টান্তও প্রতি পদে পদে পেশ হচ্ছে। বললেন ঃ 'আজ সমস্ত প্রতিশোধের রক্ত বাতিল করা হলো। অর্থাৎ তোমরা সবাই পরস্পরের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং প্রথম আমি নিজের খান্দানের রক্ত-আমার ভাতিজা রাবীয়া ইবনে হারেসের রক্ত মাফ করে দিয়েছি!'

www.bjilibrary.com

'জাহিলি যুগের সকল প্রকার সুদের লেন-দেন এবং কারবার আজ বাতিল করা হলো এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদের কারবার ভেঙে দিয়েছি।'

ধন এবং প্রাণের পর তৃতীয় মূল্যবান বস্তু হচ্ছে ইজ্জত-আবরু। মানুষের ইজ্জত-আবরুর সাথে যেসব ভ্রান্ত এবং সংস্কারযোগ্য রসম-রেওয়াজের সম্পর্ক সেগুলোকে সর্বপ্রথম কার্যত বিলুপ্ত করার হিম্মত যেন বাহ্যত নিজের অমর্যাদা এবং বে-আবরুর নামান্তর প্রতীয়মান হয়। তাই জগতে বড় বড় সংস্কারকও দেশের কোন রসম-রেওয়াজ কার্যত সংশোধনের সাহস খুব কমই করে থাকেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে সাম্যের শিক্ষা দান করেছেন। আরবে গোলামদেরকে সবচেয়ে হীন মনে করা হত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মানবিক সম-অধিকারের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি একজন গোলামকে নিজের পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আরবে গোত্রগত মর্যাদার তারতম্য এতই প্রবল ছিল যে, যুদ্ধের সময় কোনও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোক নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রের লোকের বিরুদ্ধে তরবারি ওঠানো অপমানজনক মনে করে। কেননা তারা মনে করে যে, ছোট লোকদের রক্ত তাদের তরবারি নাপাক করে দেবে। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন ঃ 'হে লোকেরা! তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে মাটি থেকে তৈরি করা হয়েছে। কালোর ওপর সাদার এবং অনারব ব্যক্তির ওপর আরবিদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে তার আল্লাহ্‌কে সকলের চেয়ে বেশি ভয় করে।' তাঁর এ শিক্ষা উচ্চ-নীচ, উন্নত-অবনত, ছোট-বড় এবং প্রভু-ভৃত্যের মধ্যকার পার্থক্য দিয়ে সবাইকে এক পর্যায়ে এনে হাজির করায়। কিন্তু এ জন্য বাস্তব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন ছিল। এ দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই পেশ করেছেন। কুরাইশদের শরীফ খান্দানের অন্তর্গত তাঁর নিজের ফুফাতো বোনকে নিজের গোলামের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। পালক পুত্রকে গর্ভজাত সন্তান মনে করার কুসংস্কার নীতি যখন ইসলাম ওঠিয়ে দেয়, তখনই 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদকে' যায়েদ ইবনে হারেস বলা হয়।

www.bjilibrary.com

পালক পুত্র যে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাকে বিয়ে করা আরবে অবৈধ ছিল। কিন্তু এটি যেহেতু নিছক মৌখিক আত্মীয়তা ছিল, প্রকৃতপক্ষে পরস্পরের মাঝে কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না এবং এ প্রথাটির কারণে আরবদের মাঝে নানান খান্দানি হিংসা-বিদ্বেষ ও ত্রুটির ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল, তাই এ পেশ করার বিষয়টি মানুষের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু আবরূর সাথে সম্পর্কিত ছিল। কাজেই এটি ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে নিজেই এর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যায়েদ ইবনে হারেস যখন নিজের স্ত্রী হযরত জয়নবকে বনিবনা না হওয়াতে তালাক দেন, তখন হযরত আল্লাহর আদেশে জয়নবকে বিয়ে করেন। তখন থেকেই আরবের এ অবাঞ্ছিত প্রথাটি নির্মূল হয়ে যায় এবং পালিত পুত্র সম্পর্কিত ভ্রান্ত প্রথা থেকে দেশ মুক্তি লাভ করে।

এরূপ ঘটনার অভাব নেই। অগণিত দৃষ্টান্ত এর রয়েছে কিন্তু আলোচনা সুদীর্ঘ হবার আশঙ্কায় এ থেকে বিরত হলাম।

বন্ধুগণ! আমার আলোচনার আলোকে আদম (আ.) থেকে শুরু করে ঈসা (আ.) পর্যন্ত এবং সিরিয়া থেকে শুরু করে হিন্দুস্থান (পাক-ভারত-বাংলাদেশ) পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির সংস্কারধর্মী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এমন কার্যকর হিদায়াত এবং পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও দেখতে পাবেন?

বন্ধুগণ! আরো কয়েকটি কথা জেনে রাখুন। অনেক মিষ্টভাষী বক্তা কবিতার ভঙ্গিতে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা এবং গভীর প্রেমের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু 'গাছের পরিচয় ফলে' তাদের উক্তি মুতাবিক তাদের জীবনে ভালবাসা এবং প্রেমের কি প্রভাব পড়েছিল? আরবের প্রেমিকের জীবনি পাঠ করুন। গভীর রাত, সারা জাহান ঘুমন্ত কিন্তু প্রেমিকের চোখ রয়েছে জেগে। হাত আকাশের দিকে, কণ্ঠে আল্লাহর প্রশংসা করা হচ্ছে, বুকের ভেতর হৃদয় অস্থির এবং উদ্বেগ-চঞ্চল এ চোখ থেকে ধারায় ঝরে পড়ছে অশ্রু। সত্যিকার প্রেমের চিত্র কি এটি না ওটি?

www.bjilibrary.com

খ্রিষ্টানদের মতে যীশুকে শূলের ওপর চড়ানো হয়। তখন তিনি অস্থিরভাবে বলেছেন ঃ

اِيْلِيْ اِيْلِيْ لِمَا سَبَقْتَنِيْ

'হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করেছে?' কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقُ الْاَعْلٰى۔

'হে আমার আল্লাহ! হে আমার সর্বোত্তম সাথী?' এ দু'টি কথার কোনটির মাঝে ভালবাসার স্বাদ, প্রেমের নিদর্শন এবং আল্লাহ্ নির্ভর প্রশান্তির গভীরতা লক্ষ্য করা যায়?

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ۔

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ইসলামের নবির বাণী

প্রিয় বন্ধুগণ! আমি ইতোপূর্বে বক্তৃতায় যুক্তি-প্রমাণ এবং ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয়ে একথা প্রমাণ করেছি যে, সকল উন্নত শ্রেণির মানুষের মাঝে একমাত্র নবিগণের জীবন চরিতই অনুসরণযোগ্য এবং তাঁদের মাঝেও বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী আদর্শ হচ্ছে একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতে। একথা যখন এ পর্যায়ে প্রমাণ হয়েছে যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র বিশ্বজনীন এবং চিরস্থায়ী আদর্শ, তখনই প্রশ্ন আসে তাঁর বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী শিক্ষা কী? তিনি জগতের জন্য কী পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন এবং কী পয়গাম শুনিয়ে জগত থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন? তাঁর নির্দেশনার কোন জরুরি অংশকে বাস্তবায়ন করার জন্য শেষ নবির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল? অন্যান্য নবিগণও জগতে পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। তাহলে কীভাবে এ শেষ নবির পয়গাম তাকে যথার্থ রূপ ও পূর্ণতা প্রদান করেছিল?

আমরা মাঝে মাঝে স্বীকৃতি দান করি, নবিগণের মাধ্যমে জগতে আল্লাহর বাণী এসেছে। কিন্তু যেমন ইতোপূর্বে বারবার বলা হয়েছে আর বিভিন্ন ঘটনায় প্রমাণ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী সকল নবির বাণী কোন বিশেষ যামানা এবং জাতির পর্যায়ে প্রযোজ্য ছিল এবং সেগুলো ছিল সমসাময়িক, সেজন্য তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়নি। তাদের আসল কথা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘকাল পর সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হলেও তাতে বহু বিকৃতিও সমন্বয় হয়েছে। ওসব আবার অনুবাদে তাদের চেহারাই পরিবর্তিত করে দিয়েছে। তাতে তাদের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকেরই মনগড়া বাণী তাদের এসব ক্ষেত্রে যুক্ত করে দিয়েছে। আর সেসব হয়েছে মাত্র কয়েকশ বছরের ব্যবধানে। যদি আল্লাহর কাজ বিচার-বিবেচনা শূন্য না হয়ে থাকে, তাহলে সেসব নিশ্চিহ্ন ও বিকৃত হয়ে যাওয়াই তাদের সাময়িক জগতে শিক্ষার প্রমাণ। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা যে বাণী এসেছে, তা বিশ্বজনীন

www.bjilibrary.com

এবং চিরন্তন বাণী হিসেবেই এসেছে। তাই এগুলো আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপেই সংরক্ষিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে ইন্‌শাআল্লাহ। কেননা এরপর আর কোন নবির এ ধরায় আগমন হবে না। আর আল্লাহ্ অতীতের কোন বাণী সম্পর্কে এ কথা বলেননি যে, তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর সেগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। জগতে যে সকল 'সহীফা' বিলুপ্ত হয়েছে, তাদের বিলুপ্তিই তাদের সাময়িক বাণী হবার প্রমাণ। আর যেসব সহীফা বর্তমান রয়েছে, তাদের প্রত্যেক আয়াত এবং বাক্য অনুসন্ধান করা হলে সেখানে তাদের পরিপূর্ণতা বা তাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে এমন একটি কথাও পাওয়া যাবে না। বরং তাদের বিপরীতপক্ষে অসম্পূর্ণতারই ইঙ্গিতই লক্ষ করা যায়। হযরত মূসা বলেন ঃ আমার আল্লাহ, তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের এবং তোমাদের ভাইদের মাঝ থেকে তিনি আমার মত একজন নবি পাঠাবেন! তোমরা তাঁর কথা শুনবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ঃ ১৫, ১৮)

'আমি তাদের জন্য ভাইদের মাঝ থেকে তোমাদের ন্যায় একজন নবি পাঠাব এবং নিজের বাণী তাঁর মুখে দান করব। আমি তাঁকে যা কিছু বলব তা সমস্তই তিনি সে তাঁদেরকে শুনাবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ : ১৮, ১৯)

ইসরাঈলদেরকে 'মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বে বনি এ বরকত প্রদান করে যান এবং তিনি বলেন, আল্লাহ সিনাই থেকে এসেছেন, সাঈর থেকে তাঁর ওপর উদিত হয়েছেন আর ফারানের পাহাড় থেকে তিনি উদিত হবেন এবং তাঁর ডান হাতে থাকবে একটি আগুনসম্পন্ন শরিয়ত।'

ওপরের আয়াতগুলোর দ্বারা তাওরাত সুস্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করেছে যে, 'মূসার মত আর একজন নবির আগমন হবে। তাঁর সাথে থাকবে একটি আগুনসম্পন্ন শরিয়ত এবং তাঁর মুখে আল্লাহ্ বাণী দান করবেন।' তা থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত মূসার বাণী চিরন্তন ও সর্বশেষ ছিল না।

এরপর 'আশিয়া'য় আর একজন 'রাসূলের সুসংবাদ দান করেন ঃ 'যার শরিয়ত মধ্যবর্তী দেশসমূহ এবং দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।' (৪ অধ্যায়) 'মালাখীয়ায়' বলা হয়েছে ঃ 'দেখ, আমি আমার রাসূল পাঠাব।' বনি

www.bjilibrary.com

ইসরাঈলদের অন্যান্য সহীফাসমূহে এবং যাবুরেও ভবিষ্যতে আগমনকারী নবির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বনি ইসরাঈলদের কোন একটি সহীফাও চিরন্তন ও সর্বশেষ ছিল না।

প্রচলিত ইঞ্জিলে লক্ষ করুন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

'এবং আমি আমার পিতার নিকট আবেদন জানাব যেন তিনি তোমাদেরকে দ্বিতীয় 'ফারকালীত' দান করেন, যিনি হামেশা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।' (ইউহেনা ঃ ১৪-২৬)

'কিন্তু সে 'ফারকালীত' হচ্ছেন পবিত্র আত্মা। তাঁকে পিতা আমার নামে প্রেরণ করবেন। তিনিই তোমাদেরকে সব বিষয় শেখাবেন এবং আমি তোমাদের যেসব কথা বলেছি, তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেবেন।' (ইউহেনা : ১৪-২৬)

'আমার আরো অনেক কথা আছে, যেগুলো আমি তোমাদেরকে শুনাতে চাই। তবে এখন তোমরা সেগুলো তোমরা বরদাশত করতে পারবে না। কিন্তু যখন তিনি 'মসীহ'র পয়গামকে পূর্ণতা দান করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম ভবিষ্যতের এমন কোন আগমনকারীর সংবাদ প্রদান করেন না, যিনি কোন নতুন পয়গাম শুনাবেন বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গামে কোন ত্রুটি ও অপূর্ণতা রয়েছে, তা দূর করে তিনি তাকে পরিপূর্ণতা দান করবেন। বরং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম নিজেই নিজের পরিপূর্ণতার দাবি করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ.

'আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণতা প্রদান করেছি এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূম্পূর্ণ করেছি।' (সূরা আল মায়িদা-৩) আর এ সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ শেষ নবি অর্থাৎ তাঁর পর নবুয়তের ধারাবাহিকতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কুরআন বলছে وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ (তিনি নবিগণের শেষ) এবং হাদিসে বলা হয়েছে وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّوْنَ আর আমার দ্বারা নবিগণের আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।– (মুসলিম বাবুল, মাসাজিদ) اَلَا لَا نَبِيَّ

www.bjilibrary.com

بَعْدِىْ (সাবধান আমার পর আর কোন নবি নেই)। বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ রয়েছে ঃ 'আমি নবুয়ত প্রাসাদের সর্বশেষ স্তম্ভ। কুরআন তার আয়াতসমূহে পরবর্তী আগমনকারী কোন নবির জন্য কোন স্থান শূন্য রাখেনি। এথেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে জগতে যে পয়গাম এসেছে, সেটিই আল্লাহর শেষ ও চিরন্তন। আর এ জন্যই وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (আর আমিই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি) ওয়াদার এ আয়াতে আল্লাহ, নিজেই তার সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! এরপর প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম ব্যতীত অন্য কোন পয়গাম বিশ্বজনীন আদর্শ রূপ নিয়ে আগমন করেছে কি না? বনি ইসরাঈলদের দৃষ্টিতে জগতে শুধু বনি ইসরাঈলদেরই বাসস্থান। আল্লাহ শুধু বনি ইসরাঈলদেরই আল্লাহ। তাই বনী ইসরাঈলদের নবিগণও তাদের ওপর অবতীর্ণ গ্রন্থগুলোর আল্লাহর পয়গাম কখনো অ-বনি ইসরাঈল পর্যন্ত পৌঁছাননি। বর্তমানে ইহুদি ধর্ম এবং মূসার শরিয়ত অবনি ইসরাঈলদের মাঝেই সীমাবদ্ধ। তাদের সমস্ত 'সহীফা'য় শুধুই তাদের ক্ষেত্রেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদের খান্দানি আল্লাহর দিকেই তাদের আকৃষ্ট করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর পয়গাম শুধু সীমাবদ্ধ রেখেছেন 'বনি ইসরাঈলদের হারিয়ে যাওয়া মেষপালের মাঝেই এবং অ-ইসরাঈলদেরকে নিজের পয়গাম শুনিয়ে ছেলেদের রুটি কুকুরের মুখে তুলে দেয়া অপছন্দ করেন।' ভারতে অনার্যদের কান পর্যন্ত বেদও পৌঁছতে পারে না, কেননা আর্য ব্যতীত দুনিয়ার অন্য সবই হচ্ছে শূদ্র এবং সেখানে এ কথার ওপর জোর দেয়া হয়েছে যে, যদি 'বেদের বাণী শূদ্রের কানে পৌঁছে, এদিক দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম জগতে আল্লাহর সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পয়গাম, যা সাদা-কাল, আরবি-আজমি, তুর্কী-তাতারী, ভারতীয়-চৈনিক, ফিরিংগি-অফিরিংগি সবার

www.bjilibrary.com

জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। তাঁর আল্লাহ যেমন সারাজগতের আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ 'সারাজগতের প্রতিপালক' তেমনি তাঁর রাসূলও সারাজগতের রাসূল رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ 'সারা জগতের জন্য করুণাস্বরূপ' অনুরূপ তাঁর পয়গামও সারাজগতের জন্য।

যেমন বলা হয়েছে ঃ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ۔

'তা বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ স্বরূপ।' (সূরা আল-আন-আম : ৯০)

تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا ۔ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ۔

'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের ওপর ফয়সালাকারী কিতাব আল-কুরআন নাযিল করেছেন, যেন তা সারা বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারে। পৃথিবী ও আকাশের সকল কর্তৃত্ব সে আল্লাহরই।' (সূরা আল ফুরকান : ১-২)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারাজগতের জন্য সতর্ককারী হিসেবে আগমন করেছেন। আল্লাহর কর্তৃত্ব যতদূর পরিব্যাপ্ত তাঁর নবুয়তও ততদূর পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ۔

'(মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবার জন্য সে মহান আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, যাঁর কর্তৃত্ব আকাশ ও পৃথিবীর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত।'

এখানেও লক্ষ করুন, সারাজগতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের বিস্তৃত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটাই যে, যতদূর পর্যন্ত এ সমস্ত পয়গামের আওয়াজ পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত এলাকা এর আওতাভুক্ত রয়েছে।

www.bjilibrary.com

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ۔

'আর এ কুরআন আমার প্রতি ওহি রূপে নাযিল করা হয়েছে,যাতে করে এর সাহায্যে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে পর্যন্ত এটি পৌঁছে তাদেরকে সতর্ক করা যেতে পারে।' (সূরা আল-আনআম)

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا۔

'আর আমি আপনাকে সকল মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছি সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে।' (সূরা আস্ সাবা)

এসব উদ্ধৃতিসমূহ থেকে এ কথাই প্রমাণ হয় যে, সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই তার চিরন্তন, পরিপূর্ণ, অপরিবর্তনীয় ও বিশ্বজনীন হবার দাবিদার। মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার পূর্বে প্রত্যেক নবিকে শুধু তাঁর নিজের জাতির জন্যই পাঠানো হয়েছিল। আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল জাতির জন্য।' এটি আমাদের দাবির স্বপক্ষে আর একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং ইতিহাসের বাস্তব সাক্ষীও আমাদের সমর্থক। মোটকথা, আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাই যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিত ও তাঁর জীবনের বাস্তব চিত্র যেমন পরিপূর্ণ চিরন্তন ও বিশ্বজনীন অনুরূপভাবে তাঁর পয়গামও পরিপূর্ণ ও বিশ্বজনীন চিরন্তন এটাই বাস্তবতা।

এখন প্রশ্ন, এ পরিপূর্ণ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন ব্যক্তির শেষ, চিরন্তন ও বিশ্বজনীন পয়গাম কী, যা সকল ধর্মকে চূড়ান্ত রূপ এবং আল্লাহর দীনকে চিরকালের জন্য পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে এবং মহান আল্লাহ তাঁর দানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। ধর্ম মাত্রই দু'অংশে বিভক্ত। একটিকে ঈমান ও দ্বিতীয়টিকে আমল বা কর্ম বলা হয়। কর্মেরও আবার তিনটি দিক রয়েছে। এর মাঝে একটি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, একে বলা হয় ইবাদত; দ্বিতীয়টির সম্পর্ক হলো মানুষের সাথে মানুষের করণীয় কাজের, একে বলা হয় মুআমালাত বা ব্যবহারিক জীবন। এর বৃহত্তম অংশ হচ্ছে আইন-কানূন। তৃতীয়টি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধে ক্ষেত্রে নির্ভরশীল।

www.bjilibrary.com

একে আখলাক বা নৈতিক চরিত্রও বলা হয়। অতএব, ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন ও নৈতিক চরিত্র-এ চারটি বিষয় নিয়েই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। আর চারটি বিষয়ই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে।

তাওরাত এবং ইঞ্জিলে ঈমান ও আকিদার অধ্যায়গুলো একেবারেই অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ। সেখানে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদের আলোচনা আছে। কিন্তু এর পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। আল্লাহর যে গুণাবলি মানবত্মার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে এবং যেসব বিষয় অবলম্বনে আল্লাহর মারিফাত ও প্রেমের উদ্ভব হয়, তা তাওরাতে বা ইঞ্জিলে অনুপস্থিত।

তাওহীদের পর হচ্ছে রিসালত। রিসালত ও নবুয়তের তাৎপর্য হচ্ছে ওহি, ইলহাম এবং আল্লাহ্ ও নবির কথোপকথনের ব্যাখ্যা, নবিগণ মানবিক মর্যাদা, প্রত্যেক জাতির মাঝে নবির আবির্ভাব সম্পর্কে বার্তা, নবিগণের দায়িত্ব, নবিগণকে কোন পর্যায়ে স্বীকার করা উচিত, নবিগণের নিষ্পাপ আর এসব বিষয়ের আলোচনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের পূর্বের কোন পয়গামে ছিল না। পুরস্কার ও শাস্তি, জান্নাত ও জাহান্নাম, হাশর-নশর, কিয়ামত, জীবন ও আখিরাত সম্পর্কে আলোচনা তাওরাতে একেবারেই অস্পষ্ট। ইঞ্জিলে এক ইহুদির প্রশ্নের জবাবে সেসব বিষয় সম্পর্কে দু-একটি বাক্য পাওয়া যায় কিন্তু তা এ পর্যন্তই শেষ! আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে পাওয়া যায় প্রত্যেকটি পর্যায় পরিষ্কার ও বিস্তৃত।

তাওরাতেও ফেরেশতাগণের আলোচনা প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু তা একেবারেই অস্পষ্ট। কখনো কখনো এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতার পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দু-একজন ফেরেশতার নাম ইঞ্জিলে পাওয়া যায়। সেখানে 'রূহুল কুদুসের তাৎপর্য এতই সংশয়পূর্ণ যে, তাঁকে না ফেরেশতা বলা যেতে পারে, না আল্লাহ অথবা এভাবেও বলা যায় যে, তাঁকে ফেরেশতা বলা যেতে পারে, আবার আল্লাহও বলা যেতে পারে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে ফেরেশতাগণের

www.bjilibrary.com

তাৎপর্য ও মৌলিকতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। সেখানে তাঁদের মর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের কর্তব্যও। আল্লাহর সাথে, নবি-রাসূলগণের সাথে ও বিশ্বজাহানের সাথে তাদের সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম আকিদা ঈমানের ক্ষেত্রে সব বিষয়েই পূর্ণতাদানকারী। এখন আমল বা কর্মের পর্যায়ে আসা যাক। কর্মের প্রথম অংশ হচ্ছে ইবাদত। তাওরাতে কুরবানির দীর্ঘ আলোচনা এবং এর শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে, রোযার উল্লেখও রয়েছে, দোয়া করা হয়েছে, 'বায়তুইল' বা 'বায়তুল্লাহ'র নামও পাওয়া যায়, কিন্তু এসব বিষয় এতই অস্পষ্ট যে, এসবের প্রতি মানুষের কোন দৃষ্টিই আকৃষ্ট হয় না, বরং এগুলো গুরুত্বহীনই বিবেচিত হয়। তাছাড়া এখানে না ইবাদতের বিভাগ আছে, আর না তাদের পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইবাদতের কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি এবং নিয়মিত আল্লাহর স্মরণ ও দোয়ারও শিক্ষা প্রদান করা হয়নি। বান্দাকেও কোন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়নি। যাবুরে আল্লাহর কাছে বহু সংখ্যক দোয়া ও মুনাজাতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু অতি অল্প ইবাদতের পদ্ধতি, আনুষ্ঠানিকতা, সময় ও অন্যান্য শর্তসমূহের উল্লেখই মাত্র। বরং নেই বললেই চলে। এক স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-র চল্লিশ দিন উপবাসের কথা উল্লেখ রয়েছে। একে রোযাও বলা যেতে পারে। ইঞ্জিলে ইহুদিদের এ আপত্তিরও উল্লেখ রয়েছে যে, তোমাদের শাগরিদরা রোযা কেন রাখে না? শূলদণ্ডের রাতে একটি দোয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে একটি দোয়াও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে নেই অন্যান্য ইবাদতের নাম-নিশানাও। অন্যদিকে ইসলামের পয়গামের প্রত্যেকটি অংশ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের নিয়ম-পদ্ধতি ও শর্তাবলির ইবাদতের পদ্ধতি, আল্লাহর যিকর ও তাঁকে স্মরণ করার জন্য দোয়াসমূহ, নামাযের সময়, রোযার সময়, হজ্বের সময় এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিধান, আল্লাহর কাছে বান্দার নম্রতা প্রকাশ ও কান্নাকাটির দোয়া, মুনাজাত, আল্লাহর কাছে গোনাহর স্বীকারোক্তি, তওবা ও ও লজ্জা

www.bjilibrary.com

প্রকাশ এবং বান্দা ও আল্লাহর পারস্পরিক ভালবাসা ও গোপন সম্পর্কের এমন সব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে, যা রূহের খোরাক হিসেবে বিবেচিত হয়, আর এতে তার গ্রন্থিসমূহ খুলে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর এত কাছাকাছি পৌঁছিয়ে দেয় যে, ধর্মের সূক্ষ্ম প্রাণ পূর্ণাবয়ব দেহে রূপলাভ করে। আর এসবই হচ্ছে পয়গামে মুহাম্মদীর অনস্বীকার্য একমাত্র প্রমাণীকতা।

কর্মের দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন বা দেশ ও সমাজের আইন। এ অংশটি হযরত মূসা (আ)-র পয়গামে যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে এগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহাল রাখা হয়েছে। কিন্তু এ আইনসমূহের কঠোরতা হ্রাস করা হয়েছে। একটি জাতীয় আইনের সঙ্কীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে এগুলোকে বিশ্বজনীন আইনের রূপ প্রদান করা হয়েছে। এদিক দিয়ে যে-সকল পরিশিষ্ট অংশের প্রয়োজন ছিল, সেগলো সংযোজন করা হয়েছে। যাবুর ও ইঞ্জিলে এ শরিয়ত ও আইনের বিন্দুমাত্রও নেই। তালাক প্রভৃতি সম্পর্কে অবশ্যই ইঞ্জিলে দু'একটি বিধান রয়েছে, অন্য কোন বিষয়ে তেমন কিছু পাওয়া যায়না। কিন্তু বিশ্বজনীন ও চিরন্তন ধর্মের প্রয়োজন পরিপূর্ণ করার জন্য দেশ ও সমাজের উপযোগী আইনের প্রয়োজন ছিল। কেননা হযরত ঈসা (আ.)-এর পয়গামে এসব কিছু ছিল না, তাই খ্রিষ্টান জাতির মূর্তিপূজারি, গ্রীক ও রোমীয়দের কাছে থেকে এসব কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম এগুলোর প্রতিটি অংশে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পূর্ণতা প্রদান করেছে এবং এমন সব নীতি ও ব্যাপক নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করেছে, যার দ্বারা যুগে যুগে ওলামা ও মুজাহিদগণ নতুন নতুন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন মাসায়েল সৃষ্টি করেছেন। কমপক্ষে এক হাজার বছর পর্যন্ত ইসলাম জগতে যে একচ্ছত্র শাসন ও শত শত প্রগতিশীল ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেসব পরিচালিত হয়েছিল এ আইনের সাহায্যে এবং আজো জগতে এর চেয়ে উত্তম আইন পেশ করতে পারেনি ও পারাও অসম্ভব।

www.bjilibrary.com

কর্মের তৃতীয় অংশটি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র বিষয়ক। তাওরাতে কিছু নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে বিধানাবলি পাওয়া যায়। এর মাঝে সাতটি হচ্ছে নীতিগত বিধান। এসব বিধানসমূহের একটি মাতা-পিতার আনুগত্য সম্পর্কে ইতিবাচক শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়া বাকি ছটি বিধানই নেতিবাচক। যেমন, তুমি হত্যা কর না, তুমি চুরি কর না, তুমি জেনা করবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীকে কামনা করবে না, তুমি নিজের প্রতিবেশীর অর্থ-সম্পদের লোভ করবে না। এগুলোর মধ্যে ষষ্ঠ বিধানটি চতুর্থটির মাঝে এবং সপ্তমটি তৃতীয়টির মাঝে পাওয়া যায়। কাজেই চারটি বিধানই মূলত অসমাপ্ত।

এ বিধানগুলোর পুনরাবৃত্তি ইঞ্জিলেও করা হয়েছে। সংক্ষেপে অন্যকে ভালবাসারও সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই এটিকে তাওরাতের বিধানের ওপর অতিরিক্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-র পয়গাম এ বিন্দুটিকেও মহাসাগরে পরিণত করেছে। সর্বপ্রথম এখানে বারটি মৌলিক বিধান নির্ধারিত রয়েছে। এ বিধানগুলো মিরাজের সময় আল্লাহর কাছে থেকে প্রদান করা হয়েছিল। এগুলো সূরায়ে ইসরায়ে উল্লেখ রয়েছে। এ বারটি বিধানের এগারটি হচ্ছে মানুষের নৈতিক চরিত্র এবং একটি তাওহীদ সম্পর্কে। আবার এ বারটির পর্যায়ে পাঁচটি নেতিবাচক ও পাঁচটি ইতিবাচক এবং একটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই।

মাতা-পিতার সম্মান এবং আনুগত্য কর, তোমার ওপর যাদের হক রয়েছে তাদের হক আদায় কর, ইয়াতিমের সাথে সদ্ব্যবহার কর, পরিমাপ, ওজন ও দাঁড়িপাল্লা সঠিক রাখ, নিজের ওয়াদা পালন কর, কেননা, এ সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে-এ পাঁচটি হচ্ছে ইতিবাচক। তোমার সন্তানকে হত্যা করো না, কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, জ্বিনার কাছেও যেওনা, অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে ধাবিত হয়ো না, যমীনের ওপর অহঙ্কার করে চলাফেরা করো না– এ পাঁচটি হচ্ছে নেতিবাচক। তাছাড়া অমিতব্যয়ী হয়ো না এবং ভারসম্যপূর্ণ ও মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর-এটি

www.bjilibrary.com

নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় ধরনের আদেশের মধ্যেই গণ্য। কিভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম পূর্ণতাদানকারী পয়গাম হিসেবে জগতে আগমন করেছে, শুধু এ মৌলিক বিধানগুলোর তুলনামূলক আলোচনায় তা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়েছে। 'এ পয়গাম শুধু সে বিধানসমূহকে ব্যক্ত ও পরিপূর্ণ করেনি বরং নৈতিকতার প্রতিটি দিকসমূহ উন্মোচন করেছে, মানুষের প্রতিটি শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র নির্ণয় করেছে, তার প্রতিটি দুর্বলতা প্রকাশ করেছে, আত্মার প্রত্যেকটি রোগ নির্ধারণ করেছে এবং এর চিকিৎসা বলে দেয়া হয়েছে। ('দুনিয়ার অন্যান্য জাতির ইতিহাস আইন-কানুন ছিল আমাদের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস আমাদের সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, উন্নতি, অবনতির কাহিনিই আজ অনান্য জাতির জন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছে।' (সম্পাদক)

এভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের দ্বারাই কর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

যদি ইসলামি শিক্ষার বিরাট ও বিপুল সম্পদকে আমরা মাত্র দুটি শব্দে প্রকাশ করি, তাহলে তাকে বলতে হয়-ঈমান ও সৎ কর্ম। ঈমান ও সৎকর্ম এ দুটি বস্তুই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল প্রকার পয়গামকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং পবিত্র কুরআনে এ দু'টি বস্তুর ওপর মানুষের মুক্তিলাভে নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের ঈমান পবিত্র, সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হতে হবে আর কর্ম হতে হবে উৎকৃষ্ট ও সৎ প্রকৃতি সম্পন্ন।

কুরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ۔

"যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।" এবং প্রত্যেক স্থানে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাফল্য ও কল্যাণ একমাত্র ঈমান ও সৎকাজের ওপরই নির্ভরশীল। আমি এ মৌলিক বিষয় দু'টি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই এখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের শুধু সে অংশটি উল্লেখ করে যাচ্ছি, যা

www.bjilibrary.com

ঈমান ও কর্মের ব্যাপারে সারাজগতে বিভ্রান্তি অপনোদন করেছে, অসম্পূর্ণ দীন ও জীবন ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে এবং এমন সব নীতিগত ও মৌলিক ভুল-ভ্রান্তি দূর করেছে, যেসব কারণে মানবতা সীমাহীন অবনতি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে অবস্থান করছিল। সে বিভ্রান্তিগুলোই ছিল সকল প্রকার ভ্রষ্টতার প্রকৃত কারণস্বরূপ।[১]

১. সর্বপ্রথম মৌলিক বিষয়সমূহে যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের দ্বারা জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বজাহান ও আল্লাহর সৃষ্টিকূলে মানুষের মর্যাদা। এটিই তাওহীদের প্রকৃত ভিত্তিমূল। ইসলামপূর্ব যুগে মানুষ আল্লাহর অধিকাংশ সৃষ্টির চেয়ে নিজেকে সামান্য মর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছে। সে কঠিন পাথর, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবহমান নদী, সবুজ গাছ, বর্ষণশীল বারিধারা, প্রজ্বলিত আগুন, ভীতিপূর্ণ বনানী, বিষাক্ত সাপ, শিকারী সিংহ, দুগ্ধ দানকারী গাভী, উজ্জ্বল সূর্য, প্রদীপ্ত তারকা, কাল রাত, ভয়াবহ প্রকৃতি জগতের যে সকল বস্তুকে ভয় করতে বা যাদের দ্বারা লাভবান হবার বাসনা আছে, তাদের প্রত্যেকটিকে পূজা করেছে এবং তাদের সামনে করজোড়ে মাথা অবনত করেছে। এরপর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জগতবাসীকে এ পয়গাম শোনালেন ঃ 'হে মানব জাতি! এ সকল বস্তু তোমাদের প্রভু নয় বরং তোমরা তাদের প্রভু। তাদেরকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমাদেরকে তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তারা তোমাদের সামনে নত হয়ে আছে, তাহলে তোমরা তাদের সামনে নত হচ্ছো কেন? হে মানব জাতি! এ বিশ্ব জগতে তোমরা আল্লাহর প্রতিনিধি ও খলিফা! তাই বিশ্বজগত ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টিকে তোমাদের জন্য অনুগত করা হয়েছে! তোমরা তাদের অনুগত নও। তারা তোমাদের জন্য, তোমরা তাদের জন্য নও।'

---

১. মিশরীয় ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ কুতুব লিখেছেন যার সমাধানকল্পে পৃথিবীর মানুষ আজ দিশেহারা মানুষের প্রকৃত মর্যাদা এবং মানবিয় লক্ষ আজও অর্জিত হয়নি অথবা বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির সুগেও মানুষ বার বার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছেছে। অতএব, এমনি পরিস্থিতি এটাই প্রমান করে যে আজও ইসলামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষকে সঠিক পথে আসার জন্য ইসলাম সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করছে। (সংযোজন : সম্পাদক)

www.bjilibrary.com

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ

(স্মরণ কর) যখন তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাগণকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আমার নিজের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই।'

(সূরা আল বাকারা : ৩০)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ۔

'এবং সে আল্লাহই পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আল-আন-আম)

এ প্রতিনিধিত্ব ও খিলাফত আদমকে ও আদম সন্তানদেরকে সকল সৃষ্টির মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ۔

'আর অবশ্যই আমি বনি আদমকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি।' কাজেই সবচেয়ে মর্যাদাশালী হবার পর এখন কি তারা নিজেদের চেয়ে কম মর্যাদাশালী ও হীনতর সৃষ্টির সামনে মাথানত করবে?'

ইসলাম মানুষকে এ কথা উপলব্ধি করিয়েছে যে, বিশ্বচরাচর তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ۔

'তোমরা কী দেখনি, যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে– আল্লাহ্ সব কিছুকেই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন?' (সূরা আল হজ্ব : ৬৫)

هُوَالَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا۔

"তিনিই তো তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর সবকিছু।"

(সূরা আল বাকারা : ২৯)

তোমাদের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন। যেমন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا۔لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ۔

www.bjilibrary.com

'আর পশুদের সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য, তাদের পশমে উষ্ণতা ও অন্যান্য উপকার পাওয়া যায়।' (সূরা আন্ নহল : ৫)

বৃষ্টি এবং এর সাহায্যে উৎপাদিত শাক-সবজি এবং গাছ-গাছালি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ.

'তিনিই (আল্লাহ্) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য পানি প্রবাহিত করেন। তা থেকে কিছু তোমরা পান কর, আর কিছুর সাহায্যে গাছ উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে তোমরা পশু চরিয়ে থাক। তা থেকেই তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য শস্য, যয়তুন (তেল), খেজুর, আংগুর ও সব রকমের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছেন।' (সূরা আন্ নহল : ১০-১১)

রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য, তারকা সব তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ.

'আর তিনি (আল্লাহ্) রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্যকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছেন এবং তারকারাজি তাঁর নির্দেশেই কর্মরত।'

(সূরা আন্ নহল : ১২)

সমুদ্র এবং এর প্রবাহও তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন–

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'আর তিনি (আল্লাহ্) সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশ্ত (মাছের) আহরণ করতে পার এবং

www.bjilibrary.com

পরিধান করার জন্য তা থেকে মণিমুক্তা আহরণ করতে পার। তোমরা জাহাজগুলোকে সমুদ্রের বুক চিরে অগ্রসর হতে দেখতে পাও। এসব এজন্য যে, যাতে করে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার এবং তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' (সূরা আন্ নহল : ১৪)

বহু আয়াত এ অর্থে কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এসব আয়াতসমূহের দ্বারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম একথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ হচ্ছে বিশ্বচরাচরের মধ্যমণি। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে সে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সে হচ্ছে বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ হচ্ছে তার সীলমোহর। চিন্তা করুন এ সত্য উদ্ঘাটিত হবার পর মানুষের জন্য বিশ্বচরাচরের কোন অংশ বা সৃষ্টির সামনে মাথা নত কি সঙ্গত হবে? আর তার সামনে মাটিতে কপাল রাখা কি শোভনীয় হবে?[১]

নির্বোধেরা একে অন্যকে আল্লাহ্ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তারা কখনো অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, কখনো ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ফিরাউন, নমরূদ ও শাহানশাহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, কখনো পবিত্রতার বেশ ধারণ করে যোগী ও সন্ন্যাসী আখ্যা লাভ করেছিল। কখনো আবার পোপ, রাব্বি ও দরবেশ সেজে নিজেদেরকে উপাস্য হিসেবে স্বীকার করাতে চেয়েছিল। এসবই ছিল মানবতার লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার বিভিন্ন রূপ ও পর্যায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গামে এসব অনাচারের শিকড় কেটে দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

---

১. বর্তমান যুগে যে অবস্থা বিরাজ করছে এবং যেসব কঠিনতম সমস্যা মাথাচড়া দিয়ে ওঠছে তা দেখে এটা কল্পনাই করা যায় না যে কোন আধুনিক বুদ্ধিমান মানুষ ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অথবা এর উপস্থাপিত জীবন বিধানকে অস্বীকার করতে পারে। পৃথিবীর আদিম বা অন্ধকার যুগে মানুষ যেসব সীমাহীন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল আজকের এক বিংশ শতকেও সেসব কাজে লিপ্ত রয়েছে। তথ্য সাইয়্যেদ কুতুব এর প্রবন্ধ ইসলাম ও আধুনিক ভাবধারা : দ্বীন ইসলাম, ইসলামি ডাইজেস্ট পত্রিকা : মোহাম্মদ শামসুজজামান সম্পাদিত আগষ্ট-১৯৯৭ ১ম সংখ্যা।

www.bjilibrary.com

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদের কেউ যেন কাউকে পালনকর্তা রূপে গ্রহণ না করি।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

এমন কি নবিগণের জন্যও একথা বলার কোন অবকাশ নেই-

كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔

'অন্য সব উপাস্যকে বাদ দিয়ে তোমরা আমার বান্দায় পরিণত হও।'

(সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

ফেরেশ্‌তাগণ অদৃশ্য সত্তাসমূহের মধ্যে এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সত্তাসমূহের মধ্যে নবিগণ সবচেয়ে উন্নত। কিন্তু তারাও মানুষের উপাস্য হওয়ার অনুপযোগী।

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا۔

'আর তিনি (আল্লাহ্) ফেরেশ্‌তা ও নবিগণকে 'রব' মেনে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন না।' (সূরা আলে ইমরান : ৮০)

এজন্য সঙ্গতভাবেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে মানব জাতির মর্যাদা এত বেশি উন্নত হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে তার মাথা নত হতে পারে না আর কারো সামনে তার হাতও প্রসারিত হতে পারে না। এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ভয় করা যাবে না। আসমান ও যমীনে একমাত্র তাঁকেই ভয় করা হয়। তিনি যার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নেয়ার ইচ্ছা করেন তাঁকে কেউ বাধা প্রদানে সক্ষম নয় আর তিনি যাকে দেন তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেয়াও অসম্ভব।

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ۔

"আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি আসমানেরও উপাস্য এবং জমিনেও উপাস্য।" (সূরা আয্ যুখরুফ : আয়াত-৮৪)

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔

'জেনে রেখ, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান করা একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত। (সূরা আল আ'রাফ)

www.bjilibrary.com

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ۔

'কর্তৃত্ব এবং নির্দেশ দানের অধিকার একমাত্র তাঁরই।' (সূরা আল-আন-আম)

لَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ۔

'তাঁর কর্তৃত্বে শরীক নেই।' (সূরা আল ফুরকান)

এবার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ পয়গামকে সামনে রেখে একবার তাওহীদকে বুঝার চেষ্টা করুন, তাহলে জানা যাবে যে, এ ছাড়াও মানুষের মর্যাদাকে তিনি কতদূর উন্নত করেছেন এবং তাওহীদের তাৎপর্যকেও কিভাবে ব্যক্ত করেছেন। এখানে কোন 'কায়সার' ও 'কিসরা' আল্লাহ্র সহযোগী নয়। যা কিছু রয়েছে সবই একমাত্র আল্লাহ্র, কায়সারের কিছুই নেই। রাষ্ট্র একমাত্র তাঁর ও কর্তৃত্ব তাঁরই। তাঁর একই নির্দেশ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

বন্ধুগণ! এবার চিন্তা করে বলুন, খিলাফতের নেশায় বিভোর হয়ে মানুষ কি কখনো আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে মাথা নত করতে পারে? নিকষ অন্ধকার, উজ্জ্বল আলোক, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, উত্তাল অথৈ পানি, পরাক্রমশীল বাদশাহ, শক্তিশালী দুশমন, বিপুল বিস্তৃত বনানী, সুউচ্চ পাহাড়, দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর বা বিরাট সমুদ্র-আল্লাহ্ ব্যতীত এসবের কোনটির সামনে একজন সত্যিকার মুসলমানের অন্তর ভীত-প্রকম্পিত হতে পারে? এ আধ্যাত্মিক শিক্ষার নৈতিকতার প্রতি লক্ষ করুন এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের উচ্চ মর্যাদাও অনুধাবন করুন।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বিতীয় মৌলিক পয়গাম হচ্ছে এটাই যে, জন্মগতভাবে মানুষ পবিত্র, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ। ভাল-মন্দ কাজে মানুষ নিজেকে ফেরেশ্তা বা শয়তান অর্থাৎ বেগুণাহ্ বান্দাহ্কে গুনাগারে পরিণত করে। মানুষের মূল প্রকৃতি পরিষ্কার এবং দাগবিহীন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থেকে মানুষ এ বৃহত্তম সুসংবাদ লাভ করেছে। বার্মা, পাক-ভারত এবং বাংলাদেশের সকল ধর্ম জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। নির্বোধ গ্রীসের অনেক দার্শনিকও এ চিন্তার সাথে

www.bjilibrary.com

একমত। কিন্তু এ ধারণাটি মানব জাতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে এবং এর পিঠে ভারী বোঝা স্থাপন করেছে। তার প্রত্যেকটি কর্মকে অন্য কর্মের ফল হিসেবে চিত্রিত করে তাকে অক্ষম প্রাণীতে পরিণত করেছে। আর তার প্রত্যেকটি জীবনকে করেছে অন্য জীবনের হাতে সোপর্দ। এ বিশ্বাস অনুযায়ী কোন মানুষের পুনর্জন্মই তার গুনাহ্গার হবার প্রমাণ স্বরূপ। খ্রিষ্টধর্মও মানব জাতির এ বোঝা হালকা করেনি বরং আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষাদান করেছে যে, প্রত্যেকটি মানুষ পিতা আদমের গুনাহের কারণে উত্তরাধিকারাসূত্রে গুনাহ্গার। ব্যক্তিগতভাবে কোন গুনাহ্ না করলেও উত্তরাধিকারাসূত্রে পাওয়া এ গুনাহ্ থেকে সে নিস্কৃতি পেতে পারে না। তাই মানুষের পাপমুক্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারাসূত্রে পাপী নয় এমন এক অতি মানুষের প্রয়োজন, তিনি নিজের প্রাণ দান করে মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে বিপর্যস্ত মানবতাকে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তোমরা নিজেদের পূর্বজন্ম ও কর্মফলের ক্রীড়নক নও, তোমরা অক্ষম নও এবং তোমাদের পিতা আদমের গুনাহ্র কারণে তোমরা জন্মগতভাবে গুনাহ্গার নও, বরং তোমরা স্বাভাবিক নিয়মেই পাক-পবিত্র, নিষ্কলংক এবং নির্দোষ। ইচ্ছা হলে তোমরা নিজেদের কর্মে নিজেদের পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বা অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে নিমজ্জিতও হতে পার।

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ـ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ـ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ـ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ـ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ـ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ـ

'ত্বীন ও যয়তুন গাছ এবং সিনাই পাহাড় ও এ শান্তি শহরের (মক্কা) শপথ, অবশ্যই আমি মানুষকে উত্তম সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তাকে নিম্ন থেকে নিম্নতর পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে নয়।' (সূরা আত্ তীন)

www.bjilibrary.com

এ সুসংবাদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম মানবজাতিকে প্রদান করেছে যে, মানুষকে সর্বোত্তম অবস্থা, সর্বোত্তম ভারসাম্য এবং সরলতার পর্যায়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু নিজের করণীয় কাজে ফেলে সে সৎ ও অসৎ পরিণত হয়ে যায়।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

'নফসের শপথ এবং তাকে যথাযথভাবে গঠন করার শপথ, এরপর আমি তাকে উত্তম এবং অধমের মাঝে পার্থক্য করার জ্ঞান দান করেছি। যে তাকে (নফসকে) পবিত্র রেখেছে, সে সফলকাম হয়েছে আর যে একে (নফসকে) মলিন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।' (সুরা আশ শামস্)

এর চেয়ে মানবতার প্রকৃতিগত পাক-পবিত্রতার জন্য স্বচ্ছ পয়গাম আর কী হতে পারে? সূরায়ে দাহারে পুনর্বার বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُوْرًا ۔

'অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এক বিন্দু যৌগিক পদার্থ থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করি। এরপর তাকে শোনার শক্তি ও দেখার শক্তি সম্পন্ন করেছি। নিশ্চয়ই আমিই তাকে পথ দেখিয়েছি। এরপর কৃতজ্ঞ বা অকৃতজ্ঞ হওয়া তার ইচ্ছাধীন।' (সূরা আদদাহর)

সুরায়ে ইনফিতারে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۔

'হে মানুষ! তোমরা দানশীল প্রতিপালকের ব্যাপারে কি জন্য প্রতারণার মধ্যে অবস্থান করছ? যিনি তোমাদের যথাযথ রূপ দান করেছেন,

www.bjilibrary.com

যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের ভারসাম্য প্রদান করেছেন। যেভাবে ইচ্ছা তিনি তোমাদের সংযুক্ত করেছেন।'

(সূরা আল-ইন-ফিতার : ১)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওহির ভাষায় দীন (জীবন-বিধান) ও প্রকৃতি দুটি সমার্থক শব্দ। দীন হচ্ছে আসল প্রকৃতি আর পাপ মানুষের একটি রোগ, তা বাইরে থেকে মানুষকে আক্রমণ করে।

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

'তুমি বাতিল থেকে সরে এসে নিজেকে দীনের ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্ তাঁর নিজ প্রকৃতির ওপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে সহজ-সরল দীন। কিন্তু অনেকেই তা অবগত নয়।' (সূরা আররূম, ৪)

এ আয়াতটির অর্থ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক পয়গামে পূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে। বুখারি শরীফে সূরায়ে রূমের তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ...

অর্থাৎ 'এমন কোন শিশু নেই যে, স্বাভাবিক প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু পরবর্তীকালে তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারিতে পরিণত করে। যেমন, দেখা যায় প্রত্যেক পশুর বাচ্চা নিখুঁত জন্মায়। আপনারা কি কখনো কোন পশুর কানকাটা বাচ্চা জন্মাতে দেখেছেন?'

চিন্তা করুন! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ পয়গাম মানব জাতিকে কত বড় সুসংবাদ প্রদান করেছে। কিভাবে মানুষের চিরন্তন দুঃখকে আনন্দে পরিবর্তিত করেছে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে নিজের জীবনের কর্মক্ষেত্রে কিভাবে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সমগ্র জনবসতি ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। মানুষ পরস্পরের কাছে অপরিচিত। হিন্দুস্তানের মুনি-ঋষিরা আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহ্র বাণীর জন্য কোন স্থান রাখেননি। তাঁদের মতে পরমেশ্বর শুধু আর্যাবর্তের মানুষের কল্যাণ চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ শুধু এদেশের এবং এখানকার কিছু খান্দানকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। যরথুষ্ট্র ইরানের পবিত্র মানবগোষ্ঠী ব্যতীত আর কোথাও আল্লাহ্র বাণী শুনাতেন না। বনি ইসরাঈলগণ তাদের নিজেদের খান্দানের বাইরে কোন রাসূল ও নবির আবির্ভাবের অধিকার স্বীকার করে না। সর্বপ্রথম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গামই পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্র আল্লাহর আওয়াজ শোনায় এবং বলে যে, নেতৃত্ব কোন বিশেষ দেশ, জাতি এবং ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাঁর দৃষ্টিতে ফিলিস্তিন, ইরান, হিন্দুস্তান ও আরব সকল দেশই সমান। সর্বত্রই তাঁর পয়গামের আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বের আলোক সকল দিকেই আলোকিত হয়েছে।

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔

'এমন কোন জাতি নেই যার মাঝে একজন ভীতি প্রদর্শনকারী আবির্ভাব হননি।' (সূরা আল ফাতির)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔

'আর প্রত্যেক জাতির জন্য এসেছেন একজন পথপ্রদর্শক।'

(সূরা আল ওয়া'দি)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ۔

'আর আমি (আল্লাহ্) তোমার (মুহাম্মদ) পূর্বে তাদের নিজেদের জাতিদের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি।' (সূরা আররূম)

কোন ইহুদি তার জাতির বাইরে কোন নবিকে স্বীকার করে না। কোন খৃষ্টানের জন্য বনি ইসরাঈল বা অন্যান্য দেশের নেতৃবৃন্দকে স্বীকার করা অপরিহার্য নয়। আর এমন কাজে তার খৃষ্টানিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য

www.bjilibrary.com

নির্ধারণ হয় না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আর্যাবর্তের বাইরে আল্লাহর কোন বাণী আগমনে অবিশ্বাসী। ইরানের যরথুষ্ট্র মতাবলম্বীগণ নিজেদের দেশ ব্যতীত জগতের সকল দেশকেই অন্ধকার রাজ্য বলে মনে করে। কিন্তু একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গামই ঘোষণা করে যে, সমগ্র জগতে আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহর দানে প্রত্যেক জাতি, গোত্র ও বংশ সমান অংশীদার। ইরান বা হিন্দুস্থানে, চীনে বা গ্রীসে, আরবে বা সিরিয়ায় সর্বত্রই আল্লাহর জ্যোতি সমানভাবে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। জগতের যেখানেই জনবসতি রয়েছে, সেখানেই আল্লাহ তাঁর দূত পাঠিয়েছেন, তাঁর পথ-প্রদর্শনকারীর আবির্ভাব ঘটিয়ে তাঁদের মাধ্যমে নিজের বিধি-বিধান সম্পর্কে সবাইকে অবগত করেছেন।

ইসলামের এ শিক্ষার ফলে কোন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না সে জগতের সকল নবি-রাসূলের ওপর, আসমানি কিতাবসমূহের ওপর এবং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ববর্তী বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কুরআনে যে সকল নবি-রাসূলের নাম উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের নামসহ আর যাঁদের নাম অজ্ঞাত অর্থাৎ কুরআন জানায়নি তাঁরা, যে দেশেই আবির্ভূত হোন না কেন এবং যে নামেই পরিচিত হোন না কেন, তাঁদের সবাইকে সত্যরূপে স্বীকার করা অপরিহার্য।

কে মুসলমান?

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔

(হে মুহাম্মদ!) তোমার ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছিল, তার ওপর যারা ঈমান রাখে।' (সূরা আল বাকারা)

আবারো সূরায়ে বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ۔

'কিন্তু নেকি তার জন্য নির্ধারিত যে আল্লাহর ওপর, আখিরাতের দিনের ওপর, ফেরেশতাগণের ওপর ও সকল নবির ওপর ঈমান এনেছে।' (সূরা আল বাকারা)

www.bjilibrary.com

এ সূরার শেষের দিকে বলা হয়েছে ঃ নবি ও তাঁর অনুসারীগণের

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ۔

'সবাই ঈমান এনেছেন আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর ও তাঁর রাসূলগণের ওপর। (তারা বলেন ঃ) আমরা তাঁর (আল্লাহর) রাসূলগণের মাঝে কোন ব্যবধান করি না।'

(সূরা আল বাকারা)

অর্থাৎ এমন নয় যে, তাঁদের কারো ওপর ঈমান আনবে এবং কারো ওপর ঈমান আনবে না। সমগ্র মুসলিম জাতিকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ۔

'হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর ওপর, তাঁর রাসূলের ওপর এবং যে কিতাব ইতোপূর্বে নাযিল হয়েছে তার ওপর।' (সূরা আন নিসা : ১৩৬)

বন্ধুগণ! আর কে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত জগতকে এ আধ্যাত্মিক সাম্য, মানবিক ভ্রাতৃত্ব এবং সকল সত্য ধর্ম, ধর্মীয় নেতৃত্ব নবি-রাসূলগণের প্রতি যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ও সমানভাবে তাঁদের সত্যতার স্বীকৃতির শিক্ষা প্রদান করেছে? এবার চিন্তা করুন, ইসলামের নবির 'রহমত' কত সর্বজনীন, তাঁর সহানুভূতি এবং সাম্যের পরিসর কত প্রসারিত! কোন মানুষ, কোন আবাস, বনি আদমের কোন বাসস্থান এ থেকে মুক্ত নয়।

৪. সকল ধর্ম উপাস্য ও উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্থলে কোন না কোন ধরনের মধ্য-সত্তা সৃষ্টি করে রেখেছিল। প্রাচীন মন্দিরগুলোর পূজারি ও পুরোহিত ইহুদিরা বনি লাবী এবং তাঁর বংশধরদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বান্দার ইবাদত এবং কুরবানির মধ্যস্বত্বা বিবেচনা করে। খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসার কিছু হাওয়ারি (সাথী) ও তাদের স্থলাভিষিক্ত পোপদেরকে এ মর্যাদা প্রদান করেছিল যে, তারা যমীনের ওপর যা বাঁধবে, আকাশেও তাই উন্মুক্ত করা হবে। তাদেরকে সকল মানুষের গোনাহ মাফ করার অধিকার

www.bjilibrary.com

প্রদান করা হয়েছে। তাদের সাহায্য ব্যতীত কোন ইবাদত হতে পারে না। হিন্দুদের মত আল্লাহ বিশেষভাবে ডান হাত দিয়ে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করেছেন। সেই হচ্ছে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যস্বত্বা। তার সাহায্য ব্যতীত হিন্দুর কোন আরাধনা পরিপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু ইসলামে পূজারি পুরোহিত পোপ এবং পাদ্রীদের কোন শ্রেণি নেই। এখানে বাঁধা ও খোলার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। এখানে গোনাহ মাফ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। উপাস্য, উপাসক, আল্লাহ ও বান্দার ইবাদত এবং গোপন সম্পর্কে মধ্যে অন্য কারো কোন অধিকার নেই। প্রত্যেক মুসলমান নামাযের ইমাম হতে পারে, কুরবানি করতে পারে, বিয়ে পড়াতে পারে এবং ধর্মের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারে। এখানে মানবজাতির জন্য اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (হে লোকেরা সরাসরি আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জবাব দেব)-এর আহবান সর্বজনীন। প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌র সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে, নিজের দোয়ার মধ্যে তাঁকে ডাকতে পারে, তাঁর কাছে মাথা অবনত করতে পারে এবং হৃদয়ের ভক্তি সরাসরি উত্থাপন করতে পারে। এখানে উপাস্য ও উপাসক এবং আল্লাহ ও বান্দার ক্ষেত্রে কোন মধ্যস্বত্বা নেই। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে এ শ্রেষ্ঠতম আযাদি প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে মানুষ মানুষের দাসত্বমুক্ত হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পুরোহিত, পোপ এবং ব্রাহ্মণ।

৫. যুগে যুগে মানুষের শিক্ষা এবং হিদায়াতের জন্য যে সকল পবিত্রাত্মা আগমন করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে শুরু থেকেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সীমাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়িও ছিল। বাড়াবাড়ি এটাই ছিল যে, মূর্খরা তাঁদেরকে আল্লাহ, আল্লাহর সমতুল্য, আল্লাহর রূপ বা তাঁর প্রকাশ গণ্য করেছিল। ব্যাবিলন, আসিরিয়া ও মিসরের ধর্ম মন্দিরসমূহে পুরোহিতদেরকে আল্লাহর সমতুল্যরূপে দেখা যায়। হিন্দুদের মাঝে অবতারবাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীগণ যথাক্রমে নিজেদের ধর্মপ্রবর্তক বুদ্ধ ও মহাবীরকে আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। খ্রিষ্টানরা তাদের

www.bjilibrary.com

নবিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেছে। অন্যদিকে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, সে ছিল নবি ও রাসূল, সে গোনাহগার হোক বা নৈতিক দিক দিয়ে যতই নিম্ন পর্যায়ের এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে সে যে কোন পর্যায়ে অবস্থান করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তার সৎ ও নিষ্পাপ হওয়াও বাধ্য-বাধকতা ছিল না। তাই বনী ইসরাইলদের বর্তমান আসমানি কিতাব ও পুস্তিকাসমূহে বড় বড় নবি-রাসূল সম্পর্কে এমন সব কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা একেবারেই নিম্নমানের। এমন কি তা উল্লেখ করারও অযোগ্য।

এ বিরাট দায়িত্বটির মর্যাদা নির্ধারণ করেছে ইসলাম এবং বলেছে যে, নবিগণ আল্লাহ্ নন, আল্লাহ্ সমতুল্যও নন, অবতারও নন এবং আল্লাহ্র পুত্র ও আত্মীয়ও নন। তাঁরা হলেন মানুষ, নিছক মানুষ, রক্ত মাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষ। নির্জলা মানুষরূপেই সকল নবি-রাসূল আগমন করেছিলেন এবং সর্বশেষ নবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'আমি একজন মানুষ মাত্র।' কাফেররা সবিস্ময়ে বলেছেন ঃ أَبَشَرًا رَّسُوْلًا 'মানুষ কি রাসূল হতে পারে?'

ইসলাম বলে, 'হ্যাঁ।

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ـ

'হে নবি! বলে দিন, আমি তোমাদেরই মতই মানুষ!' 'আমি তো মানুষ, রাসূল ব্যতীত কিছুই নই।'

আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতে কোন বস্তুর ওপর নবিগণের সরাসরি কোন অধিকার নেই। তাঁর সরাসরি কোন অতি মানবিক কার্য সম্পাদনের শক্তি রাখেন না। তাঁরা সব কিছু আল্লাহ্র নির্দেশ ও ইশারায় সম্পন্ন করে থাকেন।

অন্যদিকে বলা হয়েছে, যদিও তাঁরা মানুষ-তবুও নিজেদের কর্মশক্তি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে তাঁরা সমস্ত মানুষ শ্রেষ্ঠ। তাঁরা আল্লাহ্র সাথে কথা বলেন। তাঁদের ওপর আল্লাহ্র ওহি নাযিল হয়। তাঁরা নিষ্পাপ। কেননা

www.bjilibrary.com

তাঁরা হবেন পাপীদের জন্য আদর্শ। তাঁদের হাত দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ এবং ইশারায় নিজের অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করেন। তাঁরা মানুষকে সৎশিক্ষা দেন। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের আনুগত্য সবার ওপর ফরয। তাঁরা আল্লাহ্র বিশেষ, খাঁটি এবং অনুগত বান্দা। আল্লাহ্ তাঁদেরকে রিসালাত এবং নবি তাঁর দায়িত্ব প্রদান করেছেন।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম নবি ও রাসূলগণের সম্পর্কে এ ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থার প্রচলন করেছে। এ পন্থা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি এবং সীমাতিরিক্ততার ত্রুটিমুক্ত। যে ধর্ম জগতে তাওহীদকে পূর্ণতা প্রদান করেছে, এটি একমাত্র তারই উপযোগী বলে বিবেচিত।

বন্ধুগণ! আমাদের আলোচনা বেশ সুদীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। এখনো অনেক কথা বলা হলো না। ইনশাআল্লাহ্ আগামী আলোচনায় আরো কিছু উল্লেখ করা হবে। রাত অনেক হয়েছে। তাই আজকের মজলিস এ চিরন্তন, পরিপূর্ণ এবং বিশ্বজনীন শিক্ষকের প্রতি দরূদ এবং সালাম প্রদান করে সমাপ্ত করা হলো।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী প্রচার

প্রিয় বন্ধুগণ! আজ আমার এবং আপনাদের মাসাধিককাল সাক্ষাতকারের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে আর আমার অষ্টম মৌলিক বিষয়গুলোর বক্তৃতা আজ শুরু হচ্ছে। আমি আমার পরিসমাপ্তিমূলক দুটি বক্তৃতায় ইসলামের সরল সব কথা আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাচ্ছি।

পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলো তাওহীদের ক্ষেত্রে যেগুলো মূলত তাওহীদেরই পয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে আগমন এসেছিল সেসব তিনটি কারণে বিভ্রান্তি এবং গোমরাহির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম, দেহভিত্তিক উপমা এবং রূপ বর্ণনা।

দ্বিতীয়, আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর অস্তিত্ব থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র মনে করা।

তৃতীয়, কর্মবৈচিত্র্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়া। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামে এ গ্রন্থিগুলো উন্মুক্ত করে দিয়েছে, এ বিভ্রান্তিগুলো আপনোদন করেছে এবং এ সত্যকে আবরণমুক্ত করেছে। সর্বপ্রথম উপমা এবং রূপকের আলোচনায় সেগুলো উল্লেখ করা যাচ্ছে।

'আল্লাহকে, আল্লাহ্র গুণাবলিকে, আল্লাহ্ এবং বান্দার পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্পষ্ট করার জন্য অন্যান্য ধর্মগুলোর ভক্তবৃন্দ কাল্পনিক বা বস্তুগত উপমা এবং রূপকের অবতারণা করে। ফলে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র প্রকৃত অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে থাকে এবং সেখানে উপমা এবং রূপকে বর্ণিত আস্তিত্বসমূহ আল্লাহর স্থান লাভ করে। এ অস্তিত্বগুলো পরে দেহ ধারণ করে মূর্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং মানুষ তাদের পূজা করার সূচনা করে। বান্দার প্রতি আল্লাহ্র স্নেহ, ভালবাসার এবং করুণাকেও উপমা ও রূপকের রঙে রঙীন করে দেহের রূপদান করা হয়। যেহেতু আর্যজাতিগুলোর মধ্যে নারী ছিল প্রেমের দেবী, তাই আল্লাহ্ এবং বান্দার

www.bjilibrary.com

সম্পর্ককে 'মাতা' ও 'পুত্র' নমে অভিহিত করা হয়। আর এ জন্য সেখানে আল্লাহ 'মা' রূপে আগমন করেছেন। হিন্দুদের অন্যান্য অনেক সম্প্রদায়ে এ অনাস্বাদিত প্রেমকে নারী-পুরুষ এবং স্বামী-স্ত্রী শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়টি চিরসোহাগী যোগীরা শাড়ী এবং চুড়ি পরিধান করে প্রকাশ করেছেন। গ্রীক এবং রোমীয়দের মাঝেও আল্লাহকে নারী মূর্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। সিরীয় জাতিদের কাছে প্রকাশ্যে নারীর নামোচ্চারণ ছিল সভ্যতা বিরোধী। তাই পিতা খান্দানের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এভাবে ব্যাবিলন, আসিরিয়া এবং সিরিয়ার প্রাচীন ধবংসাবশেষগুলোর মধ্যে আল্লাহকে পুরুষের রূপে দেখা যায়। বনি ইসরাঈলদের প্রারম্ভিক চিন্তাধারায় আল্লাহকে পিতা এবং সকল ফেরেশতা এবং মানুষকে তার সন্তানরূপে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীকালে শুধু বনি-ইসরাঈলগণই পিতারূপী আল্লাহর সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বনি-ইসরাঈলদের অনেক সহীফায় আল্লাহ ও বনি-ইসরাঈলদের সম্পর্ককে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক রূপে উত্থাপন করা হয়েছে। এমন কি বনি-ইসরাঈল ও জেরুসালেম স্ত্রী হিসেবেও আল্লাহ এদের স্বামী হিসেবে পরিগণিত হয়। খ্রিষ্টানদের মাঝেও পিতা এবং পুত্রের উপমা আসল সম্পর্কের স্থান লাভ করে। আরবদের মধ্যেও এমন ধারণা ছিল। আল্লাহকে পিতারূপে ধারণা করা হত এবং ফেরেশতাগণকে তাঁর কন্যারূপে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম সেসব উপমা, রূপক ও প্রবাদকে নিমেষেই নিশ্চিহ্ন করে সেগুলোর ব্যবহার শিরকরূপে চিহ্নিত করেছে। এখানে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

"তাঁর সমতুল্য কোন বস্তুই নেই।" এ একটি বাক্যই যাবতীয় শিরকের ভিত্তিমূল উৎপাটিত করেছে। এরপর ছোট একটি সূরার মাধ্যমে মানুষের বৃহত্তম বিভ্রান্তি দূর করে দিয়েছে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۔ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۔

www.bjilibrary.com

'(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, আল্লাহ এক। আল্লাহ (নিজেই প্রত্যেক বস্তুর) মুখাপেক্ষীহীন। এবং সকল বস্তুই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি জন্ম দেন না (যারা তাঁর সন্তান গণ্য হতে পারে)। এবং তিনি কারো জাতও নন (যাতে করোরো সন্তান হয়ে তারপর আল্লাহ হতে হয়)। এবং তাঁর কোন সমকক্ষও নেই (যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে।)'

(সূরা আল ইখলাস)

কুরআনের এ সবচেয়ে ছোট্ট সূরাটিতে তাওহীদের পরিচ্ছন্ন চিত্ররূপে প্রকাশ হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দীন সব রকমের ত্রুটিমুক্ত হয়েছে।

বন্ধুগণ! এর অর্থ এ নয় যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার প্রেম, ভালবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক ছিন্ন করছেন, বরং তিনি এ সম্পর্কগুলোকে আরো অধিক শক্তিশালী ও গভীর করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কগুলো প্রকাশ ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মানবিক আকৃতির মাধ্যমে যে দেহভিত্তিক ব্যাখ্যার প্রচলন ছিল, শুধু সেগুলোকে বিলুপ্ত করেছেন। কারণ প্রথম, এ মানবিক পদ্ধতি সত্যের প্রকাশ থেকে বহু দূরে অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে বান্দা এবং আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক, তার তুলনায় পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নেহাতই অর্থহীন ও নিম্নস্তরের। দ্বিতীয়, সে ব্যাখ্যাসমূহের দ্বারা শিরকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাই ইসলাম বলেছে ঃ اُذْكُرُوْا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآئَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا তোমরা আল্লাহকে ঠিক তেমনিভাবে স্মরণ কর, যেমন তোমাদের পিতাদেরকে স্মরণ করে থাক এবং তার চেয়ে বেশি করে (স্মরণ কর)।' লক্ষ করুন, এ আয়াতে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য এ কথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ তোমাদের পিতা অর্থাৎ আল্লাহ এবং পিতাকে উপমান এবং উপমা হিসেবে উত্থাপন করা হয়নি। বরং আল্লাহর ভালবাসা এবং পিতার ভালবাসা এ উভয় ভালবাসাতে উপমা এবং উপমেয়রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলাম এ দৈহিক সম্পর্ককে ত্যাগ

www.bjilibrary.com

করেছে কিন্তু এ দৈহিক সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট ভালবাসাকে জীবিত রেখেছে। বরং সামনে এগিয়ে বলেছে ঃ 'আল্লাহকে পিতার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসা উচিত।' اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا থেকে প্রমাণ হয় যে, এ সম্পর্কে সৃষ্ট ভালবাসাকে সে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে ভালবাসার তুলনায় তুচ্ছ ও নিম্ন পর্যায়ের মনে করে এবং এর মধ্যে উন্নতির প্রয়োজন অনুভব করে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ ঈমানদারগণ আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে।' ইসলাম 'আল্লাহকে 'আবুল 'আলামীন' (বিশ্বপিতা) বলে না, বরং বলে 'রাব্বুল 'আলামীন' (বিশ্বপালক)। কেননা তার দৃষ্টিতে তার পিতার চেয়ে রব (প্রতিপালক)-এর মর্যাদা অনেক ওপরে অবস্থান করে। পিতার সম্পর্ক পুত্রের সাথে সাময়িক কিন্তু 'রবে'র সম্পর্ক তাঁর সৃষ্টির সাথে তার অস্তিত্ব লাভে পরবর্তী মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিদ্যমান। এর মধ্যে একটি মুহূর্তেরও ছেদ নেই। ইসলামের আল্লাহ হচ্ছেন 'ওয়াদুধ' অর্থাৎ প্রেমসম্পন্ন, 'রউফ' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ যেমন স্নেহ ও ভালবাসা পিতা-পুত্রের প্রতি পোষণ করেন এবং 'হান্নান' অর্থাৎ এমন স্নেহ ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, যেমন স্নেহ এবং ভালবাসা মা-সন্তানের প্রতি পোষণ করেন। কিন্তু এরপরও তিনি পিতাও নন, মাও নন, বরং এ উপমাগুলোর বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

২. বন্ধুগণ! প্রাচীন ধর্মসমূহের তাওহীদ-বিশ্বাসে বিভ্রান্তির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে ভুল ধারণা। অর্থাৎ আল্লাহর গুণাবলিকে তাঁর সত্তা থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করা। হিন্দুধর্মে দেবতার যে বিরাট দল দৃষ্টিগোচর হয়, এর মূল কারণও এখানেই নিহিত। তারা আল্লাহর প্রতিটি গুণকে একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে, এর ফলে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে।[১]

---

[১]. এ জেড এম. শামসুল আলম প্রণীত 'ইসলাম ও হিন্দুধর্ম' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে দেবতার সংখ্যা ৩৩ এবং পরবর্তীতে তা অগণীত রূপ ধারণ করেছে। গ্রন্থটির প্রকাশক : ইতিহাস সংকলন-প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ঢাকা। (সম্পাদক)

www.bjilibrary.com

সংখ্যা ছাড়াও গুণাবলির উপমা ও রূপককেও তারা দেহধারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আল্লাহর শক্তিকে তারা সত্যিকার হাতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে এবং তাঁর দেহধারী উপমা এবং রূপককেও দেহধারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাঁর দেহধারী উপমা প্রদান করতে গিয়ে দু' হাতের পরিবর্তে কয়েক জোড়া হাত তৈরি করেছে। আল্লাহর গভীর এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে বুঝাতে গিয়ে একটি মস্তকের স্থলে দ্বিমস্তকধারী মূর্তিতে পরিণত করে দিয়েছে।

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্পর্কে চিন্তা করা হলে জানতে পারবেন যে, একই আল্লাহর গুণাবলি ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দেহরূপ দান করার কারণে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর তিনটি প্রধান পরিচয় হচ্ছে ঃ তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালনকারী এবং ধ্বংসকারী। হিন্দু সম্প্রদায়সমূহ এ তিনটি পরিচয়কে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি করে নিয়েছে ঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ স্রষ্টা, প্রতিষ্ঠাকারী ও পালনকারী এবং ধ্বংস ও সংহারকর্তা। এভাবে তিনটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও শৈব তিনটি পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। শিবলিঙ্গবাদী সম্প্রদায় স্রষ্টার নিছক সৃষ্টি গুণকেই নিজেদের আল্লাহ গণ্য করে প্রজননযন্ত্রকে স্রষ্টার প্রকাশ হিসেবে স্বীকতি প্রদান করে তার প্রতিমূর্তির পূজার প্রচলন করেছে।[১]

খ্রিষ্টানরা আল্লাহর তিনটি বৃহত্তম গুণ অর্থাৎ চিরস্থায়ী অস্তিত্ব, অসীম জ্ঞান ও অপ্রতিরোধ্য সংকল্পকে তিনটি পৃথক অস্তিত্ব হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। চিরস্থায়ী অস্তিত্ব হচ্ছে পিতা, অসীম জ্ঞান হচ্ছে পবিত্র আত্মা এবং সঙ্কল্প হচ্ছে পুত্র। এ ধরনের ধারণা রোমীয়, গ্রীক ও মিসরীয় চিন্তায়ও লক্ষ করা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম এ ভ্রান্তি অপনোদন করেছে এবং গুণাবলির বৈচিত্রে প্রতারিত হয়ে আল্লাহকে

---

[১]. এ সম্পর্কে আরো জানতে হলে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম গ্রন্থ দেখুন।
প্রকাশক : ইতিহাস সংকলন, প্রণয়ন ও গবেষণা সংস্থা, ঢাকা। (সম্পাদক)

www.bjilibrary.com

ভিন্ন ভিন্ন মনে করা মানুষের মূর্খতা ও অজ্ঞতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কুরআন বলেছে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সমস্ত গুণাবলি একমাত্র বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর ক্ষেত্রে নির্ধারিত' وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى 'সমস্ত উত্তম গুণাবলি একমাত্র তাঁরই ক্ষেত্রে নির্ধারিত।' اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ 'আল্লাহ হচ্ছেন যমীন ও আমানের নূর।' আরবে এ সত্তাকে 'রহম' গুণে বিভূষিত করে খিষ্টানরা তাঁকে বলে রহমান। আরবের সাধারণ মুশরিকরা তাঁকে বলে 'আল্লাহ'। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى۔

'আল্লাহ্' বলে ডাক বা 'রহমান' বলে ডাক, যাই বলে ডাক না কেন, সমস্ত উত্তম নাম বা উত্তম গুণাবলি একমাত্র তাঁরই জন্য নির্ধারিত।'

(সূরা আল ইসরা : ১১০)

فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتٰى ۔وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

'কাজেই আল্লাহই হচ্ছেন বন্ধু এবং কার্যোদ্ধারকারী, তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর শক্তিশালী!'

(সূরা আশ শূরা : ৯)

اَلَا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

'জেনে রেখ, অবশ্য আল্লাহ্ ক্ষমাকারী ও করুণাশীল।' (সূরা আশ্ শূরা)

وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ وَّفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ وَّهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ۔

'তিনি আসমানে আল্লাহ এবং তিনি যমীনেও আল্লাহ এবং তিনি সুবিবেচক জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা আয যুখরুফ : ৮৪)

إِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ۔

www.bjilibrary.com

'তিনিই শোনেন ও জ্ঞানী। তিনি আসমান যমীন যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সবকিছুর প্রতিপালক-যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস কর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন।' অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু, এবং তিনিই শিব তিনটি একই বিশেষ্যের বিশেষণ এবং এদের মাঝে কোন বৈষম্য নেই।

(সূরা আদ দুখান : ৬, ৮)

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

'সকল প্রশংসা এবং গুণাবলি একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই। তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর প্রতিপালক এবং সমগ্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। যমীন এবং আসমানে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।' (সূরা আল জাসিয়া : ৩৬)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন 'ইলাহ' নেই। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিষয়গুলোর সকল খবর রাখেন। তিনি অনুগ্রহশীল ও করুণাকার। আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, পবিত্র, শান্তি, নিরাপত্তা ও শান্তিদানকারী, আশ্রয়দাতা, বিপুল শক্তিপ্রয়োগকারী, শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশকারী। মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যে সকল বিষয়ে শরীক করে, তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং পবিত্র। আল্লাহ্ই স্রষ্টা। তিনি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান , তিনি আকৃতি দানকারী, যাবতীয় উত্তম নাম (বা উত্তম গুণাবলি)

www.bjilibrary.com

তাঁরই জন্য নির্ধারিত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু (সৃষ্টি) রয়েছে, সবই তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। তিনি পরাক্রমশালি এবং জ্ঞানী।

(সূরা আল হাশর : ২২-২৪)

এ সকল গুণে গুণান্বিত আল্লাহকে আমরা একমাত্র মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গামের দ্বারা জানতে পেরেছি। নয়তো অন্যেরা সত্তা এবং গুণাবলিকে পৃথক করে এক আল্লাহকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বাক্যেও সে শিরকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর সত্তাকে তাঁর গুণাবলি থেকে পৃথক করে লোকেরা এ শিরকে নিমজ্জিত হয়েছিল। এ সর্বশেষ পয়গাম একথা ব্যক্ত করেছিল যে, যিনি আল্লাহ তিনিই স্রষ্টা, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই অস্তিত্বদানকারী, তিনিই আকৃতিদানকারী, তিনিই বাদশাহ, তিনিই পবিত্র সত্তা, তিনিই শান্তিদাতা, তিনিই পরাক্রান্ত এবং বিপুল শক্তিশালী এবং তিনিই অনুগ্রহশীল এবং করুণাকার। সবই একই সত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি মাত্র এক বা একক।

৩. শিরকের তৃতীয় উৎস হচ্ছে আল্লাহর কর্মবৈচিত্র। নির্বোদেরা মনে করে নিয়েছে যে, বিভিন্ন সত্তা বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদন করে থাকে।

কর্ম দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সৎ অন্যটি অসৎ বা এভাবেও বলা যায়, একটি উত্তম এবং অন্যটি মন্দ। একটি সত্তার মাঝে উত্তম ও মন্দের ন্যায় দু'টি বিপরীত গুণের সমাবেশ হতে পারে না। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যরথুস্ট্রিয়গণ উত্তম কাজ ও ভাল বিষয়ের জন্য পৃথক আল্লাহ এবং মন্দ কাজ এবং মন্দ বিষয়ের জন্য পৃথক আল্লাহ্‌র ধারণা করে নিয়েছে। প্রথমটির নাম ইয়াযদাঁ এবং দ্বিতীয়টির নাম আহিরমন! তারা দুনিয়াকে এ দু'টি আল্লাহর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তাদের এ ভুল করার কারণ হচ্ছে এটাই যে, তারা উত্তম ও মন্দের তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। বন্ধুগণ, জগতে ভাল এবং মন্দ নামক কোন বস্তু নেই। কোন বস্তু তার মূলের দিক দিয়ে উত্তমও নয়, মন্দও নয়। মানুষের এ বস্তু ব্যবহারের মাধ্যমেই তা ভাল এবং মন্দে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আগুনের উল্লেখ করছি। এর সাহায্যে যদি খাদ্য তৈরি করেন,

www.bjilibrary.com

গাড়ি চালান বা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কাউকেও উত্তাপ দান করেন, তাহলে এগুলো উত্তম। আবার যদি এর সাহায্যে কোন গরিবের ঘর জ্বালিয়ে দেন, তাহলে মন্দ। আগুন তার প্রকৃতির দিক দিয়ে উত্তমও নয়, মন্দও নয়। আপনারা নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে একে ভাল বা মন্দে পরিণত করেন। তলোয়ার ভালও নয়, মন্দও নয়, আপনারা একে যেভাবে ব্যবহার করবেন, সেভাবেই সে কাজ করবে। অন্ধকার ভালও নয়, মন্দও নয়। তাকে মানুষের ঘরে সিঁদ কাটার জন্য ব্যবহার করলে তা মন্দে পরিণত হয়, আবার নিজেকে দৃষ্টির অন্তরালে রেখে নেকি অর্জন বা মানুষকে শান্তি ও আরামদানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে তা ভালতে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্, এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন, পদার্থ সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন বস্তুকে বিভিন্ন গুণ ও শক্তিতে ভূষিত করেছেন। এরপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তাকে হৃদয় এবং মাথা দান করেছেন। এখন দেখুন, এক ব্যক্তি এ বিশ্বজাহানের বিন্যাস এবং পদার্থের গঠনপ্রণালি এবং গুণাবলি দেখে এক মহাশক্তিধর স্রষ্টার সৃষ্টি-ক্ষমতা ও গঠন-বৈচিত্র্যের ওপর বিস্ময় প্রকাশ করে فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ 'শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা আল্লাহ মহামহীয়ান' বলে হযরত ইবরাহীমের ন্যায় এরূপ চিৎকার করে ঃ

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

'আমার মুখ সকল দিক থেকে ফিরিয়ে এনে সে সত্তার দিকে স্থাপন করেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা আল-আন-আম : ৯৭)

অন্যদিকে সে পদার্থ এবং তার শক্তিসমূহ এবং গুণাবলির বাহ্যিক আকৃতিতে বিভ্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তি আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং পদার্থকেই আসল বিশ্ব ও এর সকল শক্তির মূল মনে করে বলে ঃ

www.bjilibrary.com

مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ۔

'এ জাগতিক জীবনটি ব্যতীত আর কোন জীবন নেই, আমরা মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই এবং যামানার বিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই আমাদেরকে মৃত্যু দান করে না।' (সূরা আল জাসিয়া : ২৪)

বিশ্বচরাচর এবং এর সৃষ্টিবৈচিত্র্য সকলের সামনে একইরূপে বিরাজমান, কিন্তু এ বিশ্বে রয়েছে হাজার ধরনের মন-মানসিকতা। একই দৃশ্য দেখে একটি মন আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং অন্যটি গোমরাহী এবং নাস্তিকতায় পরিণত হয়। চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, একটি বস্তু মানুষকে সৎপথও দেখাচ্ছে, আবার বিভ্রান্তও করছে বা এভাবেও বলা যায়, এ বিশ্বচরাচর তার প্রকৃতিগতভাবে সৎপথ প্রদর্শন করা বা পথভ্রষ্ট করার কোন কিছুরই যোগ্যতা রাখে না বরং আপনারা নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে সৎপথ লাভ করছেন, আবার পথভ্রষ্ট হচ্ছেন। আল্লাহর একটি কর্ম পদার্থ যেমন দু' প্রকার ফল দান করে, তেমনি তাঁর পয়গামও দু' প্রকার ফল দান করে। একই কুরআন ও ইঞ্জিল পাঠ করে এক ব্যক্তি আল্লাহকে চিনতে পারে এবং সান্ত্বনা লাভ করে এবং অন্য ব্যক্তির মনে সন্দেহের উদয় হয়, সংশয়ের সৃষ্টি হয় এবং সে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পয়গাম একই, কিন্তু হৃদয় দু'টি এবং এ দু'টি হৃদয় ও দু'টি চিন্তাধারা একই স্রষ্টার সৃষ্টি। স্রষ্টাও এখানে দু'জন নয়। তাহলে এ আলোচনার ফল কী দাঁড়াচ্ছে? ফল এটাই দাঁড়ায় যে, কর্মের প্রকারভেদ ভিন্ন ভিন্ন স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। এ-বিপুল বৈচিত্র্য একই আল্লাহর শক্তিমত্তার প্রকাশ। ভাল এবং মন্দ উভয়ই তাঁরই হাতে এবং হিদায়াত এবং গোমরাহী উভয়ই তাঁর কাছে থেকে আসে।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۠ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔

www.bjilibrary.com

'নিজের এ বাণীর দ্বারা তিনি (আল্লাহ) অনেককে সত্যপথের সন্ধান দেন। তিনি তাদেরকে সত্যপথের সন্ধান দেন না যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ যাকে অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দেন তাকে ছিন্ন করে এবং জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।' (সূরা আল বাকারা : ২৭)

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ۔

'এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে সত্য পথের সন্ধান দেন না।'

(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২৬৪)

এ আয়াতগুলো থেকে জানা যাবে যে, সৎপথ এবং পথভ্রষ্টতা উভয়ের মূলে রয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের দ্বারাই উভয়ের উদ্ভব হয়। মানুষ ফাসেকির কাজ করে, আত্মীয়-পরিজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, বিপর্যয় সৃষ্টি করে, কুফরি করে, এরপর পথভ্রষ্টতা অনুসরণ করে। পথভ্রষ্টতা কখনো প্রথমে এবং ফাসেকি, নির্লজ্জতা ইত্যাদির পরেই সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে বলে দিয়েছেন যে, এ পথটি গন্তব্যের দিকে গিয়েছে এবং ঐ পথটি মানুষকে গভীর গহবরে নিক্ষেপ করে। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا۔

'আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, এখন সে কৃতজ্ঞ হয় বা হয় অস্বীকারকারী।' (সূরা আদদাহর : ৩)

তিনিই সারাজগতের ভাল-মন্দ প্রত্যেকটি বস্তুর একমাত্র স্রষ্টা। তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ شَىْءٍ م لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔

'আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত আর কোন আল্লাহ্ নেই।' (সূরা আল মুমিন : আয়াত-৬২)

اَللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ۔

'আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কিছু করো সব সৃষ্টি করেছেন।'

(সূরা আস সফফাত : ৯৬)

www.bjilibrary.com

কিন্তু ঃ أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى۔

'তিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন এরপর তাকে যথার্থ পথের সন্ধান দিয়েছেন।' (সূরা আত-ত্বহা : ৫০)

এখন মানুষই তাকে হিদায়াত এবং গোমরাহে এবং ভাল ও মন্দে পরিণত করেছে। ভুল পথে পরিচালিত হলে তা গোমরাহীতে পরিণত হয় এবং সঠিক পথে অগ্রসর হলে হিদায়াতের পথের উপযোগী হয়। যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করলে তা ভাল এবং ভুল ব্যবহারের ফলে মন্দের দিকে ধাবিত হয়। তাছাড়া কোন বস্তু তার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে ভালও নয়, মন্দও নয়, গোমরাহীও নয়। তাই ভাল এবং মন্দকে দু'টি বস্তু মনে করে দু'টি পৃথক আল্লাহ স্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং আল্লাহ উভয়েরই স্রষ্টা।

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۔

'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন স্রষ্টা আছে কী? তিনিই তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযক দান করেন। তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, তাহলে তোমরা কোথায় পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' (সূরা আল ফাতির : ৩)

আল্লাহ তাঁর পয়গাম তোমাদের কাছে সোপর্দ করেছেন, এখন তোমরা তাকে মানতে পার, আবার মানতে নাও পার।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ۔

'এরপর আমি তাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারীতে পরিণত করেছি, যাদের আমি নিজের বান্দাদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত করেছি। এখন কেউ তাদের মধ্যে থেকে নিজেদের ওপর অত্যাচার করে, আবার কেউ আল্লাহর নির্দেশে সৎকাজে এগিয়ে যায়।' (সূরা আল ফাতির, আয়াত-৩২)

www.bjilibrary.com

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ـ

'আর তোমাদের ওপর যে সমস্ত বালা-মসিবত আসে, তা তোমাদের হাতেরই যা কিছু অর্জন করে এরই প্রতিফল স্বরূপ এবং তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন।' (সূরা আশ শূরা : আয়াত-৩০)

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ـ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ـ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ـ

'প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ পাপ ও পুণ্য নিক্ষেপ করেছেন। কাজেই যে তাকে (নিজের নফসকে) পবিত্র করেছে, সে নাজাত লাভে সক্ষম হয়েছে। আর যে তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, সে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।' (সূরা আশ শামস)

৪. আল্লাহর ইবাদত করার রীতি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে ছিল এবং আজও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু প্রাচীন ধর্মগুলোতে একটি বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল। তা হচ্ছে এটাই যে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে কষ্ট দেয়া বা অন্য কথায় বলা যায়, তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম নিয়েছিল যে, রক্ত-মাংসের এ শরীরটিকে যত বেশি কষ্ট দেয়া হবে তত বেশি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হবে এবং হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতা বেড়ে যাবে। এরই ফলে হিন্দুদের মাঝে সাধারণভাবে যোগবাদ ও খ্রিস্টানদের মাঝে 'রাহবানিয়াত' বা সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয় এবং কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার প্রচলন ঘটে। একেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় মনে করা হয়। কেউ সারা জীবন গোসল করে না, কেউ বা সারা জীবন চট বা কম্বল পরিধান করে, কেউ সকল সময় এমন কি শীতের দিনেও দিগম্বর থাকে, কেউ সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ সারা জীবন গুহার মাঝে বসে থাকে, কেউ সারা জীবন রোদে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ সারা জীবন কোন পাথরের ওপর বসে থাকে, কেউ শপথ করে যে, সারা জীবন শুধু গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করবে, কেউ সারা জীবন কুমার থাকে এবং সন্তান উৎপাদন না করাকে ইবাদত মনে করে, কেউ একটি হাত শূন্যে উত্তোলিত রেখে

www.bjilibrary.com

তাকে শুকিয়ে ফেলে, কেউ শ্বাসরোধ করাকে ইবাদত মনে করে, কেউ গাছের ডালে উল্টা হয়ে ঝুলে থাকে। এ ছিল ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের আল্লাহ্‌পরস্তির উন্নততর পর্যায় এবং আধ্যাত্মিকতার সর্বাধিক উন্নত রূপ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পয়গাম মানবতাকে এ সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করে বলেছে যে, এগুলো আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং দেহের বিচিত্র কসরত। আল্লাহ আমাদের দেহের কসরত অপছন্দ করেন না আর হৃদয়ের রং ভালবাসেন। তাঁর শরীয়তে সামর্থের অধিক কষ্টের স্থান নেই।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا۔

'আল্লাহ কাউকে তার সামর্থের অধিক কষ্ট প্রদান করেন না।'

ইসলাম এ সন্ন্যাসবাদকে বিদআত চিহ্নিত করে বলছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔

'আর যে রাহবানিয়াতকে (খ্রিস্টানরা) তাদের দীনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাকে আমি তাদের ওপর ফরয করিনি।' (সূরা আল হাদীদ)

এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা করেছেন ঃ

لَا صَرُوْرَةَ فِي الْاِسْلَامِ۔

'ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই।' (আবু দাউদ)

যারা আল্লাহর সৃষ্ট আরাম-আয়েশকে নিজেদের ওপর হারাম করে নিয়েছিল তাদেরকে কুরআন প্রশ্ন করেছে ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ۔

'বল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সাজসজ্জা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোকে কে হারাম করেছে?' (সূরা আল আ'রাফ : ৩২)

এমন কি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের জন্য মধু হারাম করে নিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সতর্ক করা হয়েছিল ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ۔

www.bjilibrary.com

'হে নবি! আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন একে আপনি হারাম করেছেন কেন?' (সূরা আত তাহরীম : ১)

ম মহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম জগতকে একথা জা বাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাত্র একটি, আর তা হচ্ছে এটাই যে, বান্দা আল্লাহর সামনে নিজের ইবাদতের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ۔

'যারা আমার ইবাদত থেকে বিদ্রোহ করে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সূরা আল মুমিন : ৬০)

অর্থাৎ ইবাদত হচ্ছে এটাই যে, বান্দা আল্লাহ্দ্রোহী হবে না। ইবাদতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পাদন করে বান্দা এ কথা প্রকাশ করে যে, সে আল্লাহদ্রোহী নয় বরং তাঁর অনুগত।

ইসলামে ইবাদতের উদ্দেশ্য– লক্ষ্য ও ফল কী? শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' (সূরা আল বাকারা : ২১)

নামাযের মাধ্যমে কিভাবে উপকৃত হওয়া যায়, তা নিচের আয়াত থেকে উপলব্ধি করা যাবে।

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।'

(সূরা আল-আনকাবুত : ৪৫)

www.bjilibrary.com

রোযার উদ্দেশ্য এরূপ ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।' (সূরা আল বাকারা : ১৮৩)

হজ্বের লক্ষ এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ۔

'যাতে করে লোকেরা তাদের উপকারী স্থানে পৌঁছতে পারে এবং যাতে করে কিছু নির্ধারিত দিনে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা হিসেবে যে পশু দান করেছেন এর দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।' (সূরা আল হজ্ব : ২৭)

যাকাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা এবং গরিবদেরকে সাহায্য করা।

الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى ۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى۔

'যে নিজের হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করার জন্য অর্থ দান করে এবং এ জন্য কোন বিনিময়ের আশা করে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য।' (সূরা আল লাইল : ১৮-২০)

বিবাহ করা এবং বংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে ইসলামের নবির সুন্নাত। তিনি বলেছেন ঃ

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ۔

www.bjilibrary.com

বিবাহ হচ্ছে আমার রাস্তা, যে আমার রাস্তা পরিহার করে সে আমার দলভুক্ত নয়।' (আল হাদিস)

কুরআন মাজীদ স্ত্রী এবং সন্তানকে চোখের শীতলতা বলে উল্লেখ করেছে এবং মুসলমানদেরকে এ কামনাকারী হিসেবে গণ্য করেছে যে,

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔

'আর যারা বলে ঃ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের দ্বারা চোখের শীতলতা দান কর।'

অন্যান্য বিষয় ব্যতীত কুরবানিও একটি ইবাদত। লোকেরা নিজেদেরকে (অর্থাৎ মানুষকে) দেবতাদের জন্য কুরবানি করেছে। সন্তানদেরকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করেছে এবং তাদেরকে দেবতাদের কাছে নজরানা হিসেবে পেশ করেছে। দেবতাদেরকে রক্তের ফোঁটা দান করা হত। যে পশু কুরবানি করা হত তার গোশ্ত জ্বালানো হত। কেননা তার ধোঁয়ায় দেবতা খুশী হত। ইহুদিরা এজন্য গোশ্ত জ্বালাত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে কুরবানির প্রকৃত উদ্দেশ্য জানালেন। তাঁর পয়গাম মানুষকে কুরবানি করার প্রথা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। অবশ্যই পশু কুরবানিকে বৈধ ঘোষণা করে, কিন্তু রক্তের ফোঁটা দেয়া আর গোশ্ত জ্বালানোর অনুমতি প্রদান করেননি। কুরবানির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ ۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ۔

www.bjilibrary.com

'আর কুরবানির জানোয়ারকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নামে নিশানীতে পরিণত করেছি। সে জানোয়ারগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কাজেই তাদের ওপর আল্লাহ্‌র নাম পাঠ কর সারিবন্দি করে। আর তা নিষ্চল হয়ে যাবার পর তার মধ্য থেকে কিছু তোমরা খাও এবং বাকিটা পরিতুষ্ট হয়ে বসে থাকা এবং নিজেদের অভাব পেশকারী গরিবদেরকে আহার করাও। এভাবেই এ পশুগুলোকে আমি তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। সে কুরবানিসমূহের গোশ্‌ত ও রক্ত কখনো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, কিন্তু তোমাদের অন্তরের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে। এভাবে তাদেরকে তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করেছেন, যাতে করে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে যে পথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পার এবং (হে নবি) সৎকর্মশলিদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।'

(সূরা আল হজ্ব : ৩৬, ৩৭)

কুরবানির এ ভুল ধারণার ফলে এ বিষয়ের উদ্ভব হয়েছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের প্রাণের মালিক এবং তার ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী। অনুরূপ সে তার সন্তানদের প্রাণেরও মালিক। স্বামী তার স্ত্রীর প্রাণের মালিক। এ একটি ভ্রান্ত নীতির ফলে আত্মহত্যা, কন্যা হত্যা, সন্তানকে নজরানা হিসেবে পেশ করা বা তাদেরকে হত্যা করা, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সতীদাহ প্রভৃতি শত শত মানবতা বিরোধী রসম-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম এসবের মূলোৎপাটন করেছে। এখানে এ নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং একমাত্র আল্লাহ্‌রই উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে। এ জন্য গায়রুল্লাহ্‌র নামে যে পশু কুরবানি করা হয় তার গোশ্‌ত হালাল নয়। আত্মহত্যাকারীদের ওপর আল্লাহ্‌ তাঁর জান্নাতও হারাম করে দিয়েছেন! ইসলাম ব্যতীত সারাজগতে এবং বর্তমানেও ইউরোপ এবং আমেরিকার ন্যায় সুসভ্য দেশেও আত্মহত্যাকে সমস্যা ও বিপদ থেকে মুক্তির সর্বোত্তম পন্থা বিবেচনা করা হয়। আইন এর প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, কিন্তু সফল হয় না। কারণ

www.bjilibrary.com

প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করে এবং তাকে জগতের বিপদ থেকে মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, এ মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই, আর যদি থেকেও থাকে তাহলে আল্লাহ্ আমাদের কাছ থেকে আমাদের এ কর্মের কোন জবাব চাচ্ছেন না। কিন্তু ইসলাম বলেছে, কারো প্রাণের মালিক মানুষ নয় বরং সকল প্রাণের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্। তাই আত্মহত্যার দ্বারা বিপদ মুক্তির ধারণা নেহাত ভুল চিন্তাপ্রসূত। কেননা এভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া পর পরবর্তী জগতে আরো অধিক বিপদসঙ্কুল জীবন শুরু হবে।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔

'কাউকেও হত্যা করবে না। আল্লাহ্ একমাত্র হকের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কারণে প্রাণনাশ করা হারাম করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাঈল)

وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ۔ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا۔

আর তোমাদের নিজেদেরকেও হত্যা কর না। অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর করুণাকার (আর এ জন্য করুণাবশে তোমাদেরকে এ নির্দেশ প্রদান করেছেন)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশ অবমাননা করে এবং নিজের ওপর যুলুম করে এ কাজে ব্রতী হবে, তাকে আমি জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।' (সূরা আন-নিসা : ২৯-৩০)

আরবে ছিল কন্যা হত্যার প্রচলন। হিন্দুস্তানের রাজপূতদের মধ্যেও এর প্রচলন আছে। জগতের আরো বিভিন্ন দেশেও এর প্রচলন ছিল। আরবে এটি এমন নিষ্ঠুর রীতিতে পরিণত হয়েছিল যে, সেখানে কন্যাকে জীবিত কবরস্ত করা হত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-র পয়গামের একটি মাত্র বাক্যই এ বাতিল রীতিটি চিরকালের জন্য উৎখাত করা হয়েছে।

وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔

www.bjilibrary.com

'আর যেদিন জীবিত প্রোথিত কন্যা সন্তানদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন পাপে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল?' (সূরা আত তাকভীর)

আরবে নিজের সন্তানকে হত্যা করা অপরাধ বলে গণ্য হত না। আজকের এ সুসভ্য জগতেও অসংখ্য সন্তানকে এজন্য হত্যা করা হচ্ছে যে, পিতামাতার তাদের লালন-পালন করার সামর্থ নেই। বলা হয়, দেশের উৎপাদন কম, তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। আরবে এবং অন্যান্য জাতিদের আইনে গর্ভপাত করা বা শিশু হত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান ছিল না। গ্রীসের নবজাতকদের পরীক্ষা করা হত এবং এর মধ্যে দুর্বলদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিল বলে মনে করা হত না। তাদেরকে পাহাড় থেকে নীচে ফেলে হত্যা করা হত। আজও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নামে এ সব কিছুই হচ্ছে। ইসলাম এ চিরন্তন নীতি বর্ণনা করেছে যে, রিযিক কেউ কাউকে দান করে না।

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

'যমীনের ওপর প্রত্যেক বিচরণকারীকে রিযকদানের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।'

এজন্য ইসলাম বলে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ـ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا.

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানরে হত্যা করো না! আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযক দান করি। অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করা বিরাট অন্যায়।' (সূরা বনি ইসরাঈল : ৩১)

জগতে যে বিরাট অংশে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম গৃহীত হয়নি, সেখানে যে ভ্রান্তি বিরাজমান তা হচ্ছে এটাই যে, লোকেরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি-প্রকৃতির প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। ভারতের লোকেরা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত

www.bjilibrary.com

নিজেদেরকে ছাড়া সারাজগতের মানুষকেই ম্লেচ্ছ ও অস্পৃশ্য গণ্য করেছে এবং নিজেদেরকে চারটি বর্ণের মধ্যে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে সম্মান ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করেছে। শূদ্রদের ধর্ম-কর্ম করারও অধিকার ছিল না। এ চারটি সম্প্রদায় প্রাচীন ইরানেও এভাবেই বিদ্যমান ছিল। রোমানরা নিজেদেরকে প্রভুত্বের অধিকারী এবং অন্যদেরকে গোলামি করার যোগ্য মনে করেছিল। আজ সভ্যতা, মানব প্রেম এবং সাম্যের দাবিদার ইউরোপের অবস্থাটাই একবার বিবেচনা করুন। শ্বেতকায়রা সেখানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির একচ্ছত্র অধিকারী বলে গণ্য হয়। কৃষ্ণকায়রা তাদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হয় না। এশীয় জাতিরা সফরেও তাদের সাথে একত্রে চলতে পারে না। কোন কোন দেশে তাদের মহল্লায় বসবাসও করতে পারে না এবং তাদের সকল অধিকারও ভোগ করতে পারে না। আমেরিকার মানব দরদীদের দৃষ্টিতে সেখানকার কৃষ্ণকায় বাসিন্দাদের বেঁচে থাকারও কোন অধিকার নেই। আর দক্ষিণ এবং পূর্ব আফ্রিকায় শুধু কৃষ্ণকায় নয় বরং ভারতীয় তথা এশীয়রাও মানবিক সমানাধিকার লাভ করতে পারে না। পার্থিব অধিকারের সীমা পেরিয়ে এ তারতম্য আল্লাহ্‌র এ দুটি কাল এবং সাদা বান্দা এক সাথে এক আল্লাহ্‌র সামনে নত হতে পারে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম এ সমস্ত তারতম্য এবং পার্থক্য বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে বংশ, গোত্র, ধন-সম্পদ, আকৃতি, প্রকৃতি কোন কিছুই মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। যে কুরাইশরা তাদের বংশ এবং গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর গর্ব করেছে, মক্কা বিজয়ের দিন কাবার হারেমে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে বলেছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّ اللهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ نُخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةَ وَعَظَمَهَا بِالْاٰبَاءِ النَّاسُ مِنْ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ۔

'হে কুরাইশগণ! এখন আল্লাহ জাহেলিয়াতে অহঙ্কার গোত্রীয় গর্ব নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম বংশোদ্ভূত এবং আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।' (ইবনে হিশাম)

www.bjilibrary.com

বিদায় হাজ্বের জনসমুদ্রে আবার ঘোষণা করেছেন ঃ

لَيْسَ لِلْعَرَبِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَجَمِيِّ وَلَا لِلْعَجَمِيِّ فَضْلٌ عَلَى الْعَرَبِيِّ كُلُّكُمْ اَبْنَاءُ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ۔

'আরবের অনারবের ওপর এবং অনারবের আরবের ওপর কোন প্রাধান্য নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমের সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে।' (মুসনাদে আহ্‌মদ)

এরপর তিনি বললেন, প্রকৃত পার্থক্য হচ্ছে কাজের ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ اَوْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ۔ اَلنَّاسُ كُلُّكُمْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ خُلِقَ مَنْ تُرَابٍ۔

'আল্লাহ জাহেলি যুগের অহঙ্কার এবং বংশগর্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। মানুষ এখন হচ্ছে মুত্তাকী ঈমানদার বা গোনাহগার দুর্ভাগা। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান এবং আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

(তিরমীযি, আবু দাউদ)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওহি সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ۔

'হে মানব সম্প্রদায়! তোমাদের সবাইকে আমি (আল্লাহ) একটি মাত্র পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোত্র ও বংশে এজন্য বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পারস্পরকে চিনতে পার। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানি হচ্ছে সে, যে তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।'

(সূরা আল হুজরাত : ১৩)

www.bjilibrary.com

অন্য স্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا۔

'তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নয়, যা আমার কাছে তোমাদের মর্যাদা উন্নত করে। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে। তারা তাদের কাজের প্রতিদান দ্বিগুণ লাভ করবে।' (সূরা আস সাবা : ৩৭)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পয়গাম সমস্ত মুসলমানকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে এ পয়গাম শুনিয়েছে যে, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ 'সমস্ত মুসলমান পরস্পর ভাই।' এ অনুযায়ী বিদায় হাজ্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক লাখ জনতার মহাসমুদ্রে ঘোষণা করেছেন ঃ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ 'প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই।' এ সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব সাদা-কাল, আরারি-আজমি, তূর্কী-তাতারি, ইংগী এবং ফিরিংগীর পার্থক্য দূর করে দিয়েছে এবং আল্লাহ তাদের ওপর তাঁর এ অনুগ্রহের উল্লেখ করলেন যে, فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا 'আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর পরস্পরের ভাইয়ে পরিণত হয়েছ।' আল্লাহর ঘরে সবার সমান অধিকার, বংশ-গোত্রের কোন পার্থক্য নেই, পেশা এবং পদমর্যাদার পার্থক্য নেই, দারিদ্র্য এবং প্রাচুর্যের পার্থক্য নেই। আল্লাহর কাছে সবাই সমান। এখানে কেউ ব্রাহ্মণ আর কেউ শূদ্র নয়। সকলেরই হাতে কুরআন দেওয়া হবে। সকলের পিছনেই নামায পড়া হবে। প্রত্যেকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। জ্ঞানে সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ 'প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ।'

www.bjilibrary.com

প্রিয় যুবকরা! মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম জগতে যে সমস্ত বস্তু দান করেছে, তা আমি একটি একটি করে আপনাদের সামনে উল্লেখ করার একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনের অনুপাতে সময় অতি সামান্য এবং এ অতল সমুদ্রের প্রান্ত মেলাও দুষ্কর। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-র পয়গাম নারী সমাজকে যে অধিকার প্রদান করেছে এবং গোলামদেরকে যে মর্যাদায় ভূষিত করেছে, ইচ্ছা ছিল এর বিবরণও আপনাদের সামনে উল্লেখ করি এবং এ বিষয়টিও দেখেছি যে, ইউরোপের গালভরা দাবি সত্ত্বেও ইউরোপীয় জাতিরা ইসলামের সুউচ্চ মিনারের বহু নিচে অবস্থান করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সময় আর নেই।

ইহ্-পরকাল এবং দুনিয়ার পৃথকীকরণ

যে বস্তুটি জগতে সবচেয়ে বেশি গোমরাহীর পথ পরিষ্কার করেছে, তা হচ্ছে ইহ-পরকালের পৃথকীকরণ। দীনের কাজকে পৃথক করে নেয়া হয়েছে এবং দুনিয়ার কাজকেও পৃথক করেছে। আল্লাহর নির্দেশে ধন-সম্পদ লাভের পথ পৃথক করা হয়েছে এবং দীন অর্জনের পথ পৃথক। প্রিয় যুবকরা! জগতে যে সমস্ত বিভ্রান্তি বিস্তার লাভ করেছিল এর মধ্যে এটিই ছিল বৃহত্তম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গামের উজ্জ্বল কিরণ এ বিভ্রান্তি-জাল ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এ পয়গামই একথা বলেছে যে, আন্তরিকতা এবং সদুদ্দেশ্য সহকারে জগতের কার্যাবলি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করাও দীন। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী দুনিয়াদারির নামই দীনদারী। লোকেরা মনে করে, যিকির-ফিকির করা, গৃহত্যাগ করে বৈরাগির জীবন-যাপন করা এবং পাহাড়ের গুহায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করার নাম দীনদারি নয়। আর বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, দেশ-জাতি এবং নিজেকে সাহায্য ও প্রতিপালন করা এবং জীবিকার সন্ধান ও সন্তান পালন করা দুনিয়াদারি। ইসলাম এসব ভ্রান্ত

www.bjilibrary.com

ধারণারও বিলোপ সাধন করেছে এবং বলেছে যে, আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক এ অধিকারগুলো অর্জন করা এবং কর্তব্য পালন করা দীনদারিরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে দু'টি বিষয়ের ওপর নাজাত নির্ভর করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঈমান এবং অন্যটি সৎকাজ। পাঁচটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নাম হচ্ছে ঈমান ঃ আল্লাহর ওপর, সৎপথের সন্ধানদাতা নবিগণের ওপর, নবিগণের কাছে আল্লাহর পয়গাম আনয়নকারী ফেরেশতাগণের ওপর, আল্লাহর এ পয়গাম যে সমস্ত কিতাবে আছে সে কিতাবসমূহের ওপর, এ পয়গাম অনুযায়ী কাজ করা ও না করার পুরস্কার ও শাস্তির ওপর। এ পাঁচটি বিষয়ে বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে ঈমান। এ ঈমানের ওপরই সৎকাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। কেননা এ ঈমানও বিশ্বাস ব্যতীত সঙ্কল্প এবং আন্তরিকতাসহ কোন কাজ সম্পাদন করা অসম্ভব। দ্বিতীয় বস্তুটি হচ্ছে সৎকাজ। অর্থাৎ আমাদের কাজ সৎ এবং উত্তম হওয়া উচিত।

ইতোপূর্বে আমার সপ্তম বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি যে, কাজের তিনটি অংশ ঃ একটি হচ্ছে ইবাদত, অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং বান্দার বন্দেগি প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্যবহারিক জীবন, অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন, কাজ-কারবার, দেশ পরিচালনা সম্পর্কিত আইন-কানুন ও সংবিধান, যার সাহায্যে মানব সমাজ ধবংস ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিলাভ করে এবং যুলুমের বিলোপ সাধন হয় ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৃতীয়টি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র, অর্থাৎ এমন সব অধিকার যা পরস্পরের ওপর আইনগত দিক দিয়ে ফরয না হলেও আত্মার পূর্ণতা এবং সমাজের উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এ চারটি বস্তু অর্থাৎ ঈমান, ইবাদত, ব্যবহারিক জীবন এবং নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও যথার্থতাই আমাদের নাজাতের একমাত্র উসিলা স্বরূপ।

www.bjilibrary.com

প্রিয় যুবকগণ! আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, নিসঙ্গতা, নির্জনতা, স্থবিরতা এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একক জীবন ইসলামে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম হচ্ছে সংগ্রাম, সাধনা, প্রচেষ্টা এবং কর্মতৎপরতার নাম। ইসলাম মৃত্যু নয়, জীবন। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ.

"প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।"

(সূরা আল মুদ্দাস্‌সির : ৩৮)

ইসলাম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক অবিরাম প্রচেষ্টা- সাধনারই নাম। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নির্জনে ঘরে বসে নয় বরং কাজের ক্ষেত্রে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন আপনাদের সামনে রয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনও আপনাদের সামনে বর্তমান, সাধারণ সাহাবাগণের জীবনও আপনাদের নাজাতের পথ নিহিত রয়েছে। তাঁদের জীবনও আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের আদর্শ। তাঁদের জীবনেও রয়েছে আপনাদের কল্যাণের মাধ্যম এবং আপনাদের উন্নতি ও সৌভাগ্যের সোপান। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম গৌতম বুদ্ধের পয়গামের ন্যায় কামনা-বাসনা পরিহারের শিক্ষা দেয় না। বরং কামনা-বাসনার পরিশুদ্ধি এবং তাকে যথার্থ রূপ দানের শিক্ষা প্রদান করে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম হযরত ঈসার পয়গামের ন্যায় ধন-সম্পদ ও শক্তির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন ও নিষেধাজ্ঞা প্রদানের নাম নয় বরং এগুলো অর্জন ও ব্যয়ের পদ্ধতিসমূহ সংশোধন ও তাদের যথার্থ ব্যবহার ও ব্যয়ের ক্ষেত্রকে নির্ধারণ এ পয়গামের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

বন্ধুগণ! ঈমান ও সে অনুযায়ী সৎকাজের নাম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম হচ্ছে কর্ম, কর্ম পরিহার নয়। ইসলাম হচ্ছে কর্তব্য সম্পাদন, কর্তব্য পরিহার নয়। এ কর্ম ও কর্তব্যসমূহের ব্যাখ্যা আপনাদের নবি ও তাঁর সহচরগণের জীবনচরিতে পাওয়া যাবে। এর চিত্র এরূপ ঃ

www.bjilibrary.com

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا۔

'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল আর যারা তাঁর সহচর, তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি করুণাশীল। তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা রুকু-সিজদায় রত, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি সন্ধান করছে।' (সূরা আল ফাতহ্ : ২৯)

তারা সত্য অস্বীকারকারীদের সাথে জিহাদ করছে, পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসা বজায় রেখেছে, আল্লাহর সামনে রুকুতে ঝুঁকে আছে এবং সিজদায় নত আছে। আবার জগতে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টিরও সন্ধান করছে। কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ (ফযল) বলা হয় রিযক এবং জীবিকাকে। এ রিযক এবং জীবিকার বেলায়ও দীনের দাবি রয়ে যাচ্ছে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ۔

'এরা এমন লোক যাদেরকে ব্যবসায় এবং বেচাকেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না।' (সূরা আন নূর : ৩৭)

ব্যবসায়, বেচাকেনা, কাজ-কারবার সব জারি আছে, আবার আল্লাহকে স্মরণ করাও হচ্ছে। তারা একটিকে ত্যাগ করে অন্যটির সন্ধান করে না, বরং উভয়ের সন্ধান একই সাথে করে।

মুসলমান এবং রোমীয়দের যুদ্ধ চলছে। মুসলিম বাহিনীর সেনারা হচ্ছেন সাহাবায়ে কিরাম! রোমান সেনাপতি মুসলিম সিপাহীদের অবস্থা জানার জন্য মুসলমানদের শিবিরে গুপ্তচর পাঠায়। তারা এসে মুসলমানদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে ফিরে যায়। রোমান সেনানায়কের কাছে তারা এ তথ্য প্রদান করে যে, মুসলমানরা অদ্ভুত সিপাহী- هُمْ رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَبِا النَّهَارِ فَرَسَانٌ 'তারা রাতে সংসার ত্যাগী এবং দিনে ঘোড়-সওয়ার।' ইসলামের প্রকৃত জীবন হচ্ছে এটাই।

www.bjilibrary.com

বন্ধুগণ! আজ আমার বক্তৃতা সমাপ্তির শেষ দিন। মনে করেছি, আটটি বক্তৃতায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন চরিত এবং পয়গাম সম্পর্কে সবকিছুই উত্থাপন করে জানতে সক্ষম হব, কিন্তু আটটি বক্তৃতার পরও এখনো অনেক কিছুর আলোচনা রয়েই যাচ্ছে এবং যা কিছু করেছি তাও যৎসামান্যই বলা চলে। কিন্তু সে আশা আর পূরণ করা সম্ভব হলো না।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com